সিন্ধু-গৌরব।

ইতিহাস অবলম্বনে

উপন্যাস।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,

প্রণীত।

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৫

 [মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।
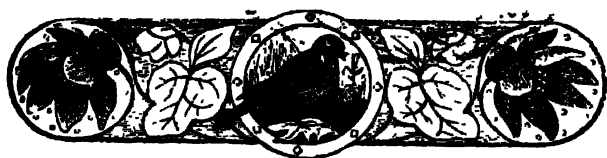
সিন্ধু-গৌরব

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাণী কমলাবতী।

রজনীর প্রথম যাম উত্তীর্ণ হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের দুর্গতোরণ-স্বরূপ সিন্ধুরাজ্যের বিশাল রাজপ্রাসাদ নীরবে দণ্ডায়মান। রাজা দাহিরের শয়নকক্ষে প্রদীপ নাই অথচ গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্নও নহে। মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-প্রভ হীরক-খণ্ড বিবিধকারুকার্য্যখচিত নিলিম গৃহছাদে এবং প্রাচীর-গাত্রে কোটি নক্ষত্র প্রতিফলিত করিয়া জল্ জল্ জলিতেছে। তেত্রিশকোটী দেবতার প্রতিমূর্ত্তিতে, নানা সাধুপুরুষের আলেখ্যে, সুচিত্রিত কক্ষটি সুসজ্জিত। সহস্রপদ্মরাগঅয়স্কান্তমণি-বিনির্ম্মিতপদ, হিরণ্ময়-দণ্ড পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ কুসুম-কোমল শয্যা। শয্যাস্তরণের চতুষ্পার্শ্বে, জরি-শোভিত ঝালরে, অসংখ্য মুক্তা ঝলসিতেছে। তদুপরি উপাধানে দেহভার ন্যস্ত করিয়া করতলে দক্ষিণগণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক তেজঃ-পুঞ্জকলেবর পঞ্চাশৎবর্ষদেশীয় এক পুরুষ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন : পদতলে, মুক্তাসনে, উপবেশন করিয়া ভগবতীপ্রতিম এক প্রৌঢ়া দেবীমূর্ত্তি নীরবে পদসেবা করিতেছেন। উভয়েই নীরব গম্ভীর।

কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল। প্রৌঢ়া সতৃষ্ণ নয়নে চির-প্রশান্ত স্বামীর চিন্তারেখাঙ্কিত ললাট-পটে বহুক্ষণ দৃষ্টিস্থাপন করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, আজ কেন আপনাকে এমন দেখ্‌ছি ?"

আনত নেত্র উত্তোলন করিয়া ধীরগম্ভীর স্বরে রাজা দাহির বলিলেন, "বড় গোলযোগেই পড়েছি। দেবি! ম্লেচ্ছের অত্যাচার দিন দিনই বেড়ে উঠ্‌ছে! সেদিন দেবলে বন্দর-রক্ষীদের এবং যবন নাবিকদের মধ্যে বিবাদ হ'য়ে গেল। বন্দরাধ্যক্ষ তা'দের জাহাজ আটক করেছে।"

দৃঢ়কণ্ঠে রাণী বলিলেন, "তা বেশ করেছে। তা'দের আস্‌তে দেওয়াই অন্যায় হয়েছিল।"

"রাণি! আগে অতটা ভাবিনি; এখন দেখ্‌ছি তোমার কথাই ঠিক; জাহাজআটকের সংবাদ পেয়ে খালিফ্ বড় দর্পক'রে আমায় লিখে পাঠিয়েছে "হয় ক্ষতি পূরণ কর নইলে যুদ্ধে দেশ উৎসন্ন কর্‌বো।

"আপনি কি উত্তর দিয়েছেন ?"

"এখনো কিছু দিইনি। কি উত্তর দেবো ভাব্‌ছি"।

"কেন ?"

উঠিয়া বসিতে বসিতে দাহির উত্তর করিলেন "রাণি! যবনের এখন উন্নতির সময়; আর আমি বুড়ো, যৌবনের সে তেজ সে উদাম উৎসাহ কিছুই আর নেই। প্রয়োজন ছিল না ব'লে সৈন্যসংখ্যাও কমিয়ে ফেলেছি। তাই উত্তর দেবার ভাবনা। তবে সব দিক ভেবে মনে হয়, ক্ষতিপূরণ করাই ভাল—অত হাঙ্গামায় পড়তে হবে না।"

পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিতে করিতে রাণী উত্তর করিলেন "ভুল বুঝেছেন মহারাজ! একবার আপনাকে পেঁছুতে দেখ্‌লেই তাদের স্পর্দ্ধা বেড়ে যা'বে; আর আপনার নিজের লোকেরাও আপনার

চাইতে যবনকে বড় ব'লে মনে করবে। তাই বলচি, কাজটা শেষে খাল কেটে কুমীর আনা গোছের হবে। তার চেয়ে লিখে দিন, যুদ্ধই চাই।"

"কথাটা এক দিককার হিসাবে ঠিকই ব'লেছ মহিষি! কিন্তু যদি আমরাই হারি?—"

"হারবো। 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।' শরীরে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকতে ত' আর আশা ছাড়চিনে।"

গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে সিন্ধুরাজ বলিলেন "তবে এই ঠিক;— কিন্তু, মেয়ে দু'টোর জন্যই ভয়, শেষে বা যবনের হাতে পড়ে—"

স্থির দাঁড়াইয়া কমলাবতী উত্তর করিলেন "আপনার যত মিথ্যা আশঙ্কা! রাজপুতের মেয়ে নয়, বংশে কালি দেয় না; আপনি যুদ্ধ করুন।"

এমন সময় একটি তন্বঙ্গী মাধুর্য্যময়ী বালিকামূর্ত্তি চঞ্চলচরণে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল; অকস্মাৎ দীপ্তিমান্ হীরকখণ্ডগুলি প্রভাতকালীন তারকারাজির ন্যায় ম্লান হইয়া বসিল। তাহার অংস ও পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান কুঞ্চিতকুন্তলরাজি, তাহার পীনোন্নত বক্ষ, তাহার হাস্যোজ্জ্বল নয়নযুগল, আর তাহার তপ্তকাঞ্চনবর্ণে, তাহাকে যেন নূতনতর কোন জগতের অধিবাসিনী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বয়ঃক্রম, অনুমান, ষোড়শবৎসর।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই, উৎফুল্লকণ্ঠে বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, বাবা, শুনলেম যবনের সঙ্গে তুমি লড়াই করবে?"

"হাঁ, মা, তোকে কে বললে?"

"আমায় আবার কে বলবে? একথা যে দেশময় শুনতে পাচ্ছি।" সস্নেহে কন্যাকে কাছে টানিয়া দাহির জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর ভয় হয়?"

সরলসহজভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা উত্তর করিল "ভয় কি বাবা ?"

"তোকে যদি মুসলমান্ ধ'রে নিয়ে যায় ?"

সদর্পে বালিকা উত্তর করিল "মর্‌বে।"

"আর তুই ?"

চক্ষুতে ধূর্ত্ত হাসির সঙ্গে কন্যা উত্তর করিল "তারা আগে মর্‌বে ; দেখে দেখে আমি হাস্‌বো, তার পর মর্‌বো।"

সস্নেহেও সাগ্রহে কন্যার মুখচুম্বন করিয়া রাণী বলিলেন "না, অমল, এখন শুতে যা ; বিমল কৈ ?"

"ঘুমিয়েছে" বলিয়া অমলা দ্রুতপাদ-ক্ষেপে চলিয়া গেল।

সগৌরবে রাণী বলিলেন "কেমন মেয়ে আমার ! আপনার ভয় নেই—আপনি যুদ্ধ করুন্।"

"কর্‌বো—কাল সভায়ই যুদ্ধের কথা জানিয়ে দেবো।"

আর বেশী কথা-বার্ত্তা হইল না। রাজারাণী শয়ন করিলেন।

———o———
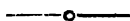
দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদ।

স্বামীর পরিচয়।

বাগদাদাধিপতি কালিফের প্রধান সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ মহম্মদ কাশেমের প্রাসাদসংলগ্ন সুবৃহৎঘনপল্লবিতভরুরাজি-সমাকীর্ণ উদ্যানে সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানা তাঞ্জাম আসিয়া দাঁড়াইল ; সঙ্গে আপাদ-মস্তক-বস্ত্রাবৃত স্ত্রী কি পুরুষ, অথবা উভয় জাতীয়, একব্যক্তি। তাঞ্জাম মৃত্তিকায় স্থাপিত হইলে, এই লোকটি বাহকদিগকে বাগান হইতে দূরে কোনো এক স্থানে যাইয়া অপেক্ষা করিতে বলিল ; এবং বাহকগণ চলিয়া গেলে, শিবিকার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। তখন অন্ধকার প্রায়

ইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ দিক্‌-দিশা আলোকিত করিয়া, অভ্যন্তর হইতে এক দীর্ঘাকৃতি রমণী-মূর্ত্তি বাহির হইয়া বলিলেন, "আলো জ্বেলে রেখে তুই যা—এবার নিয়ে আসাই চাই।"

"আসে যদি" বলিয়া ও আলোক প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়া, লোকটা দ্রুতপদে সেনাপতি কাশেমের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

তখন যুবতী শিবিকা-দ্বারে উপবেশন-পূর্ব্বক সতৃষ্ণ নয়নে কাশেমের গৃহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন "হায় বিধি-লিপি! মুসলমান্-জগতের সম্রাট, বোগ্দাদের অধিপতি, সাহানশা কালিফের আদরের মেয়ে আমি—আমারও অভিসারে আস্‌তে হ'লো! এ-লেখইবা—ফল কি হ'বে, কে জানে? বীরের প্রাণ কি অতই কঠিন? এত মিনতি ক'রে ডেকে পাঠালেম, একটি বারও আমার সঙ্গে দেখা করলে না! আমার রূপ-যৌবন ঐশ্বর্য্য-প্রতিপত্তি, সকলই বৃথা! অত যে রূপের খ্যাতি, সে কেবল চাটুকারের তোষামোদ! আমি—রূপ যৌবন-জীবন,—সর্ব্বস্ব দিয়ে,—আমি ডেকে পাঠালেম; কৈ, কাশেম ত' গেলনা! এবারো যদি না আসে? তবে—তবে?—কোনো পুরুষের যার মুখ দেখ্‌বার অধিকার নেই, চন্দ্রসূর্য্য যার রূপ দেখ্‌তে পায় না, সেই আমি, অন্দর ছেড়ে আজ কাশেমের বাগানে! কালিফ্ জান্‌লে, আর রক্ষা থাক্‌বে না। কাশেম, কাশেম, তোমার জন্য আমি প্রাণে মরতে বসেছি। আর আমায় অমন্ ক'রে বিদায় দিওনা।" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কেহ আসিতেছে কি না।

পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, এ আর কেহ নহে—স্বয়ং বাগ্দাদ পতির প্রিয়তমা দুহিতা, জোবেদ সুন্দরী। নাসিকা, চক্ষু, অধর, কেশ—একটি একটি ধরিয়া দেখুন—কাহারো তুলনা নাই! বর্ণ গৌর ও স্বচ্ছ—ম্লান প্রদীপালোকেও কণ্ঠের সুনীলশিরাসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। এমন

সুন্দরী—অথচ একবারের বেশী দুইবার ওই মুখ দেখিতে যেন সাহসে কুলায় না। চক্ষুর দৃষ্টিতে ও অধর প্রান্তে কেমন-যেন হৃদয়ের রক্ত জমাট্‌-কারী সম্ভ্রম গরিমার ভাব!

যুবতী আপনার ভাবনা, বসিয়া, ভাবিতে থাকুন। আসুন, আমরা একবার কাশেমের অন্তঃপুরে বেড়াইয়া আসি—যাবৎ না লোকটা ফিরিয়া আসে। মুসলমানের হারেম্‌ বলিয়া কোনো আশঙ্কা করিবেন না—সবান্ধবে সর্ব্বত্র বেড়াইবার 'পাশ' আমি পাইয়াছি।

কাশেম গৃহে নাই; তাহার বিলাস-বর্জ্জিত, সুপরিচ্ছন্ন শয়ন-কক্ষের গবাক্ষ-সমীপে বসিয়া একটি যুবতী আপনার ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতেছেন; আসুন, এই অবসরে আমরা একবার ইহাকে দেখিয়া লই। যুবতীর বয়স অষ্টাদশের নীচে নহে; গৌরাঙ্গী হইলেও যুবতী সুন্দরী নহে—নিতান্তই সাদাসিধা রকমের। তবে, চক্ষুতে তাহার কোনো অচেনা-অজানা জগতের ছায়া, কি কোনো হৃদয়োন্মাদক ভাব না থাকিলেও, সরলতা এবং কোমলতা যেন মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে; মুখে তাহার লক্ষ্মীশ্রী বিরাজিত। যুবতী গাহিতেছেন—

ফুট্‌লে ফুল সৌরভ ছু'টে দিগ্‌দিগন্তে ধায়;
আপন ভাবে বিভোর, শেষে অনন্তে মিলায়!
আপন মনে কেঁদে হেসে,
সমীর তরঙ্গে ভেসে,
দু'দিনের খেলা খেলি' কোথায় লুকায়;
ফিক্‌ ক'রে কোথেকে এসে, আবার আনন্দে মাতায়।

গীত সমাপ্ত হইতে না হইতেই ত্রিংশৎ-বর্ষ-দেশীয় একজন অনুপম রূপবান্‌ যুবক আসিয়া, তাহার চিবুক-ধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন "এবার ত ধরা পড়েছ, মর্জ্জিনা! তুমি এমন গাইতে পার, আর আমায় একটি দিন শোনাওনি!"

সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুবতী বলিলেন "এ আবার গাওয়া! আজ তোমার এত দেরী হ'লো কেন, প্রিয়তম? আমায় তুমি ভালবাস না!"

বসিতে বসিতে যুবক উত্তর করিলেন "দেরী করেছি ব'লেই ভালবাসিনে! আচ্ছা, আমি আর কোথাও যাবোনা—যুদ্ধেও না!"

তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মর্জ্জিনা উত্তর করিলেন "না, না, অমন্ কথা আমি বলিনি—আজ ত আর যুদ্ধের কিছু ছিলনা; তবে এত দেরী হ'লো কেন?

"জান ত' তুমি, কালিফ্ আমায় কত ভালবাসেন; সহজে ছেড়ে দিতে চা'ন না। তাই আসতে দেরী হ'য়ে যায়। তোমার খুব কষ্ট হয়, মর্জ্জিনা?"

"তা হোক্; তুমি ত আর আমার একার নও। আমি ক্ষুদ্র, তোমার দাসী; তুমি বড়, অনেকে তোমার মুখের পানে চেয়ে আছে। আমি সকলের মুখের গ্রাস একা খেতে চাইনে। দশজনকে সন্তুষ্ট কর, তোমার সুখ্যাত্ বাড়ুক্—এতে আমার যে সুখ, তার ভাগী কেউ নেই। তোমার কর্ত্তব্য ক'রে যখন পার, আমায় দেখা দিও।"

"অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্রই তুমি বড় সুন্দরী, মর্জ্জিনা। তাই, কাশেম তোমার ভক্তশিষ্য। তুমিই আমায় কর্ত্তব্য শিখিয়েছ—কর্ত্তব্য-পালনে তুমিই আমায় অনুরক্ত রেখেছ। যা' কিছু যোগ্যতা আমার, সকলের মূলই তুমি।" বলিতে বলিতে কাশেম্ সস্নেহে স্ত্রীর মুখচুম্বন করিলেন।

হাসিয়া মর্জ্জিনা বলিলেন "খুব ত' ঠিক করেছ! এমন গুরু আর পা'বে না! আচ্ছা, প্রিয়তম, শুনতে পাচ্ছি, কালিফ্ তোমায় মেয়ে দিতে চা'ন; তুমি বিয়ে কর'না কেন?"

চিবুক-ধারণ-পূর্ব্বক স্ত্রীর চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া, গম্ভীরকণ্ঠে স্বামী

উত্তর করিলেন "ছি! অমন্ কথা মুখে আন্‌তে নেই ; ওতে পাপ হয়। আমার অভাব কি যে, আমি আবার বিয়ে ক'রবো ?"

যুবতী উত্তর করিলেন "চোখ বুঁজে থাক, তাই তুমি অভাব দেখ্‌তে পাওনা ! দেখ্‌তে গেলে কি অভাবের অভাব হয় ? কেন, মুসল্‌মান্ ত' অনেক বিয়ে ক'রে থাকে ; শুনেছি, তা'তে পাপ নেই। কালিফ্ অত ক'রে চাইতেছেন—তুমি বিয়ে কর"।

"না, মর্জ্জিনা, যে প্রকৃত মুসল্‌মান্, তার একটি বই ছটি স্ত্রীর প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয়সেবা জীবনের উদ্দেশ্য হ'লে, আর একটি কেন, অনেক বিয়ে ক'র্‌তেম্। ওকথা আর তুমি মুখে এনোনা। মানুষের মন বড় দুর্ব্বল, সহজেই অবনতির দিকে ঝুঁকে পড়ে ; তাই, উন্নতির পথে অবিচলিত-ভাবে চ'ল্‌বার জন্য, বিয়ে দরকার। আমার আর বিয়ে ক'র্‌তে হ'বে না।

স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া যুবতী বলিলেন "না, কাশেম, আমি আর বল্‌বো না। ক্ষুদ্র আমি, সব সময় তোমার মহত্ত্বের ধারণা ক'রে উঠ্‌তে পারিনে। আমায় ক্ষমা ক'রো। কালিফ্, আবার, তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না ত ?"

"না, তিনি অত নীচ ন'ন্। আর হ'লেই বা কি ? অন্যায় ক'রেও বাঁচতে হ'বে, এমন প্রাণের মমতা আমার নেই।"

এমন সময়, একজন খোজা আসিয়া, সসম্ভ্রমে অভিবাদন-পূর্ব্বক কাশেমের হস্তে একখানা লিপি প্রদান করিল। একবার, দুইবার, তিনবার তিনি পড়িলেন ; প্রশান্ত মুখমণ্ডলে তাহার একটা অশান্তি ও বিরক্তির ছায়া পড়িল। খোজাকে বলিলেন "যে লোক চিঠি নিয়ে এসেছে, তাঁকে ব'লো গে যে, এই একটু পরেই আমি যাচ্ছি। সে যেতে পারে।" তৎপরে ভৃত্য চলিয়া গেলে, পত্নীর দিকে চাহিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য আবার আমায় বিদায় দাও, মর্জ্জিনা।" কাশেম চলিয়া গেলেন।

মর্জ্জিনা আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন "প্রাণেশ্বর, তুমি কত বড়! তাই লোকে তোমায় অত ভালবাসে। আমি মনে ক'র্‌তেম্, অতটা ঠিক নয়। আজ আমার ভুল বুঝেছি—তুমি বড়, অনেক বড়ঃ তোমার তুলনা নেই!"

—o—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আগুন জ্বলিল।

সংবাদবাহক এখনো ফিরিতেছে না। বাদসাজাদীর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—তিনি উঠিয়া পদচারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্ষণে ক্ষণে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, দাঁড়াইয়া কাশেমের গৃহাভিমুখে অন্ধকারেও সবলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন আর উৎকর্ণভাবে পদশব্দ শুনিবার চেষ্টা করিতেছেন। বৃক্ষশীর্ষে হুতুমপেঁচা ভীমকণ্ঠে প্রণয়িনীর সঙ্গে রহস্যালাপ করিতেছে; নিম্নে, অদূরে, শিবাদল সমস্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে; নিকটে জনমানবের সমাগম নাই। কিন্তু কিছুতেই যুবতীর ভ্রূক্ষেপ নাই।

সহসা অদূরে পদ-শব্দ শ্রুত হইল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাশেম কৈ? আস্‌বে ত' জহর?"

জহর উত্তর করিল, "অত অস্থির হ'য়ো না, সাজাদি। আস্‌বে, এখনি আস্‌বে।"

"কি বলেছে?"

"তা'র ত আর তোমার মত প্রেম গজিয়ে উঠে নি! আমি বল্লেম্ 'তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে সাজাদী বাগানে এসেছেন', জবাব হ'লো 'কে? সাজাদী?—কাজ ভাল করে নি; আচ্ছা, তুই যা', আমি যাচ্ছি'।"

"মার্জ্জিনা তখন কাছে ছিল?"

চক্ষু ঘুরাইয়া জহর উত্তর করিল, "তোমার মত কিনা! আমার দেশকালপাত্র বিবেচনা আছে। ঐ—ঐ কাশেম আস্‌চে।"

"তুই স'রে যা।"

"হাঁ, কাজ হাসিল হয়েছে কি না, এখন ত স'রে যা বল্‌বেই"—বলিতে ব'লতে খোজা অন্ধকারে লুকাইয়া গেল।

দ্রুতপদে, যেন আগ্রহ ও ব্যগ্রতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ "কাশেম্ কাশেম্" বলিতে বলিতে জোবেদী আগন্তুকের দিকে অগ্রসর হইলেন। হস্ত-সঞ্চালনে তাহাকে দূরে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া, কাশেম বলিলেন, "কাজ ভাল কর নি জোবেদি; কালিফ জান্‌তে পেলে তোমার নিস্তার নাই। নির্দ্দোষ আমি—আমায় ও মার্‌বে।"

ধীরগম্ভীরভাবে কাশেমের মুখপানে চাহিয়া যুবতী বলিলেন, "জেনে শুনেই আমি এসেছি।"

গম্ভীরতর কণ্ঠে যুবক প্রশ্ন করিলেন, "কেন?"

"তোমায় ডাক্‌লে, তুমি ত যাও না!"

"কালিফের অন্দরে যেতে কোনো পুরুষের অধিকার নাই।"

"ছদ্মস্ত্রীবেশে তোমায় নিয়ে যেতো।"

"কালিফের চোখে ধূলো দিয়ে যাবার আমার কোন প্রয়োজন ছিল না" সতেজে ও দৃঢ়কণ্ঠে কাশেম এই কথা কয়টি সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিলেন।

অবিচলিত দৃষ্টিতে কাশেমের চক্ষু চাহিয়া জোবেদী উত্তর করিলেন "তোমার নেই—আমার আছে"।

দৃঢ়তর স্বরে যুবক বলিলেন "থাক্‌তে পারেনা—থাকা অন্যায়"।

দক্ষিণদিকে মস্তকটি নিক্ষিপ্ত করিয়া, বামে গ্রীবা হেলাইয়া, জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে কাশেমের চক্ষুতে চক্ষু স্থাপিত করিয়া, যুবতী বলিয়া উঠিলেন, "অন্যায়!—তুমি ব'লোনা কাশেম্। তুমি কাশেম্ তুমিই আমার সর্ব্বনাশ

করেছ!" তার পর, ত্রস্ত যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া, তাহার মুখের উপর দীন দৃষ্টিপাত করিয়া, কাতরস্বরে বলিলেন "প্রেমের কদর জান্‌তে না যদি, অত বড় বীর হয়েছিলে কেন? হ'লেই যদি, বাগ্‌দাদে হ'লে কেন? কালিফ্‌ তোমায় ভালবাস্‌লো কেন? তার মুখে তোমার সুখ্যাত্‌ শুনে শুনেইত তোমায় আমি প্রাণ দিয়েছি। তুমি 'অন্যায়' ব'লোনা', কাশেম্‌"।

যুবতীর হস্ত হইতে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া, তিনপদ পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া পূর্ব্ববৎ অবিচলিতস্বরে কাশেম্‌ উত্তর করিলেন "যা' অন্যায়, তা' আমি কেন, সকলেই অন্যায় ব'ল্‌বে। আমার স্ত্রী আছে; তা'কে আমি ভালবাসি, খুব ভালবাসি। আমায় প্রাণ দিতে যাওয়াই অন্যায়।"

মাটির দিকে চাহিয়া জোবেদা বলিতে লাগিলেন "কাশেম, প্রেম ন্যায়অন্যায়ের ধার ধারেনা; এর পাত্রাপাত্র বিচার নেই। মনের মত মানুষ পেলে আপনি ফুটে উঠে—কোন বাধা মানেনা।" কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, নেত্রপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল, বলিতে লাগিলেন "অন্যায় ক'রে থাকি, তোমার জন্যই করেছি, কাশেম্‌। তুমি আমায় ক্ষমা কর, চরণে স্থান দাও"—বলিতে বলিতে বাদ্‌শাজাদী, জানু পাতিয়া উপ-বেশনপূর্ব্বক, দুইহস্তে কাশেমের পদদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া আবেগাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "একটিবার বল, প্রিয়তম, আমায় তুমি ভালবাসবে?"

দূরে, আরো দূরে, সরিয়া যাইয়া ধীর ভাবে কাশেম্‌ বলিলেন "না, কখনই না" তারপর গলার স্বর একটু নামাইয়া, দয়াকাতরভাবে বলিলেন "ক্ষমতা থাক্‌লে ভালবাসতেম্‌। ভাল যদি বেসে থাকো, তুমিও জানো তবে, দু'জনকে ভাল বাসা যায়না।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটা তীব্রনষ্টদৃষ্টির সঙ্গে যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার স্ত্রী যদি মরে?"

প্রাণ চমকিয়া উঠিল; কিন্তু পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে কাশেম্ বলিতে লাগিলেন "তা হলেও নয়। মর্জ্জিণা, শুধু আমার বাহিরের নয়, আমার অন্তরেরও। বাহিরের মর্জ্জিণা ম'র্‌তে পারে; অন্তরের মর্জ্জিণা আমার সঙ্গে সঙ্গেই গোরে যা'বে। এভাবে আর আমি অপেক্ষা কর্‌তে পারি না। যাও, জোবেদি, ভাল যদি বেসে থাকো, আমায় ভুলতে চেষ্টা করো—আমার এই মিনতি। আর দেরী করোনা, আমি চল্লেম্," তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলে, দৌড়িয়া যাইয়া সাজাদী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "আর একটু কাশেম্, আর একটু অপেক্ষা কর। আমার প্রাণের ব্যথা আর একটু দেখে যাও!" "না, জোবেদি, আর না। তুমি যাও" বলিতে বলিতে কাশেম্ দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তখন সাহান্-শা কালিফের কন্যা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলেন "এই কি আমার অভিসারের ফল হ'লো! কালিফের মেয়ে জোবেদী আমি, আমার রূপে সমস্ত বাগ্দাদ পাগল; আমি সেধে, পায় ধ'রে, প্রাণ দিতে এলেম—তুমি নিলে না কাশেম! রূপের মর্য্যাদা, ধনের প্রতিপত্তি, বংশের গৌরব—অন্ধ তুমি, কিছুই দেখ্‌লেনা! পায় ধ'রে মিনতি করলেম্, সামান্য সেনাপতি তুমি—চাকর তুমি—গোলাম তুমি—তুমি আমায় হাত ধরে উঠা'লে না!" লাফাইয়া উঠিয়া শাবকবিচ্ছিন্না সিংহীর ন্যায় পাদচারণা করিতে করিতে আবার বলিতে লাগিলেন "ওঃ! আমার এ জ্বালা নিভ্‌বার নয়!—জহর যদি দেখে থাকে? না, আমি ভাব্‌তে পারিনে! সাজাদী আমি—আমি গোলামের পায় ধরেছি, জহর দেখ্‌বে!—দেখুক। আমি নিজে ভুল্‌তে পারলেম্, আমি কালিফের অত আদরের মেয়ে—আমি পায় ধরতে পার্‌লেম্; আর জহর দেখ্‌বে, তা'তে এতই কি ভয়!—না, কাশেম, আমার এ কলঙ্ক জহর যদি দেখে থাকে, জগৎ যদি আমার এ কলঙ্কের কথা জান্‌তে পায়—আমার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'বে, হো'ক্, তোমায় এর ফল ভুগ্‌তে হ'বেই।"

এমন সময় জহর আসিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া, বলিল "আর কেন, সাজাদি ?"

তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া, তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, পৈশাচিক উত্তেজনার সঙ্গে জোবেদী আবার বলিতে লাগিলেন "মর্জ্জিনা, মর্জ্জিনা, তুই আমার চোখের শূল ! যে রত্ন আমি অত আদর করে গলায় রাখ্‌তে চাইলেম, উঠ্‌লো না ; যে হার সাজাদীর গলায় শোভ্‌লো না—বানরী তুই, তোর গলায় সে হার আমি দেখ্‌তে পারবোনা। নিতান্তই যদি কাশেম তোকে না ছাড়ে, আমি তোকে ছাড়িয়ে নেবো ; তারপর, কাশেম, তারপরও, যদি আমায় না ভালবাসে, তার আর রক্ষা নাই।"

শুনিয়া শুনিয়া আপন মনে জহর বলিতে লাগিল "বাপ্‌রে ! প্রেম এরেই বলে ! বাপের চোখে ধূলো দিয়ে বাগানে আসা—যে না চায়, তার পায় পড়ে কান্না—এরই নাম ভালবাসা ! হায় ! জহর, কেন তুই খোজা হয়েছিলি ! নইলে কত সাজাদী এসে এম্নি ক'রে তোর পায় গড়াগড়ি যেতো !" তার পর প্রকাশ্যে বলিল "বলি, সাজাদি, প্রেমের অভিনয় ত মন্দ হয়নি !—এখন বাড়ী ফির্‌বে, চল—শেষে কালিফ না টের পান্। পেটে ত' খেলে না, পিঠে সইবে কেমন ক'রে ?"

এবার কথা বাদশাজাদীর কানে পৌঁছিল ; বলিলেন "হাঁ, চল্, এখন ঘরে চল্।" তিনি শিবিকায় প্রবেশ করিলেন ; আলো নির্ব্বাপিত হইল ; বাহক আসিয়া নিঃশব্দে শিবিকা কাঁধে উঠাইয়া চলিয়া গেল।

—o—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আলোড় রাজসভা।

আজ কালিফের দূতকে ক্ষতিপূরণ কি যুদ্ধের কথা বলা হইবে। তাই উষার অরুণ-রাগ মিলাইতে না মিলাইতে, আলোড়বাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র আসিয়া রাজসভা আকীর্ণ করিয়া বসিয়াছেন। আজ ব্রাহ্মণ বেদপাঠ, সামগান, সন্ধ্যা-আহ্নিক ভুলিয়া গিয়াছেন; শিখার অগ্রে পুষ্প ঝুলাইয়া, কপালে তিলক কাটিয়া, নামাবলী গায় দিয়া গৈরিক-বসন-পরিহিত ব্রাহ্মণের দল আসিয়া রাজসভা সমুজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছেন। প্রভাতকৃত্য অসম্পন্ন রাখিয়াই নিঃসঙ্কোচে রমণীগণ আসিয়া আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান দখল করিয়া বসিয়াছেন; কেমন-একটা অস্পষ্ট কলরবে সভামণ্ডপ মুখরিত। রাজা এখনো আসিয়া উপস্থিত হন্ নাই।

রাজাসনের দক্ষিণে, কুশাসন-পরিবৃত স্বর্ণমণ্ডিত সমুচ্চস্থান ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দ্দিষ্ট; বামভাগে, রৌপ্যাসনে বৃদ্ধমন্ত্রী দীর্ঘল, বীরত্ব-মহিম-মণ্ডিত প্রসন্নবদন যুবকসেনাপতি ভৈরব, সভাসদ্ পারিষদ প্রভৃতি স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্মুখে, ক্রমোচ্চস্তরে, ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রের বসিবার স্থান—'এখানে লোকের মাথা লোকে খায়'; ইঁহাদের অব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগে, নানাকারুকার্য্যবিশিষ্ট সুবিস্তৃত উচ্চতর আসন, মর্য্যাদানুযায়ী স্তরবিভক্ত হইয়া, স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট; এখানেও লোক ধরেনা।

রাজাসন স্বর্ণঝালরপরিশোভিত, কুসুম-কোমলগদি-পৃষ্ঠ প্রকাণ্ড একটি সিংহ। সিংহের চক্ষুর তারা, দুইটি পদ্মরাগমণি; কেশর স্বর্ণরেণু-সমাচ্ছন্ন মত; বঙ্কিম গ্রীবায় চাহিয়া রহিয়াছে। উপরে নীলরংএর চন্দ্রাতপ; চন্দ্রাতপের মধ্যভাগে পীতরাগ-হীরক-খণ্ড-বিনির্ম্মিত চন্দ্র;

জল জল্ করিয়া জ্বলিতেছে। চারিকোণে চারিটি সুবৃহৎ মণি নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তিমান্। বহির্ভাগে, সভাগৃহের শীর্ষদেশে, রৌপ্যদণ্ডের উপর সোনালী রংএর পতাকা পত্ পত্ করিয়া উড়িতেছে।

রাজা এখনও আসিয়া পৌঁছিতেছেন না; লোকের উৎকণ্ঠা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, চতুর্দ্দিক হইতে কেবল যুদ্ধের কথাই শুনা যাইতেছে। এমন সময় দৌবারিক চিৎকার করিয়া উঠিল "জয় মহারাজের জয়! জয় মা ভবানীর জয়!"

স্বর শূন্যে মিলাইতে না মিলাইতে মহারাজ দাহির আসিয়া, ব্রাহ্মণ-দিগকে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া, রাজ্যের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া, আসন গ্রহণ করিলেন।

রাজা, মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া, বলিলেন 'দীর্ঘল, আজই জবাব লিখে দাও;—রাজপুত ক্ষতিপূরণ দিতে জানেনা, যুদ্ধই নিতে ও দিতে জানে।"

তখন ব্রাহ্মণের সভা হইতে 'দীর্ঘায়ুরস্তু রাজন্' ও অন্য সর্ব্বত্র হইতে "জয় মা ভবানীর জয়, জয় মহারাজ দাহিরের জয়" ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। রমণীগণ উলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

আবার সভা নীরব হইল—সূঁচি পতনের শব্দটি পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়। তখন, সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান্ হইয়া মন্ত্রী দীর্ঘল বলিলেন "মহারাজের অনুমতি হ'লে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই।"

রাজা বলিলেন "স্বচ্ছন্দে ক'রতে পার।"

মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন "অনেক দিন যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি, মহারাজ। সৈন্যরা সব ব'সে থেকে অলস হয়ে গেছে; আবার, 'অনভ্যাসে বিদ্যাও হ্রাস পায়'। এদের নিয়ে হঠাৎ একটা যুদ্ধে যাওয়া তেমন ভাল ঠেক্‌ছে না। আমার বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ কর্‌বো বলে ফাঁকি দিয়ে যুদ্ধটা কিছু কালের জন্য স্থগিত রেখে, সৈন্যগুলোকে আবার শিখিয়ে নেওয়া ভাল।"

উপস্থিত জন-মণ্ডলী সমবেতস্বরে বলিয়া উঠিল "না, আমরা যুদ্ধ

চাই ; পবিত্র হিন্দুস্থান্ যে ম্লেচ্ছের দাসত্ব কি বন্ধুত্ব স্বীকার কর্‌বে, প্রাণ থাক্‌তে আমরা তা দেখ্‌তে পার্‌বোনা।"

সেনাপতি ভৈরব উঠিয়া দাঁড়াইলেন "মন্ত্রি মশাই, আপনার কথায় আমিও সায় দিতে পারিনে। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ—এতে তাদের আলস্য নেই। সৈন্যরা প্রায় প্রতিমাসেই কৃত্রিম যুদ্ধ ক'রে অভ্যাস ঠিক রেখেছে। এখনো যেমন, দু'মাস ছ'মাস পরেও এরা তেমনি থাক্‌বে। ইচ্ছা হ'লে চিরকালই যুদ্ধ স্থগিত রাখ্‌তে পারেন—যত ইচ্ছা ক্ষতি পূরণ দিতে পারেন। আজ জাহাজটা, কাল নৌকোটা, পরশু কার দাড়ি কে একদিক কেটে দিয়েছে—এমন ধারা অনেক ক্ষতি হ'বে ; আর আমরাও ব'সে ব'সে তাই পূরণ কর্‌তে থাক্‌বো!"

রাজা বলিলেন "না, দীর্ঘল, তোমার এ প্রস্তাবে আমিও সম্মত হ'তে পারিনে। পরিষ্কার লিখে দাও—ক্ষত্রিয় বীর যুদ্ধই চায়।" তার পর, একটু বিরত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "নূতন কোনো অভিযোগ কারো আছে কি ?"

মন্ত্রী উত্তর করিলেন "না, মহারাজ।"

"তবে আজ সভা ভঙ্গ করা যাক্" বলিয়া ও ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ লইয়া রাজা গাত্রোত্থান করিলেন।

সভাগৃহ জনমানব-শূন্য হইয়াছে—কিন্তু বৃদ্ধ দীর্ঘল এখনো স্বস্থানেই বসিয়া রহিয়াছেন ; শেষে বলিতে বলিতে উঠিলেন "আমি বুড়ো হয়েছি, আমার কথাটা কেউ নিলেনা! এরই নাম 'মরণ-বুদ্ধি ঘাড়ে চাপা।' যবনের প্রতাপ আমার বেশ জানা আছে ; যেখানে যাচ্ছে, কেউ তাদের বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারেনি। একটা ছোঁকড়া সেনাপতির উত্তেজনায় দেশটাই ক্ষেপে উঠেছে! যাক্, সবই, মা ভবানি, তোর ইচ্ছা ; আমরা ত বুদ্‌বুদ্ মাত্র!"

—o—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"আমি ঠাকুর্দ্দাকে বে কর্‌বো।"

রাজবাড়ীর উত্তরে, দুর্গাভ্যন্তরে, ভবানী-শৈল বলিয়া নাত্যুচ্চ এক অতি মনোরম শৈল অবস্থিত। ইহার শীর্ষদেশে দেবীদশভুজার এক শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত মন্দির দাহিরের কোনো পূর্ব্বপুরুষ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দির হইতে এই ক্ষুদ্র পাহাড়টির নাম ভবানী-শৈল হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বপশ্চিমউত্তরে মনোরম পুষ্পোদ্যান; দক্ষিণে, শৈলপদতলে, রক্তোৎপল-সমুদ্ভাসিত প্রকাণ্ড এক দীর্ঘিকা; মন্দির-দ্বার হইতে শ্বেতসোপানশ্রেণী আসিয়া সলিলনিম্নে বিলীন হইয়াছে। পুষ্করিণীর দক্ষিণপূর্ব্বপশ্চিম-তটে আবার সুশোভন পুষ্পোদ্যান।

সময় প্রভাত; দীর্ঘিকাবক্ষে রাজহংস দলে-দলে ভাসিয়া বেড়াই-তেছে, সাঁতার কাটিতেছে, পদ্মের মৃণাল তুলিয়া আনন্দে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছে। সলিল-প্রান্তে সোপানোপরি তেজঃপুঞ্জ এক মহা-পুরুষ নিমীলিত-নেত্রে, ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি ফাটিয়া বাহির হইতেছে; বয়স সত্তরের কম নহে। এই অসামান্য পুরুষের নাম কহ্লন ঠাকুর—ইনিই মন্দিরাধ্যক্ষ। ইহার পূজার জন্য দীর্ঘিকাতটস্থ উদ্যানে যমজভগিনী-সদৃশী মহারাজ দাহিরের দুই কন্যা অমলা ও বিমলা পুষ্প চয়ন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠাকে আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কনিষ্ঠা তাহার অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট।

ধ্যান-সমাপনান্তে "মা, মা, মা, কত দিন আর এমন খেলা খেল্‌বো? দিন ত ফুরিয়ে এসেছে, কাজ যে কিছুই হ'লো না মা" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চয়িত পুষ্প হস্তে করিয়া অমলা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তোমার

হ'লো কি ঠাকুর্দ্দা ? সারাটা সকাল ব'সে ব'সে কেবল জপই কচ্ছো—ভবানীর পূজো কর্‌বে কখন ?"

সস্নেহে, মস্তক অবনত করিয়া, বালিকার চিবুকোত্তোলনপূর্ব্বক কহ্লন বলিলেন, "এই ত উঠেছি দিদি ; কেন, ভবানীর পূজো কি আর কেউ ক'র্‌তে পারে না ? বুড়ো হয়েছি আমি, এক দিন হা ক'রে ম'রে গেলেই হয়। তখন তাঁর পূজো কে কর্‌বে ?"

অগ্রসর হইয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল্‌চো, ঠাকুর্দ্দা ?"

"তোর বে'র কথা।"

দিব্য হাসিয়া বালিকা উত্তর করিল "কেন, তুমি ক'রবে।"

ঠাকুর্দ্দার মুখের দিকে চাহিয়া জ্যেষ্ঠা বলিলেন "হ্যাঁ, তা' হ'লেই যে ক'গাছা পাকা চুল আছে, তাও যেতে পারে ! না ঠাকুর্দ্দা, তুমি আমার বে ক'রো।" বলিতে বলিতে ঠাকুরের হাত ধরিয়া চলিলেন।
কহ্লন বলিলেন "আমি তোদের দু'জন্‌কেই বে ক'রবো।"

এমন সময় কোথা হইতে অকস্মাৎ একটি চিল আসিয়া একটা হংস-শাবক নখে করিয়া উড়িয়া গেল। ঠাকুর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "ওকি ও ! একটা হাঁসের ছা চিলে ছোঁ মেরে নিলে !"

অমলা বিস্ময়ে ঠাকুর্দ্দার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি কোনো কাজের লোক নও !"

"হাঁ, দিদি, আমার কোনো যোগ্যতাই নেই !"—তারপর আপনমনে বলিলেন "ভবানী মন্দিরের সাম্‌নেই এমন হ'লো ! এই কি মা তুই রক্ষাকর্ত্রী ? বুঝেছি, আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে, রাজবাড়ীতে কোনো অনর্থপাত হ'বে।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর্দ্দা, তুমি কি ভাব্‌চো ?"

[illegible] দৃষ্টিপাত করিয়া প্রফুল্লমুখী অমলা অমনি বলিয়া উঠিলেন "দিদি [illegible]কথা। কেমন, আমি ঠিক আঁচ করিনি !"

"হাঁ, করেছিস্; আমি তোরই কথা ভাব্‌ছিলেম্। আচ্ছা, অমল তুই আমায় বে ক'র্‌বি!"

হাসিয়া অমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, বুড়োবয়সে আবার এ সখ কেন!"

"আমি ম'রে গেলে, তুই ভবানীর পুজো ক'র্‌বি। কেমন রাজী আছিস্?" ঠাকুরের এবারকার স্বর পরিহাস-বিজড়িত নহে।

"খুব আছি।"

এমন সময় সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিয়া রাণী আসিয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাণী বলিলেন "বাবা, আজ কি নাত্‌নীদের পেয়ে মাকে ভুলে গেছ? এখনো যে ভবানীর পুজো হয়নি! অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে শেষে এখানে এসেছি!"

"হাঁ, মা, নাত্‌নী দু'টো আমাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুলেছে। চল মন্দিরে যাই।"

চলিতে চলিতে রাণী বলিলেন "বাবা, মাকে আজ জিজ্ঞাসা ক'রো ত', যবনের সঙ্গে যে লড়াই বাধ্‌লো, আমরা হার্‌বো না জিত্‌বো!"

স্থির দাঁড়াইয়া রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কহলন্ বলিলেন, বেধেছে!" মনে মনে ভাবিলেন "তাই বুঝি ঐ দুর্লক্ষণটা দেখলেম্। ভবানী, তোর ইচ্ছা।" আবার সকলে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কমলাবতী উত্তর করিলেন "মহারাজ যে জবাব দিয়েছেন, তা'তে নিশ্চয়ই বাধ্‌বে।"

"বাধুক, ভয় কি! মার নাম নিয়ে আমরা ডঙ্কা দেবো; তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।" বৃদ্ধের স্বরে তেজ ও উৎসাহ খেলিয়া উঠিল।

গদগদ কণ্ঠে রাণী বলিলেন "তুমি যা'দের সহায়, তা'দের আবার ভয় কি?"

এতক্ষণে সকলে আসিয়া মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। কহ্লন বলিলেন “কৈ, অমলা-বিমলা, আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী, গঙ্গা-যমুনা, দে তো বোন্, ফুলগুলো দে ;” তার পর রাণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন “এসো মা ভিতরে এসো।”

উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া রাণী ডাকিলেন “কৈলো অমল-বিমল, তোরা এলিনে ?”

অমলা বলিলেন “যাচ্ছি—তোমরা যাও। দেখ্ বিমল, আমি ঠাকুর্দ্দাকেই বে ক’র্‌বো।”

“মরণ আর কি ? এ আবার তোর কোন্ সখ ?”

“হাঁ, আমি ঠিক করেছি, ভবানীর পূজোরই আমি প্রাণ উৎসর্গ ক’র্‌বো।”

“তা’ যেন হ’লো : ঠাকুর্দ্দাকে বে করা কেন ?”

“তাইত তা’কে বে করা ; কহ্লন্ ঠাকুর যে-সে লোক নন্—স্বয়ং একলিঙ্গ ভীম ভৈরব।”

“আর তুই বুঝি তার ভৈরবী হবি ?”

“হাঁ ; তুই ও তা’কেই বে কর্।”

হাসিয়া বিমলা বলিলেন “নালো, বোন্-সতীন্ বড় জ্বালা ! লক্ষ্মীর-ভয়ে সরস্বতী কোন্ পদ্ম-বনে লুকিয়ে গেছেন।”

এমন সময় কহ্লন্ বাহির হইয়া আসিলেন “কৈ, এখনো যে তোরা এলিনে ?” “যাচ্ছি” বলিয়া দুইভগ্নী ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

—o—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হিন্দুস্থানে অভিযান প্রেরণ করাই চাই।

সেনাপতি কাশেম ও মন্ত্রী মহম্মদকে সঙ্গে করিয়া বাগ্‌দাদ্‌পতি মন্ত্রণা-কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ; প্রহরী সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

আসন পরিগ্রহ করিয়া কালিফ্‌ বলিতে লাগিলেন "কৈ, সিন্ধু থেকে দূত যে এখনো ফির্‌লো না ? কাফের অবিশ্বাসী, ধর্ম্মহীন—জাহাজ-আটকের মত দূতকে আবার আটক করেনি ত ?"

অভিবাদন করিয়া কাশেম্‌ বলিলেন "জাঁহাপনা,—অবিশ্বাসী হো'ক্‌ ধর্ম্মহীন হো'ক্‌, কাফের বীরের জাত—দূতকে তারা আটক কর্‌বে না। আমার বিশ্বাস, ক্ষতিপূরণ তারা দেবে না, যুদ্ধই ক'র্‌বে।"

মহম্মদ বলিলেন "তুমি নিজের মত সব্বাইকে দেখ কি না ! আমার খুবই বিশ্বাস, দূতের কোনো অমঙ্গল হয়েছে।"

কালিফ্‌ গর্জ্জিয়া উঠিলেন "যদি তাই হ'য়ে থাকে মন্ত্রি, কাফেরের তবে আর রক্ষা নাই। মুসলমানের দীপ্ত তরবারির আঘাতে ঝলকে ঝলকে কাফেরের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হ'বে ; তা'দের পুতুল দেবতা সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত হ'বে ; গ্রাম-নগর-জনপদ, সব, শ্মশানে পরিণত হ'বে।"

"দূতকে আটক করুক্‌, আর নাই করুক্‌ ; ক্ষতি-পূরণ দিক্‌, আর না দিক্‌, কাফেরের দেশে অভিযান পাঠাতে হ'বেই হবে। এতে ধর্ম্ম-অর্থ উভয়ই আছে। হিন্দুস্থান বড় মূল্যবান্‌ ; তার ভূগর্ভে, নদী-সৈকতে, পর্ব্বত-গহ্বরে, দেবালয়ে, মাঠে ঘাটে, অন্দরে বাহিরে, কেবল মনিমাণিক্য স্বর্ণ-রৌপ্যের খনি। হিন্দুস্থান ছাড়্‌বার জিনিষ নয়, জাঁহাপনা"—এই কথা কয়টি মন্ত্রীর মুখ হইতে বিনির্গত হইল। তাহার বৃদ্ধ দেহে অসীম তেজ, অদম্য উৎসাহ! তাহার সেই আনাভিলম্বমান তাম্রবর্ণ দাড়ি

নাড়িয়া যখন সে হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল, জীবনের বিনিময়ে সেই ঐশ্বর্য্যের কণাটুকু পাইলেও সে আপনাকে কৃতার্থমনে করিত।

উদ্‌গ্রীবভাবে তাহার কথা শুনিয়া, দেহ দীর্ঘীকৃত করিয়া কালিফ্ বলিতে লাগিলেন "তোমার কথায় মন্ত্রি! আর একদণ্ডও দেরী কর্‌তে ইচ্ছা হয় না! এমনই যদি হিন্দুস্থান্, তবে কেন ক্ষতিপূরণের জন্য অপেক্ষা করলে? যাই জাহাজ আটক করেছিল, অমনি অভিযান পাঠালে না কেন? কাশেম, আমি হিন্দুস্থান্ চাই—ই।" এমন সময় দৌবারিক আসিয়া সাভিবাদনে জানাইল, হিন্দুস্থান হইতে দূত ফিরিয়া আসিয়াছে। অমনি কালিফ্ বলিলেন "শীঘ্র তা'কে নিয়ে এসো।" দৌবারিক চলিয়া গেল; তখন কালিফ্, কাশেম্ ও মহম্মদ তিন জনেই নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া, চক্ষু যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া প্রবেশ দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কালিফ্ একজন দীর্ঘাকৃতি সুন্দর পুরুষ; বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ; কিন্তু বড় ইন্দ্রিয়াচারী; বেগম-মহল ছাড়িয়া কদাচিৎ তিনি রাজ-সভায় আসিয়া থাকেন। অহর্নিশ, নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদেই মুসলমান-সম্রাট্ উন্মত্ত। যে সময় যিনি তাঁহার প্রধানা বেগম, সে সময় তিনিই তাঁহার, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের, কর্ত্রী।

"বন্দেগি, জাঁহাপনা" বলিয়া দূত আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

মন্ত্রী বলিলেন "ফিরে এসেছ তুমি! এতক্ষণ তোমার কথাই হ'চ্ছিল। সিন্ধুপতি কি জবাব দিলেন?

দূত উত্তর করিল "এই সিন্ধু-পতির উত্তর," বলিয়া একখানা পত্র মহম্মদের হস্তে প্রদান করিল। পাঠ করিয়া, মন্ত্রীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া শুনাইলেন "রাজপুত ক্ষতি পূরণ দিতে জানে না।"

সিংহ-গর্জ্জনে কালিফ্ বলিলেন "কাফেরের এতবড় আস্পর্দ্ধা! আমার ঐশ্বর্য্য, সৈন্যবল, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা তা'কে বলেছিলে কি?

"কোনো ফল হয় নি, জাঁহাপনা।"

কালিফ্ বলিলেন "আচ্ছা—দেখা যাবে।"

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন "সিন্ধু-রাজের ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য কেমন দেখ্‌লে?"

দূত উত্তর করিল "অতুল রাজসভা, প্রবেশদ্বার হ'তে সিংহাসন পর্য্যন্ত মণিমাণিক্য-খচিত নেতের কাপড়-মণ্ডিত; রাজ-চরণ কখনো মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। যেখানে যেখানে রাজার গতিবিধি, সেখানে-সেখানেই সুবর্ণ-ধূলি বিক্ষিপ্ত; রাজ-সভায় তৈল-প্রদীপ কখনো প্রজ্বালিত হয় না; মধ্যাহ্ন ভাস্কর-বিনিন্দী মণিখণ্ড প্রদীপের কার্য্য করে। রাজ-সিংহাসন কত যে পদ্মরাগ অয়স্কান্ত-চুনীপান্নায় ঝল্‌ঝলায়িত, তার ইয়ত্তা করা এক দুরূহব্যাপার! সিন্ধুদেশ এ পৃথিবীর নয়, স্বর্গেরও স্বর্গ; ধন-রত্ন-সৌন্দর্য্যের পূর্ণ ভাণ্ডার!"

কালিফ্ জিজ্ঞাসা করিলেন "সেখানকার রমণীগুলো দেখ্‌তে কেমন?"

"জাঁহাপনা" দূত বলিতে লাগিল "অমন্ রূপ বুঝি জগতের আর কোথাও নেই। সিন্ধুভূমি যেমন ধন-ধান্যে, রজত-কাঞ্চনে, নদী-সৈকতে, পর্ব্বত-শৈলে, বৃক্ষলতায়, পুষ্পসম্ভারে অনির্ব্বচনীয়া সুন্দরী; সিন্ধু-দেশের রমণীগুলোও তেমনি চিরযৌবনে, বিলোল-নয়নে, কুঞ্চিত-কুন্তলে, গৈরিকবর্ণে, খঞ্জনগমনে, কলকণ্ঠে, সৌন্দর্যাচ্ছটায় তুলনারহিত! সে সৌন্দর্য্য বর্ণনার নয়, উন্মাদিনী কবিকল্পনার।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কালিফ্ বলিতে লাগিলেন "কাশেম, হিন্দুস্থান আমি চাই-ই। লক্ষ লক্ষ মুসল্‌মানের জীবনও যদি যায়, কোটি কোটি অর্থও যদি ব্যয় হয়, তবু আমি হিন্দুস্থান চাই। তুমি অনেক যুদ্ধ করেছ কাশেম; তোমার বীরত্বে শত্রুমিত্র মুগ্ধ হয়েছে; দেশবিদেশে

বাগদাদের নাম তুমি উজ্জ্বল করেছ; অনেক কাফেরের দেশে মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিজয়-নিশান তুমি উত্তোলিত করেছ। আমায় হিন্দুস্থান এনে দাও। বলিতে বলিতে কালিফ্ আসিয়া কাশেমের হস্ত ধারণ করিলেন; তৎপরে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "যুদ্ধ ঘোষণা কর; রাজকোষ উন্মুক্ত করে অস্ত্র-শস্ত্রে বাহিনী সুসজ্জিত কর। হপ্তার মধ্যে হিন্দুস্থানে অভিযান প্রেরণ করাই চাই।" আবার কাশেমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "আমার হারেমে হিন্দুস্থানী রমণী চাই; অনাঘ্রাত-অস্পৃষ্ট সুন্দরীদের বাগদাদে পাঠিয়ে দিও।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রেমের শিক্ষা।

আলোড়-রাজবাটী হইতে যে সুপ্রশস্ত রাজ-বর্ত্ম বাহির হইয়া সিন্ধুতীরে আসিয়া মিলাইয়াছে, তাহার উভয়পার্শ্বস্থ দৃশ্যরাজি বড় মনোরম। কোথাও বিচিত্রপত্র-পুষ্প-শোভিত, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত উদ্যান; কোথাও স্বর্ণ-চূড় শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত নানাভাবে গঠিত গগন-স্পর্শী দেব-মন্দির; কোথাও টল-টলজলপূর্ণ ক্ষুদ্রবৃহৎমৎস্য-সমাকীর্ণ দীর্ঘিকা; কোথাও ফল-ভারাবনত সুপারি-আম্র-নারিকেল-প্রভৃতি শ্রেণী-বদ্ধ বৃক্ষরাজীর বাগান; কোথাও আবার নানাবর্ণ-বিহগ-কূজন-মুখরিত, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কৃত্রিম শৈল-শ্রেণী। সিন্ধুতীরে, যেখানে এই রাজ-পথ আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে, সেনাপতি ভৈরবের গৃহ। সম্মুখে, মস্তকোপরি, দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড সিংহ-সমন্বিত বৃহদ্দ্বার তোড়ন; এই তোড়ন পার হইয়া গেলে, সবুজ শস্প-সমাচ্ছাদিত নাতিদীর্ঘ-নাতিপ্রশস্ত একটি আঙ্গিনা; ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে অত্যুচ্চ এক দেব মন্দির; পশ্চিমে দুইটি কক্ষ-সমন্বিত এক বৈঠকখানা দালান; আর উত্তরে আকাশ-রঙ্গে রঞ্জিত সুদীর্ঘ একটি

দ্বিতল প্রাসাদ। ইহার পর পারে আর এক আঙ্গিনা; তাহার তিন দিকে তিনটি নাতি বৃহৎ দালান। উত্তরের দালানটির পূর্ব্বপশ্চিম প্রান্ত বাহিয়া কঙ্করশোভিত নাতিপ্রশস্ত দুইটি পথ যাইয়া সুন্দর এক উদ্যান-মধ্যে, একটি অর্দ্ধচন্দ্র গঠিত করিয়া মিলিত হইয়াছে। ঠিক এইখানে, শ্বেতপ্রস্তরের একটি সোপান-শ্রেণী যাইয়া নাতিবৃহৎ একটি পুষ্করিণী-অঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে। ইহার তীরে-তীরে ফলপুষ্পের অনুচ্চ বৃক্ষ; মধ্যে মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তরে দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও বসিবার বেদী।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; চন্দ্রদেব শীতরশ্মি বিতরণ করিয়া উদ্যান-টিকে স্নিগ্ধ-শান্ত করিয়া তুলিয়াছেন; সব শান্ত-নীরব। এমন সময় পুষ্করিণী-সোপানে বসিয়া একটি যুবতী ও একটি বালক কথা বলিতেছিলেন।

যুবতী বলিলেন "হাঁরে মঞ্জুল, তোর প্রভু আজ এত দেরী ক'চ্ছেন কেন?"

বালক উত্তর করিল,—মুখে তাহার স্ত্রীজন-সুলভ কোমলতা ও স্নিগ্ধতার ভাব বিরাজমান—"ব'সে থাক্‌লে ত আর তার চলে না; তিনি যে সেনাপতি, তাঁর অনেক কাজ।"

যুবতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহার দৃষ্টি উদাস, স্বর আগ্রহ-হীন,—"তোর প্রভুকে তুই খুব ভালবাসিস্ কেমন?"

"না, মোটেই না।"

"আমায় ভালবাসিস্?"

"হিংসা করি।"

"কেন?"

"ব'লতে পারিনে।"

ক্রমেই যুবতীর আগ্রহ বাড়িতেছে; আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আমায় অত যত্ন করিস্ কেন?"

বালক উত্তর করিল "তিনি যে তোমায় ভালবাসেন—তাঁর সুখের জন্য।"

চন্দ্রের দিকে চাহিয়া যুবতী বলিলেন "তুই মেয়ে মানুষ হ'লে তাঁর সঙ্গে তোর বে দিতাম্।"

"তা দিতেনা—সতীন্ কেউ চায় না।"

"আমি চাই।"

"মিছে কথা।"

"না মঞ্জুল, সত্যি বল্‌চি।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

উভয়ে কতক্ষণ নীরব থাকিলেন। অকস্মাৎ জোৎস্না-স্নাত আকাশ কাঁপাইয়া, মাথার উপর একটা পাপিয়া ডাকিয়া গেল। যুবতী বলিলেন "আজ আমার মনটা বড় ভাল নেই।"

"গান করনা; গাইলে মন ভাল থাকে।"

"আমি যে জানিনে!"

"তবে আমি গাই; তুমি শোন।"

তখন চঞ্চল সরসীবক্ষ স্থির করিয়া, স্বর্গ-মর্ত্ত একাকার করিয়া বালক সুর ধরিল—

আমি সেধে প্রাণ দিছি পরের চরণে,
অনাদরে তাই অশ্রু ঝরেনা নয়নে।
চাইনে তার ভালবাসা
নাইগো হৃদে কোন আশা,
সুধু মর্‌তে এসেছি আমি পরের মরণে—
তাই প্রাণ দিছি হেসে পরের চরণে।

উভয়ে যখন সঙ্গীত-স্রোতে আপনা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন সেই সময় ভৈরব আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন; কেহই জানিতে

পারেন নাই। যখন শেষ হইল, তখন উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন "বাঃ! মঞ্জুল, বেশ ত' গাইতে পারিস্।"

আগন্তুকের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যুবতী বলিলেন, "হাঁ, ও খুব ভাল গায়, মাঝে মাঝে আমায় শোনায়।"

বালক মাটির দিকে চহিয়া বলিল "আমি এখন যাই!"

যুবতী উত্তর করিলেন "না আর একটা গেয়ে তবে যাবি।"

সেনাপতি বলিলেন "আমি যে গান ভালবাসিনে।"

অমনি প্রভুর মুখপানে চাহিয়া মঞ্জুল বলিয়া উঠিল "তবে থাক্।"

যুবতী একটু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন "তুমি কেমন মানুষ! সারাটা দিন যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা ভেবে ভেবে মন তোমার নীরস হ'য়ে গেছে! তোমার মত মানুষের বিয়ে করা ঠিক হয়নি!"

হাসিয়া ভৈরব উত্তর করিলেন "আগেই যদি মঞ্জুলকে পেতেম, তাহ'লে আর কে বিয়ে কর্‌তো!"

বালক বলিল "আমি যাই।"

বাধা দিয়া সেনাপতি বলিলেন "না বোন্, তোকে আমার বড় ভাল লাগে।"

ঈর্ষা-দুষ্ট কণ্ঠে যুবতী বলিলেন "তবে মঞ্জুলকে নিয়েই থাক। আজ থেকে তোর প্রভুকে দেখিস্, মঞ্জুল, এখন হ'তে তুই স্ত্রী, আমি দাসী।"

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কাতর কণ্ঠে বালক উত্তর করিল "চাকর আমি—আমার সঙ্গে পরিহাস করা সাজে কি?"

বিষাদ-বিজড়িতস্বরে যুবতী বলিতে লাগিলেন "না, মঞ্জুল, আমি পরিহাস কচ্ছিনে; আমি অনেক দিনই বুঝেছি, আমায় নিয়ে তাঁর সুখ নেই! ক্ষত্রিয় তিনি, তাতে আবার সেনাপতি; যুদ্ধই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র; যুদ্ধেই তাঁর সুখ। ভালবাসতে তিনি সংসারে আসেন নি। আর আমি তাঁর পথে কাঁটা হ'য়ে থাক্‌বো না।"

পত্নীর হস্ত ধারণ করিয়া ভৈরব বলিলেন "তুমি রাগ করেছ ভীমা? আমিত কোন অন্যায় কথা বলিনি! তা এখন থাক্, পরে বুঝা যা'বে। আমায় আবার এখনি যেতে হ'বে। যুদ্ধ অনিবার্য্য হ'য়ে পড়েছে, আমায় সব যোগাড় যন্ত্র দেখ্‌তে হ'চ্ছে। এটার নিবৃত্তি হ'য়ে গেলে আমি তোমায় খুব ভালবাস্‌বো।"

পূর্ব্ববৎ উদাস ভাবে ভীমা বলিলেন "তা, বেসো। আমার সঙ্গে বিয়ে না হ'লে তুমি অনেক উন্নতি ক'র্‌তে পার্‌তে। আমি এতদিন বুঝ্‌তে পারিনি—আমায় তুমি ক্ষমা কর," তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল, "আমি এখন বেশ বুঝেছি, আমিই তোমার প্রধান শত্রু। বীর তুমি—আমি তোমায় ঘরে আটক রাখ্‌তে চেয়েছিলেম! এখন আমার ভুল ভেঙ্গেছে। যাও তুমি, অবসর মত দেখা দিও।"

বোধ হইল, ভৈরব স্ত্রীর কথায় লক্ষ্য করেন নাই। আপনার বক্তব্য তিনি বলিতে লাগিলেন "আমায় আজই শেষরাত্রে একবার দেবলে যেতে হ'বে। মঞ্জুল্, যা'বার সব ঠিক ক'রে রাখিস্। আমি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে শিগগিরই ফিরে আস্‌চি।" বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

ভীমার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে মঞ্জুল্ বলিল "ওকি! তুমি কাঁদ্‌চো!—নিতান্তই ছেলে মানুষ!"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বালকের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি পাত করিয়া ভীমা বলিতে লাগিলেন "এই আমার শেষ কান্না, মঞ্জুল্। আমি তাঁ'কে বড় ভালবাসি; একটি দণ্ডের জন্যও তাঁ'কে ছেড়ে দিতে আমার প্রাণে বড় লাগ্‌তো! কিন্তু চিরদিনই তিনি এমন ভাবে চ'লে গেছেন! একটি দিনও আমায় আদর করেন নি!"

সান্ত্বনা দিয়া মঞ্জুল্ বলিল "এতে দুঃখ কেন? পুরুষ তিনি; ঘরের কোণে ব'সে তোমার চোখ্ মুছিয়ে দেবার জন্য তাঁর জন্ম হয় নি। স্ত্রী

তুমি—ভালবাসা, আদর করা, সেবা-শুশ্রূষা করা তোমার কাজ; কর্ত্তব্য ক'রে অবসর মত তিনি এসে তোমায় আদর ক'র্‌বেন; তাই তাঁর কাজ।"

"আজ বুঝলেম্—এতদিন বুঝিনি। চল মঞ্জুল্, তোমার প্রভুর জিনিষ-পত্র ঠিক ক'রে রাখিগে।" চলিতে চলিতে মঞ্জুল্ বলিতে লাগিল "সুখ যদি চাও, ভালবাসা দিও; নিতে যেও না। চাইতে গেলে, ভালবেসে সুখ পাওয়া যায় না। কেব'লি কাঁদ্‌তে হয়।"

—o—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভগিনীতে ভগিনীতে।

বেলা দ্বিতীয়প্রহর। আহারান্তে রাজা দাহির আসিয়া বিশ্রামাগারে উপবেশন করিয়াছেন; পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাণী কমলাবতী স্বহস্তে তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছেন। রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া দাহির সবিস্ময়ে বলিলেন "তুমি যে আমায় অবাক্ ক'র্‌লে কমলে! সত্যি কি অমল বাবা কহ্লন্ ঠাকুর কে বিয়ে ক'র্‌তে চাচ্ছে?"

"হাঁ, বিমল ত' তাই ব'ল্‌চে।"

রাজা আবার বলিলেন "ঠাকুর কি ক'র্‌বেন? তা'হ'লে ত' আমার পরম সৌভাগ্য। দ্যাখ রাণি, কথাটা যখন উঠেছে, তখন একটা কথা বলি, শোন। কাল রেতে আমি স্বপ্ন দেখেছিলেম্, অমলা যেন আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—অমন্ শান্ত-সুন্দর নয়; ভীমা ভৈরবীমূর্ত্তি! হেসে হেসে আমায় ব'ল্‌চে 'বাবা, আমায় বিয়ে দেবে না।' আমি বল্লেম্ 'দেবো। তুই অমন্ দেখাচ্ছিস্ কেন?' গম্ভীর ভাবে সে উত্তর ক'র্‌লে এখন যে আমার এ রূপেরই দরকার; আমি যে দনুজদলনী!"

এমন সময় বিভূতিভূষিতাঙ্গ, রুদ্রাক্ষ-লাঞ্ছিতবক্ষ কহ্লন্ ঠাকুর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বসময়, সর্ব্বত্র তিনি অবারিত-দ্বার।

সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজারাণী তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। বসিতে বসিতে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন "হাঁ, দাহির, বড় ভাগ্যবান্ তুমি; অমলা দিদি আমার সত্য সত্যই দনুজদলনী, মা ভবানী স্বয়ং এসে তোমার ঘরে জন্ম নিয়েছেন।"

সৌৎসুক্যে রাণী বলিয়া উঠিলেন "তবে আর তা'র বি'য়ের জন্য আমরা অত ভাবচি কেন?" ভোলানাথ যে স্বয়ং আমার ঘরে বাঁধা রয়েছেন!

"সে কথা বলতেই আমি এসেছি; দাহির, ওকে দেবতার নামে উৎসর্গ কর।"

সাগ্রহে রাজা বলিলেন "এই দণ্ডে! কিন্তু, বাবা, সত্যি কি তুমি ওকে গ্রহণ ক'রবে?"

"দিদি আমার ভবানী; আমি অতি ক্ষুদ্র! স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের হাতে তাঁকে সমর্পণ কচ্ছি। তোমার নাম-বংশ উজ্জল হবে। যুদ্ধের আর কোনো খবর পেলে কি?"

রাজা উত্তর করিলেন "না, এখনো কোনো সংবাদ এসে পৌঁছায়নি! ফলাফল কি হ'বে, বাবা, ভবানীকে কি জিজ্ঞাসা করেছ?"

স্থিরদৃষ্টিতে রাজার দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন "হাঁ, জিজ্ঞাসা করেছি; তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—বংশে তোমার কালি পরবে না।" তার পর আপনা আপনি যেন বলিলেন "ভবানি, তোর ইচ্ছা।"

এমন সময় অমলা-বিমলা আসিয়া চঞ্চলচরণে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিমলা বলিলেন "কি ঠাকুর্দা, তুমি এখানে?" সারাটা বাগান খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে গেছি!"

স্নেহবিগলিত স্বরে কহলন্ বলিলেন "আয় বোন্, আয়। আমায় একটু খুঁজবিনে? তোদের খুঁজে খুঁজে আমি কত হয়রাণ হয়েছি; মাথার চুল পাকিয়েছি!"

হাসিয়া বিমলা উত্তর করিলেন "নাও, এখনত' পেয়েছ! একগাছা পাকা চুল ও আর থাকুচে না! দিদি, দে না চুল গুলো সব উপড়ে!"

দাঁড়াইয়া ঠাকুর বলিলেন "তবে আগামী পূর্ণিমায় দিদির আমার বিয়ে হ'বে। আমি এখন যাই; দাহির তুমিও আমার সঙ্গে এসো; কথা আছে।" দাহির ও কহ্লন্ চলিয়া গেলেন।

স্নেহে বালিকাকে ক্রোড়ে টানিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া রাণী বলিলেন "মা কমল, তুই আমাদের বড় লক্ষ্মীমেয়ে। তোর জন্যই ভগবান্ ভীমভৈরব আমাদের ধরা দিলেন। যুদ্ধের কথা বাবা তোকে কি কিছু ব'লেছেন?"

গম্ভীরস্বরে উত্তর হইল, "বলেছেন। তোমাদের বল্‌তে নিষেধ আছে।"

রাণীর প্রাণে আশঙ্কা বাজিয়া উঠিল। উদ্বিগ্নিত স্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন "কেন, কোনো অমঙ্গল হ'বে না ত?"

"অমঙ্গল আবার কি মা? ভবানী যা'দের সহায়, তা'দের আবার অমঙ্গল কি?"

"না, মা, আমি বাবার মুখে সব শুন্‌বোই।" দ্রুতপদে রাণী প্রস্থান করিলেন।

বিমলা আসিয়া দিদির গলা ধরিয়া বলিলেন "আমায় বল্‌না দিদি।"

"তোকে?—আচ্ছা, মনে কর্ এই যবন-যুদ্ধে বাবা মারা গেলেন—"

তাড়াতাড়ি কনিষ্ঠা বলিয়া উঠিলেন "না দিদি, ও কথা বলিস্‌নে! আমি কেঁদে ফেল্‌বো; আমার বড্ড ভয় করে!"

"ভয় কি! বাবা মা'রা গেলে, তুই কি করিস?"

"না, আমি সে কথা ভাব্‌তেও পারিনে। বল্‌না দিদি কি হ'বে?" বালিকার স্বরে ভীতি-বিজড়িত কাতরতা প্রকটিত হইয়া উঠিল।

গম্ভীরভাবে অমলা উত্তর করিলেন "যবন সিন্ধু দখল কর্‌বে। কথা যেন প্রকাশ হয় না, ঠাকুর্দ্দার নিষেধ আছে।"

বিমলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন "তবে কি শেষে আমরা যবনের হাতে পড়্‌বো!" তিনি দিদিকে ঘেষিয়া বসিলেন।

তেজোদ্দীপ্ত স্বরে জ্যেষ্ঠা বলিলেন "পড়্‌লেম্‌ই বা! আমি ইচ্ছা করেই যবনের হাতে ধরা দেবো। শেয়াল-কুকুরের মত ম'রে ফল কি? প্রতিহিংসা জীবনের মূল মন্ত্র ক'রে, যেমন করে পারি, যত দিনে পারি, বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবোই নেবো। বিমল, সব সময় মনে রাখ্‌বি, এমন মরা ম'রতে হবে, যেন মরেও বেঁচে থাকা যায়।"

বিশুষ্ক মুখে, কাতর দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাহিয়া বিমলা উত্তর করিলেন "না দিদি, মরার কথা আর বলিস্‌নে। চল মার কাছে যাই।"

বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমলা বলিলেন "তুই যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি। সাবধান, কথা যেন প্রকাশ হয় না, তবে কিন্তু মর্‌বি।" কনিষ্ঠা অবসন্ন ভাবে চলিয়া গেলেন।

তখন দক্ষিণ জানুর উপর দক্ষিণ কনুই স্থাপনপূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার উপর চিবুক বিন্যস্ত করিয়া যুবতী ভাবিতে লাগিলেন "এত কি অপরাধ করেছি, ভবানি যে, আমার পবিত্র সিন্ধু তুই যবনের পদ-লাঞ্ছিত কচ্ছিস্‌! আজ ক'পুরুষ তোর পূজা ক'রে আস্‌চি, এই বুঝি তার পুরস্কার দিলি! বেশ—যা তোর ইচ্ছা; তাই আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু এইটুকু করিস্‌ মা, ম'রবার আগে যেন প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে মর্‌তে পারি।" ভাবিতে ভাবিতে যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, ওষ্ঠ দন্তপিষ্ট। অধীরভাবে পদ-চারণা করিতে করিতে আবার বলিলেন "আমার বুক পুড়ে খাক্‌ হ'য়ে যাবে—আর শত্রু সুখে থাকবে? না, মা, তোর ইচ্ছা যাই কেন হোক্ না; আমি তা হ'তে দিচ্ছিনে!" বলিতে বলিতে যুবতী বাহির হইয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুল্তানা বেগম।

একটি সুসজ্জিত কক্ষ; প্রাচীর-গাত্রে প্রেমিকপ্রেমিকার নানা ভাবের সুরঞ্জিত চিত্র বিলম্বিত; কোণে কোণে মার্ব্বেল পাথরের দিগম্বরী রমণী-মূর্ত্তি সরাবের বোতল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চারিদিকের দেয়ালের সঙ্গে, ঠিক মধ্যস্থলে, চারিহস্তদীর্ঘ চারিটি রৌপ্য-মুকুর। মধ্যস্থলে মর্ম্মর প্রস্তরের বৃহৎ একটি ডিম্বাকৃতি টেবিল; টেবিলের উপরে নানাবিধ স্বর্ণ-রৌপ্য-পাত্রে, নানারংএর সুরুয়া ও সরবৎ সুসজ্জিত রহিয়াছে। টেবিলের চারিপাশে বিবিধকারুকার্য্য-বিশিষ্ট চারিখানা কেদারা। গৃহের ঠিক কেন্দ্রস্থলে, ছাদ হইতে বিলম্বিত স্বর্ণ-শৃঙ্খলে, একটি রৌপ্য-প্রদীপ জ্বলিতেছে।

ইহা কালিফের প্রধানা মহিষী [illegible]ল্তানা বেগমের পান-কক্ষ। সুল্তানা সুন্দরী, যুবতী, নৃত্যগীতাভিজ্ঞা, সুরসিকা। কালিফ এখন ইঁহাকে লইয়াই উন্মত্ত। রাজ্যে ইঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ইঁহার নামে আমীর-ওমরাহের উষ্ণীশ মৃত্তিকা স্পর্শ করে; ইঁহার অঙ্গুলি-সঞ্চালনে সমগ্র মুসলমান-জগৎ চালিত হইয়া [illegible] সুল্তানা স্নেহময়ী, প্রেম-ময়ী; শত-শত বেগম—সুন্দরী [illegible]বতী—সত্ত্বেও কালিফ ইঁহারই প্রেম-চন্দ্রিকার উন্মত্ত চকোর [illegible]ন্তু সুল্তানা বড় অভিমানিনী;—কাল্পনিক অনাদর উপেক্ষায়ও তাঁহার প্রাণে প্রখর অনল জ্বলিয়া উঠে।

ঐ যে একটি গদিযুক্ত সুন্দর কেদারায়, মস্তক হেলাইয়া, কুঞ্চিত কুন্তলরাজি দোলাইয়া, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা যুবতীকে উপবিষ্টা দেখিতেছেন, ইনিই সুল্তানা বেগম।

হঠাৎ কালিফ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পদশব্দে যুবতী

একবার চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, আবার পদ্মপলাশনয়ন-যুগল নিমীলন করিতে করিতে ধীরে ধীরে বলিলেন "যা' হোক্, মনে যে পড়েছে !"

কালিফ আসিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, চিবুকোত্তোলনপূর্ব্বক যুবতীর পক্কবিম্বাধরোষ্ঠে চুম্বন করিয়া বলিলেন "না, সুলতানা, প্রাণেশ্বরি আমার, আমার হৃদ্‌কমলবাসিনি, আমার মনোশ্চকোরচন্দ্রিকে, এ পান-কক্ষে আর আমার সুখ নেই ! এতদিন আমি মনে করতেম, বাগদাদ্ পৃথিবীতে স্বর্গ ! আমার ভুল ভেঙ্গেছে,—হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে বাগদাদে আর আমার সুখ নেই !" একটি কেদারা নিকটে টানিয়া কালিফ বসিয়া পড়িলেন ।

ইতি মধ্যে শ্বেত কৃষ্ণ-বাদামি রংএর সুসজ্জিতা যুবতী-পরিচারিকাগণ স্বর্ণ-রৌপ্য-পাত্রে নানাবিধ সুস্বাদ ফল ও আহার্য্য রাখিয়া দরোজার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে । আচমন কার্য্যের জন্য স্বর্ণ-গাড়ুতে সুবাসিত জল লইয়া, একটা যো[illegible] যুবতী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ।

উঠিয়া বসিতে বসিতে সুলতানা কহিলেন "তোমার কেবল কথাই সার ! সে ঐশ্বর্য্য পেতে কিছু চেষ্টা করেছে কি ? আমি আর তোমায় কিছু ব'ল্‌বো না । হাজারো-একের মধ্যে একজন বই ত নই ! দাসী-বাঁদীর কথা শোন্‌বারও মানুষ থাকে । আমার কথা কে শুন্‌বে !" বেগম রুমালে চক্ষু আবৃত করিয়া ধা[illegible]ইয়া, মুখ ফিরাইয়া বসিলেন ।

আরো নিকটে আসিয়া, [illegible]াইয়া, চিবুক ধরিয়া, কোটি কোটি লোকের ভাগ্য-বিধাতা সাহানশা কালিফ কাতরস্বরে বলিলেন "কেন সুলতানা, তোমার কথা শুন্‌বার জন্য মুসলমান-সম্রাট্ আমি রয়েছি । আমি নিশ্চিন্ত নই ; সে ঐশ্বর্য্য পেতে শিগ্‌গিরই আমি হিন্দুস্থানে অভিযান পাঠাচ্ছি । আর কেউ নয়, কাশেম নিজে যা'বে । আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, সিন্ধুর সমস্ত ঐশ্বর্য্য এনে তোমার ও রাঙ্গাপায়ে উপহার দেবো । চাও, একটিবার আমার দিকে চাও ।"

কুটীলকটাক্ষ করিয়া যুবতী বলিলেন "আচ্ছা, মনে থাকে যেন্ আজ তুমি, অতুলক্ষমতাশালী বাগদাদের অধিপতি, প্রতিজ্ঞা কর্‌লে। দেখবো সম্রাটের প্রতিজ্ঞার মূল্য কত!" একপাত্র সরাবের অর্দ্ধেকটা একটানে নিঃশেষিত করিয়া তিনি সম্রাটের হাতে দিলেন। সুন্দরীর ওষ্ঠস্পৃষ্ট সেই সরাবটুকু নিতান্ত কৃতকৃতার্থের মত পান করিয়া হাসিতে হাসিতে কালিফ বলিলেন" তা, দেখো প্রেয়সি! যতদিন না কাশেম সিন্ধুজয় করেছে, তত দিন আর আমার আহারে তৃপ্তি নাই; বিহারে আমোদ নাই; শয়নে নিদ্রা নাই।" একপাত্র মদ ঢালিয়া তিনি বেগমের মুখের সম্মুখে ধরিলেন; যুবতী তাহা নিঃশেষ পান করিয়া ঢুলু-ঢুলু চোখে বাদশার দিকে চাহিয়া বলিলেন "দু'টো একটা বেগম বাড়্‌বে না?"

চুম্বন করিয়া কালিফ্ বলিলেন "হাজার বাড়্‌লেও, সুলতানা বেগমই আমার মাথার মণি, চোখের তারা।"

কালিফ-বেগম পানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবতী পরিচারিকারা রাজ দম্পতির মনোরঞ্জনার্থ সঙ্গীত-সহযোগে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। নাচের তালে তালে, সঙ্গীতের লহরীতে লহরীতে, আমোদ যেন উচ্ছসিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কালিফের জানুর উপর উপবেশন করিয়া, তাহার স্কন্ধে মাথা হেলাইয়া, বিলোল কটাক্ষ করিয়া, সুলতানা বলিলেন "প্রিয়তম!"

সোহাগ-সিক্ত কণ্ঠে, কালিফ ত্রস্ত উত্তর করিলেন "কেন প্রিয়তমে?"

"আমার মাথায় হাত দিয়ে তুমি শপথ কর, সিন্ধুর ঐশ্বর্য্যের একটি কাণাকড়িও তুমি তোমার উপপত্নীদের দেবে না?"

তাঁহার মস্তক হাতে লইয়া চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া কালিফ বলিলেন "শপথ কচ্ছি, দেবোনা।"

"আর একটি শপথ কর?"

"কি?"

"সিন্ধুজয়ের পরে তুমি আমায় একটি হীরের ঘর ক'রে দেবে।"

"দেবো—শপথ কচ্ছি।"

বাদশা-বেগম টলিতে টলিতে উঠিয়া গেলেন। তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া পরিচারিকাগণ কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়া দিল।

—o—

দশম পরিচ্ছেদ।

মর্জ্জিনার নিকট বিদায়।

শয়ন-কক্ষে মর্জ্জিনা-বিবি উন্মাদের ন্যায় পদচারণা করিতেছেন; কখনো শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িতেছেন, আবার তখনি উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। এ কি ভাব তাহার!

কতক্ষণ এই ভাবে কাটাইয়া, গবাক্ষসমীপে আসিয়া মর্জ্জিনা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন। আনন্দে মাতোয়ারা পূর্ণিমার চন্দ্র তর্-তর্ করিয়া আকাশে উঠিয়াছেন; কখনো মেঘের উপর লুটাইয়া পড়িতেছেন; আবার উঠিয়া, রজঃশুভ্র হাসিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মর্জ্জিনা কতক্ষণ ইহাই দেখিলেন। শেষে যাইয়া অবসন্ন ভাবে শয্যায় বসিয়া পড়িতে পড়িতে বলিলেন "এমন ত' কোনো বার হয়নি! প্রাণেশ্বর আমার কত ত' যুদ্ধে গেছেন; কৈ, একটি দিনও ত' তাঁর মৃত্যুভয় আমার মনে আসেনি! এবার আমার হ'লো কি?" আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন "দূর হোক্ ছাই! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুর্ব্বলতা বোধ হয় বাড়ে! শেষে হয় ত' এমন হ'বে যে কাশেম, ঘরের বাইরে গেলেও আমি অস্থির হয়ে উঠ্‌বো! ছাই-পাশ আর ভাব্‌তে পারিনে। একটু গাই ব'সে।" গবাক্ষ-সমীপে উপবেশন করিয়া

মর্জ্জিনা তখন গান ধরিলেন। দু'চারি পদ গাহিয়াই আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "না কিছুই যে ভাল লাগ্‌ছে না! এবার তাঁকে বিদায় দিতে মন যে মোটেই স'র্‌চে না! কি ক'র্‌বো? আমি আপত্তি কর্‌লে প্রাণেশ্বর যাবেন না, নিশ্চয়; কিন্তু তা'তে যে তাঁ'র কলঙ্ক হবে—কালিফ বিরক্ত হ'বেন!"

এমন সময় যোদ্ধৃবেশে কাশেম আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিস্মিত হইয়া মর্জ্জিনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ওকি প্রিয়ে! তোমার হয়েছে কি? তোমায় অমন্ দেখাচ্ছে কেন!"

দৌড়িয়া যাইয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তিনি বলিলেন "এসেছ তুমি? এবার তোমায় আমি ছেড়ে দেবো না।"

প্রাণের আবেগে চাপিয়া ধরিয়া কাশেম বলিলেন "দিওনা। তুমি কি ভাব্‌ছো প্রিয়তমে?"

"তোমার কথাই ভাব্‌ছিলেম্। আচ্ছা তুমি না গেলে আর কেউ কি যুদ্ধে যেতে পারে না? এবার তুমি না গেলে?" আশায় যুবতী স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন!

বিস্মিত কাশেম বলিলেন "এ আবার কি মর্জ্জিনা! আমার সাহস, বুদ্ধি, বল, ভরসা সকলই তুমি; তোমার এই সুন্দর মুখখানা মনে করেই শত-সহস্রবার শত্রুর দীপ্ত তরবারি আমি উপেক্ষা করেছি। তোমারি উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে অসংখ্য যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আমি ফিরে এসেছি। আজ তোমার হ'লো কি মর্জ্জিনা?" পত্নীকে কোলে লইয়া মহাবীর কাশেম উপবেশন করিলেন।

"কি যে হয়েছে বল্‌তে পারিনে; নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।" নখাগ্র খুঁড়িতে খুঁড়িতে এই কথা কয়টি বলিয়া অতৃপ্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "যুদ্ধে যা'বে মনে হ'লেই আজ প্রাণ আমার বড় অস্থির হ'য়ে পড়ে; যেতে দিতে ইচ্ছা হয় না।

কি এক অনির্দ্দিষ্ট অশুভ আশঙ্কায় হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। জানিনা, কপালে এবার আমার কি আছে! তুমি যেওনা, প্রিয়তম।”

মর্জ্জিনার কথা শুনিয়া মনে মনে কাশেম ভাবিতে লাগিলেন “যুদ্ধ-যাত্রায় মর্জ্জিনা কখনো প্রতিবাদিনী হ'বে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! তার এ ব্যাকুলতা কি বাস্তবিকই কোন ভবিষ্য অনিষ্টের পূর্ব্বাভাষ!” তার পরে, মানসিক অবসাদ দূরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, পত্নীর শিরে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন “প্রেয়সি আমার, তুমি কোনো দুশ্চিন্তা ক'রোনা। তুমি যার স্ত্রী, তার কোনো অমঙ্গল হ'তে পারে না।”

স্বামীর পদ-প্রান্তে যুবতী জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন; ও তাহার উরুদ্বয় মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিলেন “না, যতই ভাবচি, তুমি যা'বে, ততই আমার মন অস্থির হ'য়ে উঠ্‌চে! এবার আমি তোমায় কিছুতেই যেতে দেবো না। যা নাম হয়েছে, যা যশ হয়েছে, তাই আমার যথেষ্ট!”

পত্নীর মুখ তুলিয়া, তাহার চক্ষুতে চুম্বন করিয়া, বীরপুরুষ আবার বলিলেন “না, মর্জ্জিনা আমার, নামের জন্য, যশের জন্য, আমি যুদ্ধে যাচ্ছিনে। তোমার প্রাণে আঘাত দিয়ে নশৈশ্বর্য্য আমি কিছুই চাইনে। সিন্ধুজয়ের উপর কালিফ সমগ্র প্রাণের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা নিক্ষিপ্ত ক'রে বসে আছেন। এখন যদি আমি না যাই, তবে কি আর রক্ষা থাক্‌বে?—শেষে কালিফের ও সুলতানা বেগমের ক্রোধে শেয়াল-কুকুরের মত আমায় ম'র্‌তে হ'বে!”

অবসন্নভাবে নিতান্ত উপায়হীনার মত, মর্জ্জিনা বলিলেন “সকলই বুঝীতে পারি, প্রিয়তম। কিন্তু মন যে কিছুতেই মানচে না! অন্ততঃ, আজকার এ রাত টুকু আমায় ভিক্ষা দাও।”

ধীর-গম্ভীরে কাশেম উত্তর করিলেন “আজ না গেলেই নয়! কালিফের আদেশ কেমন ক'রে অমান্য ক'রবো? লোক-লস্কর, অস্ত্র-শস্ত্র

সব উঠেছে; আমি গেলেই এখন জাহাজগুলো ছাড়বে। শোন, মর্জ্জিনা, হৃদয় শান্ত কর। আমার কোনো অমঙ্গল হ'বে না।"

তড়িদ্বেগে দাঁড়াইয়া যুবতী সতেজে বলিতে লাগিলেন "কালিফের আদেশ কেমন ক'রে অমান্য ক'রবে! কেন, তুমি কি একা কালিফেরই? আমার কি কোন দাবী নেই! আমি না দিলে, কেমন ক'রে কালিফ তোমায় নেন্, আমি দেখ্বো।" তার পরে আবার স্বামীর গলা জড়াইয়া কাতরস্বরে বলিলেন "একটি রাত কালিফের পায় ধ'রে ভিক্ষা চাইবো। আজ তুমি কিছুতেই যেতে পার্বে না।"

"সিন্ধুজয় কালিফের প্রাণের মন্ত্র। একদিন, এক মুহূর্ত্তও, তিনি তোমায় ভিক্ষা দেবেন না! তুমি অত উতলা হ'য়োনা, মর্জ্জিনা; আমার কোনো বিপদ্ ঘট্বে না।"

এমন সময় নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, নিদ্রিত বাগদাদ্‌বাসীদিগকে সচকিতে জাগরিত করিয়া "আল্লা, আল্লা হো ধ্বনি" সদরদরোজার সম্মুখে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

মর্জ্জিনা সবলে আসিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "যেওনা, তোমার পায়ে পড়ি, আজ রেতে তুমি যেওনা। এদের বিদায় ক'রে দাও।"

ধীরে ধীরে কাশেম বলিলেন "মর্জ্জিনা, তবে কি কুকুর-বিড়ালের মত ম'র্বো, এই তোমার ইচ্ছা? আচ্ছা, দিচ্ছি আমি সৈন্যদের বিদায় ক'রে!" পত্নীর মুখের উপর কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দরোজার দিকে তিনি দুই পা অগ্রসর হইলেন।

যুবতী তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "না, না, আমি তোমায় কলঙ্কিত দেখ্তে পার্বো না। যাও তুমি, প্রাণেশ্বর; খোদা তোমায় রক্ষা ক'র্বেন।"

পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া কাশেম বলিলেন "দাও, হাসি মুখে আমায়

বিদায় দাও।" আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া উভয়ে কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। মর্জ্জিনা প্রসন্ন মুখে বিদায় দিলেন; কাশেম চলিয়া গেলেন।

যে পথে কাশেম গিয়াছেন, সেই পথের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া মর্জ্জিনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, যতক্ষণ শোনা গেল, ততক্ষণ সৈন্য-কোলাহল শুনিতে লাগিলেন। শেষে যখন দিক্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, নদী-বক্ষ হইতে "জয় সেনাপতি কাশেমের জয়" ধ্বনি উত্থিত হইল, তখন "এমন বীর স্বামী আমার! তাঁকে আমি ঘরে রাখ্‌তে চেয়েছিলেম!" বলিতে বলিতে যুবতী দ্বার রুদ্ধ করিলেন।
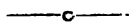
একাদশ পরিচ্ছেদ।

জোবেদী ও মর্জ্জিনা।

চলুন পাঠক, অনেক দিন জোবেদীকে দেখি নাই, আজ একবার তাহাকে দেখিয়া আসি।

সেই সন্ধ্যায় কাশেম কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবধি তাহার আহার নিদ্রা দূর হইয়াছে; কখনো তিনি অপমানের দারুণ জ্বালায় পাগল হইয়া উঠিয়াছেন; কখনো অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বৃশ্চিক-দংশনে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়াছেন "হায়! আমি মরিনা কেন?" আবার মুহূর্ত্ত পরেই, মর্জ্জিনার জন্যই তাহাকে এ যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে মনে পড়িয়া, সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়াছেন "আমার প্রাণে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া এখনো তাহাকে কাশেম লইয়া সুখী? আমি যদি জ্বলিলাম, তবে সে সুখী হইবে কেন? মর্জ্জিনা সুখী হইবে কেন?" এমন ভাবে ভাবিয়া ভাবিয়া যুবতী অগ্নিতে কেবল ঘৃতাহুতিই করিয়াছেন—কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

গত রজনীতে আর তাহার চক্ষুর পাতা লাগে নাই। বাগ্দাদ্ হইতে কাশেমের প্রস্থানকালের সেই আল্লা-আল্লাহো ধ্বনিতে তিনি শয্যা হইতে চমকিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন—এত দিন তবু কাশেম কাছে ছিল; চেষ্টায় তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা ছিল—আজ ত' কাশেম তাহার হাত ছাড়াইয়া দূরে অতিদূরে চলিয়া গেল! উঃ, জ্বালার উপর জ্বালা! কল্পনার চোখে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, কত আদর করিয়া, কত সান্ত্বনা দিয়া, কত সোহাগ করিয়া সে মর্জ্জিনার নিকট হইতে বিদায় লইতেছে। এই সোহাগ-সিক্ত বিদায়-বাতনা ক্লিষ্ট মর্জ্জিনার মুখখানা তাহার মানস দৃষ্টির নিকট একই সময়ে রৌদ্রবৃষ্টি-স্নাত প্রফুল্ল পদ্মটির মত বোধ হইতে লাগিল: হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া তিনি শয্যায় উপর হইয়া পড়িলেন। যখন উঠিলেন, তখন তাহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে; অধরোষ্ঠ চাপিয়া আসিয়াছে; সমস্ত মুখে কেমন যেন একটা পৈশাচিক সংকল্পতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তখন বেলা হইয়াছে; গবাক্ষ দিয়া প্রভাতের অরুণরাগ আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছে। জোবেদী উঠিয়া বসিলেন; চক্ষুতে তাহার আতঙ্ক-সঞ্চারী কেমন এক রকম নষ্ট হাস-রেখা। শয্যা হইতে অবতরণ করিয়া পাদুকা পরিধান করিতে করিতে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার মুখের উপরই বলে 'আমি মর্জ্জিনাকে ভাল বাসি!' সেধে ভালবাস্তে গিয়েছিলেম ব'লে এত অহঙ্কার! সাজাদি আমি, তোমার প্রভুর প্রভু আমি, আমার প্রাণে আঘাত দিতে, আমায় অপমানিত করতে, একটু বিবেচনা হ'লো না তোমার! না, কাশেম, অত তেজ ভাল নয়। 'মর্জ্জিনা সুধু তোমার বাহিরের নয়, অন্তরেরও!" চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, নাসিকারন্ধ্র স্ফীত করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আচ্ছা, আগে বাহিরের মর্জ্জিনা মরুক; তখন দেখ্‌বো আমি, অন্তরের মর্জ্জিনা আমার কত বাদ সাধে!" তার পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "নেহার নেহার!"

"যাচ্ছি সাজাদি" বলিয়া উত্তর হইল।

জোবেদী আবার বলিলেন "না মর্জ্জিনা, তুই বেঁচে থাকতে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াবেনা। আমি জল্‌বো; তোকে নিয়ে কাশেম সুখে দিন কাটাবে!—না মর্জ্জিনা, তোকে মর্‌তেই হবে।"

পরিচারিকা অভিবাদন করিতে করিতে বলিল "বন্দেগি, সাজাদি।"

ফিরিয়া জোবেদী বলিলেন "সেনাপতি কাশেমের স্ত্রীকে—শুন্‌লি ত' নেহার, মর্জ্জিনাকে—বোল্‌গে, আমি আজই তাকে একবার দেখতে চাই। এখুনি যেন তোর সঙ্গে আসে।"

বাঁদী বলিল "যদি না আসে?"

বাদশাজাদী গর্জ্জিয়া উঠিলেন "আস্‌বে, হারামজাদি,—তাকে আস্‌তেই হবে। আমি ডেকেছি—এ ত' তার উপর অনুগ্রহ। যা, সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বি।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া পরিচারিকা প্রস্থান করিল। তার পর, দর্পণে মুখাবলোকন করিতে করিতে যুবতী বলিয়া উঠিলেন "কাশেম অনাদর করেছে বলে মর্জ্জিনার সাহস কি যে, সে আমায় উপেক্ষা করবে? আস্‌বে, নিশ্চয়ই আস্‌বে।" তার পর নিতান্ত অবসন্নভাবে কেদারায় উপবেশন করিতে করিতে বলিলেন, "এলে কি বল্‌বো?—মর্জ্জিনা তুমি মর? যদি বলে 'কেন?'—তখন আমি কি ব'ল্‌বো? কেমন ক'রে, কোন্ মুখে আমি ব'ল্‌বো 'কাশেমকে—তোমার স্বামীকে—আমি ভালবাসি, তুমি থাকতে তাকে আমি পা'বোনা।—তাই তোমায় মর্‌তে হবে? না, এ কথা আমি ব'ল্‌তে পার্‌বো না।— মর্জ্জিনার ম'রে কাজ নেই; কপাল ভাল করেছে, সুখে থাক্।" উঠিলেন, জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, মর্জ্জিনা আসিতেছে কি না? ফিরিয়া, পাদচারনা করিতে করিতে বলিলেন "না, তাই বা কেমন ক'রে হ'বে? আমি কি তা' হ'লে সারাটা জীবন এমনি ক'রে জ্ব'ল্‌বো? না, না, অসম্ভব, অসম্ভব!

এমন ক'রে আর জ'ল্‌তে পার্‌বো না ; তোকে মর্‌তেই হ'বে, মর্জ্জিনা। দু'জনেই থাকতে পারবোনা; একজনকে যেতে হ'বেই—সে তুই। সাজাদী আমি—আমি কেন ম'র্‌বো ?—'তোর অপরাধ কি ?' অপরাধ গুরুতর। কেন তুই কাশেমের স্ত্রী হ'তে গেলি ? তোর সঙ্গে যদি কাশেমের বিয়ে না হ'তো, তোকে যদি সে ভাল না বাস্‌তো, তবে ত' কাশেম আমায় অনাদর কর্‌তোনা ; তোকে ও ম'র্‌তে হ'তোনা।" এমন সময় মর্জ্জিনা বিবিকে সঙ্গে করিয়া নেহার গৃহে প্রবেশ করিল।

সহাস্য বদনে মর্জ্জিনা বলিলেন "সেলাম, সাজাদি! আজ অনেক দিন পরে যে দাসীকে মনে পড়েছে!"

একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া জোবেদী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "একি! মর্জ্জিনা এত সুন্দরী! এমন স্ত্রী থাক্‌তে কিছুতেই কাশেম তোকে ভাল বাস্‌তে পারে না, জোবেদি!" প্রকাশ্যে বলিলেন "মর্জ্জিনা, তুই বড় সুন্দরী!"

হাসিয়া, বসিতে বসিতে মর্জ্জিনা বলিলেন "এতদিন পরে কি আমি সুন্দরী হ'লেম্‌!"

নেহারের দিকে চাহিয়া তাহাকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া জোবেদী বলিলেন "হাঁ মর্জ্জিনা, তুই অনেক সুন্দর! কাশেম পুরুষ, সে ত' ভুল্‌তে পারেই। আমিই তোকে দেখে ভুলেছি।"

মর্জ্জিনা খুব হাসিলেন ; বলিলেন "ভাল, আমার একজন ছিল, এখন দু'জন হ'লো! এর জন্যই কি ডেকেছ, সাজাদি ?"

মনে মনে জোবেদী বলিলেন "ব'ল্‌বো ? ম'র্‌তে ডেকেছি, ব'ল্‌বো ?—না, মর্জ্জিনা, সুন্দরী তুই, বেঁচে থাক্‌ ; মর্‌তে হয়, আমিই ম'র্‌বো।" প্রকাশ্যে কহিলেন "অনেক দিন দেখিনি ; তাই দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'লো। কাশেম তোকে ভালবাসে, খুব ভালবাসে কেমন ?"

আবার হাসিয়া মর্জ্জিনা বলিলেন "কে বল্‌লে সাজাদি ? আমি ত'

কিছু জানিনে; তুমি যদি জান!" শেষের কথাটি যুবতী কিছু মনে করিয়া বলেন নাই; কিন্তু জোবেদীর মনে হইল "আমার কলঙ্কের কথা, আমায় প্রত্যাখ্যানের কথা, আমার পায় ধ'রে কান্নার কথা—সবই তবে সে ওকে বলেছে!" দাউ-দাউ করিয়া প্রাণে আগুণ জলিয়া উঠিল; ঘন-ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। যুবতী ওষ্ঠ ওষ্ঠ পেষণ করিতে লাগিলেন। মর্জ্জিনা সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে শান্ত হইয়া জোবেদী জিজ্ঞাসা করিলেন "কাশেমকে তুই ভালবাসিস্?"

"কেমন ক'রে বল্‌বো?"

আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সাজাদী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, বুঝ্‌তে পারিস্‌নে? তা'কে না দেখ্‌লে প্রাণ ছট্‌ফট্ করে না?"

"তা প্রাণই জানে, আমি কিছু জানিনে।"

মর্জ্জিনার এই এড়ানো উত্তরে যুবতী গরিমার গন্ধ পাইলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কাশেম তোকে যদি ভাল না বাসে?"

"না বাস্‌বে; জোড় ক'রে ত' আর কেউ ভালবাসা'তে পারে না।"

ক্ষিপ্রকণ্ঠে জোবেদী বলিলেন "কাশেম তোকে ভাল বাসে না।"

পূর্ব্ববৎ অবিচলিত স্বরে কাশেম-প্রিয়া বলিলেন, "না বাস্‌লো।"

বিস্মিত ভাবে জোবেদী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোর মর্‌তে ইচ্ছা হয় না? অমন্ স্বামী ভালবাসে না, তবু বেঁচে থাক্‌তে সাধ!"

হাসিয়া মর্জ্জিনা বলিলেন "ম'র্‌বো কেন? ভালবাসা পেলেম্ না ব'লে, পাওয়া প্রাণটাও সঙ্গে দেবো!"

"সে যদি আর একজনকে ভালবাসে?"

"বাস্‌বে।"

"যাকে ভালবাসে, তার উপর তোর রাগ হয় না?" সৌৎসুক্যে জোবেদী মর্জ্জিনার মুখের দিকে চাহিলেন।

"মোটেই না—তার দোষ কি ?"

তখন জোবেদী বলিলেন 'আমি হ'লে ত' সইতে পারিনে। ভালবাসে না, সেই অসহ্য; তার উপর আবার আমায় উপেক্ষা ক'রে আর একজনকে ভালবাসতে যাওয়া! না মর্জ্জিনা, আমি এ সইতে পারিনে।"

"তখন তুমি কি কর ?"

গর্জ্জিয়া জোবেদী বলিলেন "আমি ?—আমায় উপেক্ষা করে যাকে ভালবেসে তার সুখ, আমার কথা নিয়ে যার কাছে ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'রে তার সুখ, তার সেই সাধের প্রণয়িণীকে মেরে তা'কে ও আমার মত জ্বালাই।"

গম্ভীর ভাবে মর্জ্জিনা বলিলেন "তোমার প্রেম বড় ভয়ানক সাজাদি!"

পূর্ব্ববৎ বাদশাজাদী আবার বলিতে লাগিলেন "হাঁ, আমি বড় ভয়ানক। আমি দুঃসহ জ্বালায় জ্বলতে থাকবো; আর আমায় জ্বালা দিয়ে, আমার জ্বালা দেখে, তার প্রণয়িণীকে নিয়ে সে হাসবে! না, মর্জ্জিনা, আমি তা, ভাবতেও পারিনে। আমি আগে আমার সুখের পথের কাঁটা, তার প্রণয়িণীকে দূর করি; তখনো যদি সে আমায় ভাল না বাসে, আমি তবে তা'কেও মারি!"

এতক্ষণ হাঁ করিয়া মর্জ্জিনা তাহার কথা শুনিতেছিলেন—তাহার সুন্দর মুখের উপর উত্তেজিত মনের নানা ভাবের যে ছায়া পড়িতেছিল, তাহা দেখিতেছিলেন। উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমিকা জোবেদীর কথা শেষ হইলে, তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন "জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায় না, সাজাদি। সে যা'কে ভালবাসে, তাকে মারলে, সে তোমায় শুধু ঘৃণা করবে—তোমায় দেখলে, তার কথা আরো বেশী মনে হ'বে।"

গালে হাত দিয়া জোবেদী ভাবিতে লাগিলেন "আরো বেশী মনে

হবে! আমায় আরো বেশী ঘৃণা কর্‌বে!—মর্জ্জিনা এ বলে কি? এ যে নূতন কথা! আচ্ছা, আজ মর্জ্জিনাকে বিদায় দি। ভাব্‌বার বিষয় বটে।” প্রকাশ্যে বলিলেন “তোমার কথা ঠিক হলেও হ'তে পারে। যাক্ এ প্রসঙ্গ—আমার এতে কাজ কি? আচ্ছা, আজ তুমি যাও—আর একদিন এসো।” মর্জ্জিনা বিদায় হইলেন। জোবেদীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন।

----o----

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মঞ্জুলের উপদেশ।

সেই যে জ্যোৎস্নাপরিপ্লুত প্রমোদ-কাননের পুষ্করিণী সোপানে দম্পতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পর আর ভীমা ও ভৈরবের মধ্যে বেশী সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। স্বামীর ব্যবহারে ক্রমেই যুবতীর চক্ষু খুলিতেছে। দিনে দিনে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, তাঁহার মনে হইতেছে, তাঁহাকে লইয়া স্বামীর সুখ নাই। সুখ যদি থাকিবে, তাহা হইলে, কাজের ঝঞ্ঝাট যতই বেশী হউক্ না কেন, প্রাণের টানে আসিয়া ভৈরব কি দিনান্তে একটিবার ও তাঁহার সঙ্গে বসিয়া, তাঁহার প্রাণের বেদনা, চোখের জল মুছাইতে পারিতেন না!

এদিকে, বালকভৃত্য মঞ্জুল ক্রমেই প্রভুর হৃদয়ে অধিকতর স্থান জুড়িয়া বসিতেছে, ইহা ভীমা বেশ বুঝিতে পারিলেন; বুঝিয়া, কারণ না থাকিলেও কেন জানি, তাঁহার প্রাণের নিভৃততম প্রদেশে কেমন একটা হাহাকার জাগিয়া উঠিল। এখন মঞ্জুল কাছে আসিলে, তাহার সদা-বিকশিত প্রফুল্ল গোলাপের মত মুখখানা দেখিলে, ভীমার প্রাণে দারুণ আঘাত বাজিয়া উঠে। যাহার ত্রিজগতে কেহ নাই, দিবারাত্রি পরের জন্য যাহাকে খাটিতে হয়, তাহার প্রাণে এত আনন্দ কেন? তাহা! ইচ্ছামত

চলিয়া, মনের কথা তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে না হইতে, সম্পন্ন করিয়া, আজ মঞ্জুল ভৈরবের হৃদয়ে তাহার অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। স্বামীগৃহে আসিয়া, এখন, আগে মঞ্জুলকেই ডাকেন, এখন তাহাকে না হইলেও স্বামীর বেশ চলে!

যতই ভীমা এ বিষয়ে ভাবেন, ততই তাহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে ভৈরবের উপেক্ষা, ভৈরবের অনাদর উজ্জ্বলতর ভাবে শত-শত মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকে। শেষে এমন হইল যে, তাহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, তিনি স্বামীর অশান্তির কারণ, উন্নতির পথের কণ্টক।

ভীমা আর ভাবিতে পারেন না। তাহাকে লইয়া যদি স্বামীর অশান্তি হইতেছে, তবে তাহার সরিয়া যাওয়া উচিত নহে কি? উচিত বটে; কিন্তু তিনি যে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন! যাহাকে দুদিন একদিন না দেখিলে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, কেমন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া তিনি থাকিবেন? এ যে বিষম সঙ্কট!

এক দিন অপরাহ্নে তিনি একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছেন—ভাবনাই এখন তাহার সম্বল; এমন সময় সদানন্দ মঞ্জুল আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি অমন্ বসে বসে কি ভাব?"

চমকিয়া ভীমা উত্তর করিলেন "কৈ, মঞ্জুল কিছু ভাবি না। আর ভেবেই বা কি ক'রবো! ভালবেসে তাঁর সুখ হয় নাই; কেন ভাল বাস্‌বেন?"

বালক বলিল "তোমার ভুল; তিনি তোমায় খুব ভালবাসেন।" কাতর ভাবে চাহিয়া যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই আমায় ভালবাসিস্, মঞ্জুল?"

"বাসি—খুব ভালবাসি; আমার প্রভুকে তুমি অত ভালবাস না।" বাধা দিয়া ভীমা বলিলেন "না মঞ্জুল, তোর ভুল; আমি তা'কে আমার সমস্তখানি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।"

হাসিয়া বালক বলিল, "তা আর আমি জানিনে? কিন্তু এ ভালবাসা নয়—স্বার্থপরতা! তুমি ভালবাস্‌তে যাওনি; ভালবাসা পেতে গেছিলে। তোমার স্বামী কি চান্, তাঁর সুখ কিসে, সে খোঁজ কি তুমি একটি দিনও করেছ! না, সুধু তিনি তোমার কাছে ব'সে থাকেন না, বসে বসে তোমায় আদর করেন না ভেবে ভেবেই, আপনাকে তুমি অসুখী করেছ; তাঁকেও অসুখী ক'রে তুলেছ।"

তাড়াতাড়ি ভীমা বলিলেন "না, আর তাকে অসুখী কর্‌বো না। আমি চলে যা'বো।"

মঙ্গল হাসিল "ঐ আবার পাগলামো! চ'লে গেলেই কি তাঁ'কে ভুল্‌তে পার্‌বে? ও সব ছাড়। যা'তে নিজে সুখী হ'তে পার্‌বে, তাঁ'কে সুখী কর্‌তে পার্‌বে, তাই করনা কেন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী বলিলেন "না, আর তিনি আমার নিয়ে সুখী হ'বেন না!"

দৃঢ়স্বরে মঙ্গল বলিতে লাগিল "খুব হ'বেন। এই যদি না পার, তবে তোমার প্রাণে ভালবাসা ই নেই। ভালবাস্‌তে জান্‌লে, আবার ভালবাসা পাওয়া যায় না!"

ভীমার নেত্রদ্বয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সাগ্রহে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ভালবাস্‌লেই কি ভালবাসা পাওয়া যায়? তোর এতটা দৃঢ়তা কোত্থেকে হ'লো বালক?"

"তা' বল্‌তে পারিনে। তুমি ভালবেসে দেখ—নিশ্চয়ই পাবে।"

"আচ্ছা কি ক'র্‌তে হ'বে বল্। দেখি তোর কথা শুনেই একবার দেখি" ধীরে ধীরে বালক বলিতে লাগিল "তবে শোন, তিনি কি চান্, কিসে তাঁর সুখ, কিসে তাঁর দুঃখ, তাই বুঝতে চেষ্টা কর। তিনি তোমার ন'ন্, তুমিই তাঁর, সর্ব্বদা এই ভাব মনে রেখে কাজ ক'র্‌তে চেষ্টা করো!"

কাতর ভাবে ভীমা বলিলেন "কিন্তু কি যে তাঁর ইচ্ছা, কিসে যে তাঁর সুখ, তা'যে এ পর্য্যন্ত আমি বুঝ্‌তে পার্‌লেম্‌ না। একটি দিনও আমায় তিনি মুখ ফুটে বলেন নি। এমন ব্যবহার করেছেন যেন, আমি তাঁর আস্‌বাবের মধ্যে একটা!"

"মুখ ফুটে কি আর কেউ বলে? বুঝে নিতে হয়। দেখতে পাচ্ছো না, দেশের জন্য, রাজার মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বদা কেমন ব্যস্ত! তাঁর ভালবাসা পেতে হ'লে, তোমায়ও এসবের ভাবনা ভাব্‌তে হ'বে; এদের জন্য খাটতে হ'বে। তিনি যখন নিরাশ, নিস্তেজ হয়ে পড়্‌বেন, তখন তাঁকে উৎসাহ দিতে হ'বে।"

গদগদ কণ্ঠে ভীমা বলিলেন "হায় মঞ্জুল, একটি দিন যদি এমন ক'য়ে কেউ আমায় বুঝিয়ে দিতো! এখন কি আর সময় আছে!"

এমন সময় রাজকন্যা অমলা ও বিমলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাদরে ভীমা তাহাদিগকে বসাইলেন। অমলা বলিলেন "অনেক দিন পরে আজ তোকে দেখতে এলেম্‌ ভীমা। আছিস্‌ কেমন?"

"ভাল আছি। যুদ্ধের খবর কি?"

হাসিয়া বিমলা বলিলেন "সেনাপতির স্ত্রী তুই; আর তোকেই আমাদের যুদ্ধের খবর ব'ল্‌তে হ'বে!"

ভীমাও হাসিয়া উত্তর করিলেন "সেনাপতির স্ত্রীর মত আর চলেছি কৈ?"

অমলা উত্তর করিলেন "শীগ্‌গির যুদ্ধ বাধবে ব'লে আশঙ্কা হচ্ছে; কাল সকালে ভৈরব সেখানে যাচ্ছেন। আমিও সঙ্গে যা'বো মনে করেছি।"

ভীমা হাসিলেন "কেন যুদ্ধ ক'র্‌তে হ'বে নাকি! বাস্তবিকই তুই রণ-চণ্ডী!"

"না এখন যুদ্ধে যাচ্ছিনে, তবে একদিন বোধ হয় যেতে হ'বে। তখন

তোকেও যেতে হ'বে, ভীমা। হিন্দুস্থান সুধু পুরুষের নয়, আমাদেরও, জন্মভূমি। দেশের জন্য পুরুষ প্রাণ দেবে; আর আমরা পার্‌বো না?"

বিমলা বলিলেন "যুদ্ধ বাধ্‌বার আশঙ্কা হয়েছে অবধি দিদির মুখে কেবল এই এক কথা! তোর পুরুষ হ'য়ে জন্মানো উচিত ছিল। মেয়ে মানুষ যুদ্ধ করে, এ আর আমি কখনো শুনিনি।"

বিমলার কথায় লক্ষ্য না করিয়া ভীমা বলিলেন, "আবশ্যক হ'লে আমিও যুদ্ধে যা'বো। কি বলিস্, মঞ্জুল?"

বালক উত্তর করিল "হাঁ, যেতে হ'বে বৈ কি?" তার পর অমলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কুমারি, তুমি দেবলে যাচ্ছো কেন?"

"বৃদ্ধ কনাদকে দেখ্‌তে, আর তাঁর স্ত্রীমেয়েদের এখানে আন্‌তে—কি জানি যবন যদি দেবল দখল ক'রেই বসে! আমাদের, স্ত্রীলোকদের, এখন থেকেই দুর্গে একত্র হ'য়ে থাকা আবশ্যক; যেন, আবশ্যক হ'লে এবং হওয়ামাত্র, আমরাও যবনদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি। সেনাপতি কোথা?"

"তিনি এখনো ফেরেন নি।"

"তাঁর সঙ্গে দুটো কাজের কথা ছিল। এলে ব'লো, আজ রেতেই একবার যেন মন্দিরে যা'ন। আর দেরী কর্‌তে পারিনে। তুই একবার আমাদের বাড়ী যা'স্, ভীমা।" ভগ্নীদ্বয় প্রস্থান করিলেন।

উভয়ে কতক্ষণ নীরব রহিলেন; তার পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভীমা আরম্ভ করিলেন "অমল্ কথাটা ঠিকই বলেছে, কেমন মঞ্জুল? দেশ ত, একা পুরুষের নয়, আমাদেরও। আগে আমি এতটা বুঝ্‌তে পারিনি।"

মঞ্জুল বলিল "এখন ত' বুঝেছ। তবে ঠিক পথে চ'লো।"

"তোকেও কি দেবলে যেতে হ'বে?"

"আমি কি জানি?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আলোড়—মন্ত্রণাভবন।

যবন-দূতকে ফেরত পাঠাইয়া অবধি, সিন্ধু-রাজ দাহির আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন নাই। জলপথে, স্থলপথে, যেখানে যেখানে যবনের অবতরণের সম্ভাবনা, সে সকল স্থানই সুরক্ষিত করা হইয়াছে। অস্ত্র শস্ত্র—তীর-ধনুক-বর্শা-বল্লমে অস্ত্রাগার পরিপূর্ণ হইয়াছে। অনেক দিনের অব্যবহৃত অস্ত্র-গুলিকে শানে-শানে চক্‌চকে করা হইয়াছে। রাজার আহ্বানে, কল্লোলের উত্তেজনায়, ভৈরবের আস্ফালনে, দলে দলে প্রজারা চাষ-আবাদ, গৃহস্থালীর কাজকর্ম, পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য শ্রেণীতে আসিয়া ভুক্ত হইয়াছে। একটা অভিনব উত্তেজনা ও উৎসাহের স্রোত সমগ্র সিন্ধুরাজ্যটাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। আপনাকে যথাসাধ্য প্রস্তুত করা ব্যতীত, সিন্ধু-রাজ ভারতবর্ষীয় অন্যান্য নৃপতিবৃন্দের নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, দূত প্রেরণ করিয়াছেন।

আজ দেবল-বন্দর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে অদূরে বহুসংখ্যক যবন-রণপোত দেখা দিয়াছে। তাই ইতিকর্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য দাহির, ভৈরব ও মন্ত্রী দীর্ঘল আসিয়া মন্ত্রণাভবনে মিলিত হইয়াছেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদের আয়োজনের ত' আর কিছু বাকী নেই ভৈরব ?"

সেনাপতি উত্তর করিলেন "না, মহারাজ, কিছুই বাকী নেই। উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম, সিন্ধুর সমস্ত সীমানাই আমি নিজে ঘু'রে ঘু'রে দেখেছি।"

মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজাদের নিকট যে দূত পাঠিয়েছিলে, তার কি হ'লো ?"

"প্রায় সকল দূতই ফিরে এসেছে ; ফল কিছুই হয়নি।"

"পঞ্জাব-পতি কি জবাব দিয়েছেন ?"

"আত্মরক্ষা সর্ব্বাগ্রে। নিজের দেশ রক্ষা কর্'তে পারে এমন সৈন্যই তাঁ'র অতি অল্প। মহারাজের বিপদে তিনি আন্তরিক দুঃখিত সত্য, কিন্তু সাহায্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভৈরব বলিলেন "হায় কি ভ্রান্তি! এ বিপদ্ কি সুধু সিন্ধু-রাজের একার ? ভবানী না করুন, কিন্তু যবন যদি সিন্ধু দখল ক'র্‌তে পারে, হিন্দুস্থানের কোনো রাজা কি তা হ'লে সুখে ভাত খাবে, না নিশ্চিন্ত ঘুমুতে পার্‌বে ?"

মন্ত্রী কহিলেন "আমরাই যদি মর্'লেম, তবে কেউ না বাঁচ্‌লে আর আমাদের দুঃখটা কি ?"

গম্ভীর ভাবে রাজা উত্তর করিলেন "অনেক দুঃখ, দীর্ঘল, অনেক দুঃখ। যবন কি আর হিন্দুর দেব-দেবী মান্‌বে, না হিন্দুর আচার-ব্যবহার রাখ্‌বে ? ভাই-ভাই হাজার শত্রুতা থাক্, হাজার মারামারি-কাটাকাটি হো'ক্, তবু ভাই; অধীন হ'লেও ভাইএর অধীন। কিন্তু পরাধীনতা বড় বিষম জিনিষ! ভৈরব, অবিলম্বে তোমার দেবলে যাওয়া উচিত; কোনো প্রকারেই যেন যবন বন্দরে পদার্পণ ক'র্‌তে না পারে। এমন সময় ঘরে ব'সে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু কি কর্‌বো ?—বৃদ্ধ আমি কাজের বহির্ভূত হয়েছি।"

সসম্ভ্রমে সেনাপতি উত্তর করিলেন "ভবানীর আশীর্ব্বাদে আপনাকে আর দেবলে যেতে হ'বেনা। আমি আজই সেখানে যাচ্ছি।"

"না, আজ যেতে হ'বেনা" বলিতে বলিতে আমলাকে সঙ্গে করিয়া কহ্লন্ ঠাকুর আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। "আজ দিন ভাল নয়; ভবানীর আশীর্ব্বাদ নিযে তুমি আগামী পরশু প্রাতে যাত্রা ক'রো ভৈরব।"

ভৈরব উত্তর করিলেন "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

অমলা বলিলেন "আমায়ও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

সবিস্ময়ে দাহির বলিলেন "তুই কি বলিস্ অমল! স্ত্রীলোকের এখন সেখানে যাওয়া ঠিক নয়।"

কহ্লন্ উত্তর করিলেন "না, দাহির, ওর জন্য তুমি ভয় ক'রোনা। যার উপর মা ভবানীর অনুগ্রহ রয়েছে, মানুষের এমন শক্তি নাই যে তার একচুলও অনিষ্ট ক'র্‌তে পারে? ওর ইচ্ছায় তুমি বাধা দিওনা, দাহির।" তার পর ভৈরবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সেনাপতি তুমি, দেশের গৌরব ও ভরসার স্থল তুমি। তোমার বীরত্বে আমি অনেকবার মুগ্ধ হয়েছি। তোমার মত আর দশটিমাত্র লোক যদি সিন্ধুতে থাক্‌তো, তা' হ'লে কোনো শত্রুর সাধ্য হ'তোনা, যে সিন্ধুতে দন্তস্ফুট করে।"

অমনি মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন "এখন কি কেউ তবে দন্তস্ফুট কর্‌'বে?"

"না আমি সে কথা ব'ল্‌চিনে। দশটি ভৈরব থাক্‌লে শত্রু সিন্ধু আক্রমণ ক'র্‌তেই সাহসী হ'তোনা। গত যবন-আক্রমণ দু'টোর কথা কি তোমাদের মনে নাই? সুধু দাহির ও ভৈরবের বীরত্বেই তারা পালা'তে পথ পেয়েছিল না!" বলিতে বলিতে ঠাকুর সস্নেহ দৃষ্টিতে ভৈরবের দিকে চাহিলেন "ভৈরব, আজ তুমি একা; দশের কাজ আজ তোমায় একা ক'র্‌তে হ'বে—দশের গৌরব আজ তুমি একা ভোগ ক'র্‌বে। দেশের কাজও ভবানীর কাজ মনে রেখে মাতৃভূমিকে হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান দিও। ভবানী তোমার কল্যাণ ক'র্‌বেন।"

অবনত মস্তকে ভৈরব বলিলেন "ঠাকুর জন্মভূমির অপেক্ষা প্রিয়তর আমার কিছুই নেই। আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে ম'র্‌তে পারি।"

ভৈরবের মাথায় হাত দিয়া কহ্লন আশীর্ব্বাদ করিলেন "তা তুমি পার্‌বে। যতদিন তোমার বাহুতে বল থাক্‌বে, ততদিন শত্রু সিন্ধু জয়

ক'র্‌তে পার্‌বেনা।" শেষে, রাজার দিকে চাহিয়া আবার কহিলেন "বৎস দাহির, পরিণামে তোমারই জয় হ'বে; দু' একটা যুদ্ধে হার্‌লেই মনে ক'রোনা যে ভবানীর অনুগ্রহে তুমি বঞ্চিত হয়েছ। অমলা তোমার বংশ উজ্জ্বল কর্‌বে—হিন্দুস্থানের গৌরব এ হ'তেই এ যাত্রা রক্ষা পা'বে।"

অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, ওকে ও যুদ্ধে যেতে হ'বে নাকি?"

"না, অমলা মার পূজা ক'রতে এসেছে, পূজাই ক'র্‌বে।"

অমলা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "দরকার হ'লে বাবা, আমি যুদ্ধও করতে পারি। ক্ষত্রিয়ের মেয়ে আমি, যুদ্ধে আমার ভয় কি? ভবানীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, যে যবন সিন্ধুভূম কলঙ্কিত কর্‌বে, তার আমি মুণ্ডপাত করবোই। সিন্ধুরাজ দাহিরের মেয়ে আমি—দনুজদলনী ভবানীর সেবিকা আমি—প্রতিজ্ঞা আমার আমি রাখ্‌বোই।"

কহ্লন ভৈরবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমার মঞ্জুলকে সঙ্গে নিও; বয়স অল্প হ'লেও তা'র সাহস দুর্জ্জয়।"

ভৈরব উত্তর করিলেন "মঞ্জুল আমার বড় বিশ্বাসী ভক্ত সেবক। সঙ্গে যাওয়ার জন্য সেও আমায় বড় ধরেছে। নিতান্ত ছেলে মানুষ—তাই ভয় হয়।"

"নিও, তা'কে সঙ্গে নিও। সে তোমায় বড় ভালবাসে। তোমায় খুব যত্ন ক'র্‌বে। অস্ত্রবিদ্যাও তার না আছে, এমন নয়; আবশ্যক হ'লে তোমার সাহায্য ও ক'র্‌তে পার্‌বে। বেলা হ'য়ে গেছে—আমি এখন চল্লেম; ভবানী তোমাদের মঙ্গল কর্‌বেন।"

———o———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ভীমার রূপান্তর।

আগামী কল্য প্রত্যুষেই সসৈন্যে সেনাপতি ভৈরবকে দেবল যাত্রা করিতে হইবে। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি ও রাজা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া দিয়াছেন। উৎসাহে ও উত্তেজনায় সমস্ত আলোড়বাসী যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মঞ্জুলের উৎসাহ ও পরামর্শে ভীমার ও অনেকটা পরিবর্ত্তন আগে হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল; সর্ব্বকল্ম-পরিত্যাগ করিয়া এখন তিনি কেবল চিন্তা করেন, কেমন করিয়া বীর স্বামীর মনে নষ্ট স্থান পুনরধিকার করিবেন। যে উৎসাহ স্রোতে সমস্ত আলোড়বাসী ভাসিয়া চলিয়াছে, সে স্রোত এবার ভীমার মনের পঙ্কিল-রাশিও অনেকটা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; ঘন-ঘন উচ্চারিত "জয়, জয় মা ভবানীর জয়; জয় মহারাজ দাহিরের জয়" ধ্বনিতে তাহার প্রাণও আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভীমা আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না; তিনি রাজবাড়ী চলিয়া গেলেন।

কিছু কাল পরে সেনাপতি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মঞ্জুল তখন যাত্রার উদ্‌যোগ করিতেছিল। তাহার হৃদয়ের আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। ভৈরব জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই একা মঞ্জুল। তোর কর্ত্রী কোথা?"

"রাজবাড়ী গেছেন; শীগ্‌গিরই ফিরবেন।"

বসিতে বসিতে ভৈরব বলিলেন "তোর দেবলে যেয়ে কাজ নেই মঞ্জুল্; যুদ্ধের সময় পদে-পদে বিপদ্ ঘট্‌তে পারে। তোকে নিয়ে শেষে আমি বড় বিব্রত হ'য়ে পড়্‌বো।"

গ্রীবা বাঁকাইয়া কিঞ্চিৎ উদ্ধত স্বরে বালক উত্তর করিল "আপনার মত বীর ও কি বিপদের ভয় করে? কৈ, আমার ত ভয় হয় না!

আমায় নিয়ে অপনাকে বিব্রত হ'তে হ'বে না—আমি যাবো।" শেষের কথা কয়টি কতকটা দৃঢ়তা ও কতকটা আব্দারের সঙ্গে উচ্চারিত হইল।

হাসিয়া ভৈরব কহিলেন "বালক, তুই বিপদের কি জানিস্? আমার নিজের জন্য আমি ভয় কচ্ছিনে। তোকে আমি ভালবাসি, তাই তোর জন্য ভয় হয়। আমার কথা শোন্—বাড়ী থাক্।"

বালকের মুখ-মণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। অস্ফুটস্বরে তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইল "ভালবাসি!" তার পরে প্রকাশ্যে কহিল "আপনি না নিয়ে যা'ন আমি পালিয়ে যা'বো; আপনি বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে পারেন—আর আমি পার্‌বোনা?"

ভৈরব আবার হাসিলেন। বলিলেন "আচ্ছা যাস্। একটু এগিয়ে দেখে আয় দেখি ভীমা এলেন কি না।"

বালক চলিয়া গেল। ভৈরব ভাবিতে লাগিলেন "মঞ্জুল একটা অদ্ভূত রহস্য! বালকের প্রাণে যুবকের উৎসাহ, সাহস; আবার রমণীর স্নেহ ও কোমলতা! ক্রমেই মন আমার বেশী আকৃষ্ট হ'চ্ছে। সঙ্গে নিতে ইচ্ছা ও করে, ভয় ও হয়। ভীমা, তুমি যদি মঞ্জুলের মত হ'তে!"

এমন সময় মঞ্জুলকে পশ্চাতে করিয়া ভীমা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন "আমায় তুমি ডেকেছ!"

তাহার হাত ধরিয়া ভৈরব বলিলেন "একটু দেখ্‌বো ব'লে। সব সময় ত' আর তোমার কাছে থাকৃতে পারিনে। এখন একটু অবসর পেয়েছি।"

ভীমা কহিলেন "তুমি দেবলে কখন যা'বে?"

"কাল অতি প্রত্যুষে। এই যুদ্ধটা হ'য়ে গেলে আমি তোমায় খুব ভাল বাস্‌বো।"

আস্তে আস্তে মঞ্জুল বাহির হইয়া গেল। হাসিয়া ভীমা বলিলেন "কেন, এখন কি বাসনা? এখনো তুমি আমায় খুব ভালবাস। এতদিন

যে আমি বুঝ্‌তে পারিনি, সে দোষ আমার। আমিই তোমার ইচ্ছামত চলিনি—আমিই ভাল বাস্‌তে জান্‌তেম্‌না।”

ভৈরব ভাবিলেন “এ আবার কি!” প্রকাশ্যে বলিলেন “কেন, তুমিত’ আমায় খুবই ভালবাস।”

ভীমা বলিতে লাগিলেন “না, ভালবাসিনি। তোমার সুখ্যাতি যা’তে বাড়ে, তোমার উন্নতি যা’তে হয়, অমন্ কাজ আমি কিছুই করিনি! কোথায় উৎসাহ দেবো, কোথায় তোমার সহায়তা ক’র্‌বো, আর কোথায় আমি তোমায় ঘরে বদ্ধ রাখ্‌তে চেয়েছিলেম্—তুমি তোমার কাজে গেলে, আমি মুখ ভার ক’রে থাকতেম্! আজ আমার ভুল ভেঙ্গেছে; তুমি আমার একার নও,—তুমি সিন্ধু দেশের, তুমি হিন্দুস্থানের। আমায় তুমি ক্ষমা ক’রো। আজ থেকে আমি, তোমার স্ত্রীর যেমন চলা উচিত, তেম্‌নি চ’ল্‌তে চেষ্টা কর্‌বো।”

ভীমার মস্তক বুকে টানিয়া আনিয়া তাহার স্বামী প্রাণের আবেগে বলিলেন “সত্যি, ভীমা, তেম্‌নি তুমি চ’ল্‌বে! চ’ল্‌তে চাও যদি, চ’লতে পারো যদি, তবে আমার ইচ্ছা শোন। তুমি আমার অলঙ্কার নও, গৃহের আস্‌বাব তুমি নও—আমার সহধর্ম্মিণী তুমি, সৎকাজে তুমি আমার সহায় হ’বে; সৎকাজে তুমি আমায় প্রণোদিত কর্‌বে; কখনো যদি আমি আমার ধর্ম্মচ্যুত হ’তে বসি, জোর ক’রে তুমি আমায় টেনে রাখ্‌বে। এই তোমার ধর্ম্ম; এই তোমার কর্ম্ম। একদিকে আমি তোমার অবলম্বন, অপর দিকে তুমি আমার। পারো যদি, এসো। দেশের কাজে আমি আত্মসমর্পণ করেছি; আমায় সহায় হও এসে; আমি প’ড়্‌তে গেলে আমায় ধর এসে।”

স্বামীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া, বাষ্পগদগদ কণ্ঠে যুবতী কহিলেন “কেন প্রিয়তম, এতদিন তুমি এমন ক’রে আমার কর্ত্তব্য আমায় শিখিয়ে দাওনি? কেন তোমার সঙ্গে সঙ্গে

আমায় হাত ধ'রে নিয়ে যাওনি ? এখন আমি তোমায় চিনেছি ; আর ভুল্‌বোনা। যাও, তুমি যুদ্ধে যাও ; এবার তোমায় আমি হাসিমুখে বিদায় দিতে পার্‌বো ; প্রাণেশ্বর, আমায়ও দেবলে নিয়ে যা'বে কি ?"

এমন সময় জলদ-গম্ভীর স্বরে "না, তোমায় দেবলে যেতে হ'বেনা" বলিতে বলিতে মহাপুরুষ কহ্লন্ আসিয়া দেখা দিলেন। ভীমা ভৈরব দূরে দূরে সরিল, দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ; আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন "এখানেই তোমার যে কাজ রয়েছে ভীমা ; তোমাকে এখানেই থাকতে হ'বে।" তার পর ভৈরবের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভৈরব, তোমার হৃদয়ে দুর্ব্বলতা ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ ক'চ্ছে ; দেশের চিন্তা ব্যতীত যার হৃদয়ে অন্য কিছু ছিলনা, সে তুমি আজ মঙ্গলের জন্য চিন্তা ক'র্‌তে শিখেছ ; বিব্রত হ'বার ভয়ে যা'কে তুমি সঙ্গে নিতে চাওনা ! বিব্রত হ'তে হ'বে কেন ? সে তোমার কে ? তোমার কাজ তুমি ক'রে যা'বে ; যার ভাগ্যে যা' থাকে, তাই হ'বে। আর যে ভীমার কথা এতদিন তুমি ভাবনি, আজ তার চোখের জলে তোমার মন ভিজেছে—তা'কে সঙ্গে নিতে ইচ্ছা হয়েছে ! ভীষণ কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে ; এ সময় এ মতিভ্রম দূর কর। দেশ উৎসন্ন যেতে বসেছে ; ধর্ম্ম-মান, আচার-ব্যবহার সব কম্পিত হ'য়ে উঠেছে ! আজ যদি ম্লেচ্ছ সিন্ধু অধিকার কর্‌তে পারে, তা হ'লে হিন্দুস্থানের নাম লুপ্ত হ'বে ; পূর্ব্বদিকে অঙ্গবঙ্গ-কলিঙ্গ, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত তাদের পদলাঞ্ছিত হ'বে ; দেশের এ দুর্দ্দিনের সময় আমরা কাজের বাহির হয়ে পড়েছি—বাহুতে যৌবনের সে বল নাই ; হৃদয়ে যৌবনের সে উৎসাহ নাই ! ভরসা একমাত্র তোমরাই। তা' সেই তোমরাও যদি অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতে লাগ্‌লে, তবে আর ভরসা কৈ ?"

বৃদ্ধের স্বর কম্পিত, চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল।

ঠাকুরের পদধূলি মস্তকে লইয়া ভৈরব কহিলেন "আমায় মার্জ্জনা করুন, প্রভো। এই আপনার পা ছুঁ'য়ে আমি শপথ কচ্ছি—যবন জয়ের পূর্ব্বে অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান দেবোনা। আপনি নিষেধ কচ্ছেন, আমি ভীমাকে সঙ্গে নেবোনা।"

কহ্লন্ আবার ভীমাকে বলিলেন "ভীমা, স্ত্রীর কাজ কর্, স্বামীর যা'তে গৌরব বাড়ে, দেশে থেকে তাই কর্।"

হাসিয়া ভীমা উত্তর করিলেন "ক'র্‌বো। এতদিন কোথা ছিলে ঠাকুর? তোমার ও বুঝি অসময়ে ঘুম ভেঙ্গেছে! ভেঙ্গেছেই যদি, এখন তুমিও কাজ কর। সিন্ধু দেশে ভীমার মত অনেক ভীমা আছে, তা'দের জাগাও গে।"

কহ্লন বলিলেন "হাঁ, মা, তুই ঠিক বলেছিস্, তোর মত অনেক ভীমা এদেশে আছে, তা'দের ও জাগা'তে হ'বে। ক্ষত্রিয় বীর-গুলি ধীরে ধীরে অঞ্চলের আঁড়ালে যেয়ে দাঁড়া'তে আরম্ভ করেছে! এরই নাম জাতীয় পতনের পূর্ব্বসূচনা।" তার পর উঠিতে উঠিতে কহিলেন "মঞ্জুল্‌কে সঙ্গে নিয়ো, ভৈরব; ওর দ্বারা কাজ হ'বে।" ঠাকুর প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় মঞ্জুল্ আসিয়া বলিল, "আপনার জন্য রাজা লোক পাঠিয়ে ছিলেন। ভৈরব চলিয়া গেলেন।

তখন বালক অগ্রসর হইয়া ভীমাকে কহিল "এখন তুমি সুখী হ'তে পার্‌বে; ঠিক পথ ধরেছ। আহা! অমন্ স্বামী তোমার!"

ভীমা এ কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁরে, কহ্লন্ ঠাকুর তোকে কেমন ক'রে জান্‌লেন্?"

"আমি যে এর আগে তাঁর কাছে ছিলেম্।"

"তুই আমায় বড় ভালবাসিস্ মঞ্জুল্! তোকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় না।"

হাসিয়া বালক বলিল "কেন, আমি ত' আবার আস্‌বো।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী বলিলেন "যদি আর ফিরে না আসিস্ ?"

"ম'র্‌বো ব'লে ভয় কর ? আমার মরণ নাই।"

"এতটা দিন তুই আমাদের কাছে থাক্‌লি মঞ্জুল; কিন্তু তোর সম্বন্ধে কিছুই জান্‌তে পেলেম্‌না !"

"আমার সম্বন্ধে জান্‌বার আর কি আছে ? আমার যা'রা ছিল, তাদের আমি হারিয়েছি। যা' চেয়েছিলেম, তা' পেয়েছি।—

আজ আমার প্রাণে মহা আনন্দ !"

"তোর বে হ'য়েছিল ?"

"না।"

"এখানে থাক্; আমি তোর বে দেবো।"

"ক'র্‌বোনা।"

"পাগল! বে ক'র্‌বিনে ? তোর স্ত্রী তোকে নিয়ে অনেক সুখী হ'বে। তুই এত ভাল!"

হাসিয়া বালক বলিল "সত্যি! আচ্ছা, তবে আগে দেবল থে'কে ফিরে আসি; তখন বে দিও।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মর্জ্জিনার বিপদ।

মর্জ্জিনাকে বিদায় দিয়া অবধি জোবেদী আজ দুই দিন কেবলই তাহার শেষ কথাটি লইয়া তোলপাড়া করিতেছেন—"সে তোমায় আরো বেশী ঘৃণা কর্‌বে।" তিনি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে মর্জ্জিনা বাঁচিয়া থাকিতে তাহার কোনোই আশা নাই; কিন্তু প্রাণে আবার অমনি আশঙ্কা জাগিয়া উঠে, যদি তার

কথা ঠিক হয় তবে—। ভাবিতে ভাবিতে দ্বিতীয় রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন; যখন জাগিলেন, তখন বেলা হইয়াছে।

তিনি উঠিয়া বসিলেন; হৃদয়-ভার তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে—সংকল্প ঠিক হইয়াছে। নিদ্রার ঘোরে জোবেদী এক অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। দেখিয়াছেন তিনি ঠিকই বাদসাজাদী আছেন; ছুনিয়ার লোক এখনো তাহার ইচ্ছায় উঠে বসে; কিন্তু তিনি যেন সমুদ্রতীরে এক পর্ণ কুটির বাঁধিয়া বাস করিতেছেন। এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, কে একটা লোক অজ্ঞানাবস্থায় জল-স্থলের সন্ধিস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। ঔৎসুক্যবশতঃ সেখানে যাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন—এ লোক আর কেহ নহে—কাশেম! তিনি তাহাকে উঠাইয়া ক্রোড়ে করিয়া বসিতেই তাহার চেতনা হইল, এবং কাহার ক্রোড়ে রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া গর্জ্জিয়া কাশেম উঠিয়া বসিলেন—শরীর এত ছুর্ব্বল যে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! তখন জোবেদী বলিলেন, 'তুমি 'ত' মরিতে বসিয়াছিলেঃ আমি তোমাকে বাঁচাইয়াছি,তুমি আমার।' কাশেম উত্তর করিলেন—'এ জগতে মর্জ্জিণা বই আমি আর কারো নই। বাঁচাইয়াছ বলিয়া যদি তুমি কোন দাবী কর,তবে এ শরীর আবার আমি সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিব।' জোবেদী আবার বলিলেন, 'যে মর্জ্জিনার জন্য তুমি আমাকে চাহিতেছনা, আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।' বলিতে না বলিতে কাশেম তড়িদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন "রাক্ষসী তুমি, ভাবিয়াছ বাহিরের মর্জ্জিণাকে মারিলেই আমায় পাইবে! এই দেখ, পিশাচি, মর্জ্জিণা কোথায়!" বলিতে বলিতে কাশেম তাহার বক্ষঃ-স্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন; এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে জোবেদী দেখিলেন—মর্জ্জিণা! তখনই গলদঘর্ম্ম হইয়া তিনি নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিলেন।

তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে—কাশেম মর্জ্জিণারই; কিছুতেই তাহার হইবেনা। তাহারই যদি না হইল, তবে কাশেম সুখী হইবে কেন? তিনি

জ্বলিতে থাকিবেন, আর কাশেম হাসিবে? না, কখনই তাহা হইতে পারে না!

জোবেদী উচ্চস্বরে ডাকিলেন "নেহার, নেহার"; উত্তরে পরিচারিকা আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে, বলিলেন "মর্জ্জিণাকে এখনি নিয়ে আস্‌বি—বড় জরুরি কাজ!" বাঁদী চলিয়া গেল।

কাশেমকে বিদায় দিয়া অবধি মর্জ্জিণার প্রাণে এবার আর শান্তি আসে নাই। যতই জোড় করিয়া প্রাণের অন্তস্তল হইতে উত্থিত অস্পষ্ট আশঙ্কাটাকে তিনি চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, ততই যেন সেটা অবাধ্য গোঁয়াড়-গোবিন্দ ছেলের মত মাথা উঁচু করিয়া, চক্ষু কটমট করিয়া, চাহিয়া থাকিতেছে। খুঁজিতে গেলে, এই আশঙ্কার কারণ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়; কিন্তু উদ্বেগ যে কিছুতেই মন হইতে দূর হয় না। যখন জোবেদীর পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল, তখন তিনি উপাধানে মুখ লুকাইয়া, নিজেই বুঝিতেছিলেন না কেন, কাঁদিয়া আকুল হইতেছিলেন।

হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, মনকে যথাসাধ্য প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিয়া পরিচারিকার সঙ্গে তিনি জোবেদীর মহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পথিমধ্যে পরিচারিকাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

মর্জ্জিণা যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, জোবেদী তখন অস্থির ভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "মর্জ্জিণা, তুই আমার চোখের শূল! তোর জন্য প্রাণে আজ আমার এ আগুণ জ্বলছে। তোকে মর্‌তেই হবে মর্জ্জিণা।"

এই আচম্বিত অবিশ্বাস্য বজ্রকঠোর উক্তিতে যুবতী চমকিয়া উঠিলেন—সাজাদী কি পাগল হইয়াছেন! জোবেদীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না! কেবল বুঝিলেন, সেই স্বাভাবিক উদ্ধত মুখ আজ ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কতক্ষণ

পরে তিনি হাসিয়া বলিলেন "আমি তোমার চোখের শূল হতে গেলাম কেন, সাজাদি?"

"জান না তুমি কিছু? আমার সঙ্গে পরিহাস!" বলিতে বলিতে অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে হিড়্-হিড়্ করিয়া তিনি মর্জ্জিণাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

মর্জ্জিণা অবাক্—ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট! জোবেদা পরুষস্বরে আবার কহিলেন "তোকে মর্‌তেই হ'বে, মর্জ্জিণা; তুই বেঁচে থাক্‌তে আমার সুখ নেই!"

ভীত-কাতর মর্জ্জিণা 'হাঁ' করিয়া তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

আবার জোবেদা বলিয়া উঠিলেন, "আমার মনে মুখে এক; যা' বল্লেম, কাজেও আমি তাই ক'র্‌বো। আমার প্রাণে দাগা দিয়ে, আমার শান্তি চিরকালের মত নষ্ট ক'রে, সে যে তোকে নিয়ে সুখে থাক্‌বে, আমি তা' দেখ্‌তে পার্‌বোনা। তোকে মর্‌তেই হ'বে।"

এতক্ষণে মর্জ্জিণা কিছু বুঝিতে পারিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন "কাশেম আমায় নিজের প্রাণের চাইতে ও বেশী ভালবাসে। আমায় মার্‌লেই কি তুমি তা'কে পাবে ভেবেছ? না, সাজাদি, অমন্ আশা মনেও স্থান দিওনা। তার ভালবাসা চোখের নেশা নয়!"

"আমি তা' জানি; এবং জানি ব'লেই, তুমি ম'রবে।"

"আমায় মেরেই যদি তোমার সুখ হয়, তবে মারো সাজাদি। কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখ, এর ফলে, তুমি সুধু তার ঘৃণাই পা'বে।"

জোবেদা আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন" কি সুধু ঘৃণাই পা'বো! তার আগে তুমি মর্‌বে, কাশেম ম'র্‌বে। তখন কে আমায় ঘৃণা করে?"

মর্জ্জিণা আসিয়া জোবেদার হাত ধরিয়া বলিলেন "মারো, আমায় মারো; কিন্তু কাশেমের কোনো অনিষ্ট ক'রোনা, সাজাদি।"

হাত ছাড়াইয়া জোবেদী কহিলেন "তোমার কাশেম, আমার কি? আমায় জালিয়ে যার সুখ, যে আমার অপমানের—কলঙ্কের—নিদর্শন, তাকে জ'লে জ'লে ম'র্‌তে হ'বেই। আজ তোমায় আমি মার্‌বোনা, মর্জ্জিণা; তা হ'লে কাশেম জল্‌লো কৈ? সে ফিরে আসুক, তার চোখের উপর তোমায় মার্‌বো; সে জ'ল্‌বে, আমি হাস্‌বো! উঃ, বড় জ্বালা! আমি চল্লেম্—মর্জ্জিণা - তুমি আমায় বন্দিনী।"

মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মর্জ্জিণা কাঁদিয়া উঠিলেন "এর জন্যই কি প্রাণ আমার এত অস্থির হ'য়ে উঠেছিল! খোদা, তুমি কোথায়? পাপিনী আমি, আমার যা' ইচ্ছা—সাজা দাও। কিন্তু কাশেম আমার নির্দোষ; সাজাদীর কোপ থেকে তাঁ'কে রক্ষা ক'রো প্রভো।"

একজন পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

——০——

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মঞ্জুল।

আগামী কল্য প্রত্যুষেই যুদ্ধ-বাহিনী দেবল অভিমুখে যাত্রা করিবে। সেনাপতি ভৈরবের ছায়াস্বরূপ মঞ্জুল্ ও তাহার অনুগমন করিবে।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ নিঝুম্—যেন প্রকৃতি দেবী সিন্ধুর উপর বজ্রাগ্নিবর্ষণ করিবার জন্য, আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া রুদ্ররোষে বসিয়া আছেন। ধীরে ধীরে মঞ্জুল শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল—এদিক্ ওদিক্, চারিদিক্ চাহিয়া নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে বহির্গত হইয়া পড়িল।

হাটিতে হাটিতে সে আসিয়া ভবানী শৈলের পূর্ব্বপ্রান্তে পৌঁছিল। এখানে মন্দিরে প্রবেশের একটি গুপ্তদ্বার ছিল—চাবি স্বয়ং কহ্লনঠাকুরের নিকট থাকিত। কিন্তু আজ বাহিরে তালা নাই; ভিতর হইতে ও দ্বার

অর্গল বদ্ধ নহে। সন্তর্পণে মঞ্জুল ভিতরে প্রবেশ করিল, ও একবার চারিদিকে চাহিয়া, শৈলারোহণ করিতে আরম্ভ করিল। খানিক পরে সে যাইয়া মন্দির-দ্বারে পহুঁছিল। ভবানী-সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে তখনও কহ্লন্ ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বালকের প্রাণ ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল; সে নিঃশব্দে গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিল।

খানিক পরে ঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গ হইল;—ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলেন, মঞ্জুল যুক্ত করে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! তখন বৃদ্ধ স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে বলিলেন "এই এতটা রাত্, তুই ঘুমা'স্ নাই! তোর অনেক কষ্ট হয়েছে, কেমন?" তার পর, বালক কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই, পরিবর্ত্তিত কণ্ঠে, গম্ভীর ভাবে, বলিতে লাগিলেন "মন ঠিক আছে ত?"

অবনত মস্তকে বালক বলিল "হুঁ, বাবা, আছে; সময় সময় বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তো!"

"চঞ্চল হ'লে চ'ল্‌বে কেন? তাতে যে সুধু অশান্তি হয়। যদি অশান্তিই ভোগ ক'রতে হ'লো, তবে ভালবাস্‌তে যাওয়া কেন? প্রেম শান্তির, সুখের, স্বর্গের জিনিষ: ভালবাসার পাত্রকে আশ্রয় ক'রে, বাসনার মলিনতা ও কুটীলতা, হৃদয়ের অপবিত্রতা দূর হ'বে: আপনা ভুলে যেয়ে মানুষ পরে বিলীন হ'বে; ধীরে ধীরে প্রেমের সোপান ধ'রে মন যেয়ে শেষে ভগবচ্চরণে আপনাকে হারিয়ে ব'স্‌বে—এই জন্যই ভগবান প্রাণে প্রেমের সঞ্চার করেছেন। প্রেম আসক্তি নয়; প্রেম বৈরাগ্য।"

জানু পাতিয়া উপবেশন করিতে করিতে বালক বলিল "বাবা, সাধ্যানুসারে তোমার উপদেশ পালন ক'র্‌তে আমি ত্রুটী করিনি। স্ত্রীলোকের প্রাণে আর বল কত! যা কিছু অপরাধ করেছি, সবই মনের সঙ্গে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে! আমি মর্‌তে বসেছিলেম্, তুমিই আমাকে অমরণের পথ দেখিয়ে দিয়েছ। এখন চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যদি কখনো মাথা ঘোরে, পা টলে, দোহাই বাবা, আমায় যেয়ে রক্ষা ক'রো।"

"ভৈরব কিছু টের পেয়েছে ?"

"বোধ হয় না।"

"ভীমা ?"

"না।"

"হাঁ, এই ভাবে আরো কিছু দিন আত্মগোপন ক'রে থাক্‌তে হ'বে ; তার পরে আর কোনো ভয় নাই। তোর সেবায় কখনো ত্রুটী হয়েছে ?"

"ইচ্ছা ক'রে ত' কিছু ক'রিনি।"

"সাবধান, সে যেন হয় না। ভৈরবের জন্য যা কিছু ক'রিস্, সে ত' তোর নিজের সুখের জন্য ; এতে ত্রুটী না হ'বারই কথা। কিন্তু যখন ঠিক তেমনি আগ্রহের সঙ্গে, তেমনি ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভীমার জন্য কাজ ক'র্‌তে পার্‌বি, তখন তোর ব্রত শেষ হ'বে—পূর্ণতা লাভ হ'বে।"

মাটির দিকে চাহিয়া বালক ধীরে, অতি ধীরে, বলিতে লাগিল "আজ যে তোমার কাছে আমি এসেছি বাবা—একটি কাজের জন্য। তাঁর সঙ্গে আমি দেবলে যাচ্ছি ; হয় ত ফির্‌তে পারি, হয়ত ফির্‌তে নাও পারি। প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আমি বিসর্জ্জন করেছি—একটি মাত্র বাকী রেখেছি। সেটি, বাবা,—যখন ম'র্‌বো, তখন যেন তাঁর পায় মাথা রেখে, তাঁর মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ম'র্‌তে পারি। তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।"

ঠাকুর হাসিলেন, বলিলেন "পাগ্‌লি, মানুষ কি একেবারে বাসনার হাত এড়া'তে পারে না ? জীবনে যার কাছে একটি হাসির প্রত্যাশা কর্‌লিনে, ম'র্‌বার সময় তা'কে দেখে ম'র্‌বার এত সাধ কেন ? এটুকুও ত্যাগ কর্ ; যা'তে ভগবানের নাম নিয়ে, তাঁরই ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে মর্‌তে পারিস্, তারই চেষ্টা কর্।"

এবার বালক হাসিল—কহিল "ঠাকুর, তুমি নিতান্তই ঠাকুর ;

মানুষের তোমাতে কিছুই নাই! ভগবানের কি কোনো নির্দ্দিষ্ট নাম, কোনো নির্দ্দিষ্ট আকার আছে? যে নাম, যে মূর্ত্তি তোমায় ভাল লেগেছে, সেই নাম, সেই মূর্ত্তিতে তুমি তাঁকে ডাক্‌বে; আর যে নাম, যে মূর্ত্তি আমার ভাল লেগেছে, সেই নামে তাঁকে আমি ডাক্‌তে চাই, মরণ সময়ে সেই ভাবে তাকে আমি দেখ্‌তে চাই। আশার্ব্বাদ কর যেন আমার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।"

বালকের মাথায় হাত দিয়া কহ্লন্ বলিলেন "হ'বে, তোর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'বে। আমার একটা মহা ভুল ছিল! আজ তুই আমায় বুঝিয়ে দিলি!"

তখন মঞ্জুল উঠিয়া প্রণাম করিল—বলিল "আমি এখন যাই বাবা; রাত্‌ শেষ হ'য়ে এসেছে।" আর তাহাকে দেখা গেলনা।

অনেকক্ষণ কহ্লন্ সেই খানে সেই ভাবে বসিয়া রহিলেন; প্রশান্ত মহাসাগরের মত হৃদয় তাঁহার অতলস্পর্শী; মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর—কোনো আকস্মিক আলোড়নেই সহজে চঞ্চল হইয়া উঠে না। শেষে যখন প্রভাতের বিহগ কূজনে প্রকৃতির সাম গীতি আরম্ভ হইল, প্রভাতের স্নিগ্ধ মন্দ সমীর হিল্লোলে কুসুমগন্ধ ভাসিয়া আসিয়া, প্রাণে সজীবতার সঞ্চার করিতে লাগিল, তখন "ভবানি, ভবানি" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

—o—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দেবলযাত্রা।

—প্রভাত হইতে না হইতেই রাজ রাণী অমলা বিমলা, ভৈরব ভীমা মঞ্জুল, আলোড়া শত শত স্ত্রীপুরুষ আসিয়া, ভবানী-শৈল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন; ভবানীর আশীর্ব্বাদ, কহ্লনের আশীর্ব্বাদ লইয়া

আজ তাঁহাদের অতি আদরের সেনাপতি যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। সকলেরই মুখে আনন্দ-উদ্বেগ যেন জ্যোৎস্না ও মেঘের মত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে; ভৈরবকে দেখিবার জন্য সকলেই মহাব্যস্ত। ভীমা আজ উৎসাহে পরিপূর্ণা—আনন্দের নির্ঝরিণীর মত দেখাইতেছেন।

পূজা সমাপন করিয়া, দেবীর পাদপদ্ম হইতে ফুলবিল্বপত্র লইয়া কঙ্গলন উঠিয়া দাড়াইলেন ও চতুর্দ্দিক চাহিয়া বলিলেন "বল, সিন্ধু-বাসি বল, ভবানীর জয়! তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ মা।" তখন দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া, প্রভাতের শান্ত সমীরণে তরঙ্গ উদ্বেলিত করিয়া, সমবেত কণ্ঠোত্থিত "জয় মা ভবানীর জয়" ধ্বনি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! আনন্দময় কঙ্গলন্ ডাকিলেন "এসো, ভৈরব, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর এসে।" সেনাপতি সাষ্টাঙ্গ ভবানীকে ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া মাথায় রাখিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন "যাও বৎস, খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করোগে; তোমাদের অক্ষয় কীর্ত্তি থাকবে। হিন্দুস্থানের অধিবাসীগণ চিরকাল তোমাদের নাম নেবে।" তার পর, রাজারাণী ভীমাপ্রমুখ জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এসো, বাবা মা বেল, তোমরাও এসে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।" ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে, এক মনে, এক প্রাণে "সর্ব্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে, শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে" বলিয়া, সকলে মাটিতে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলেন।

তখন কঙ্গলন্ ভীমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভীমা, প্রসন্ন মনে স্বামীকে বিদায় দে; ভবানীর কাছে প্রার্থনা কর্, স্বামী যেন তোর জয়যুক্ত হ'বে ফিরে আসেন।"

হাসিতে হাসিতে "দুর্গতিনাশিনী দুর্গা তোমার মঙ্গল করবেন" বলিয়া ভীমা স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

অমলার দিকে চাহিয়া রাজা বলিলেন "সেই যে সে দিন জাতীয়

সঙ্গীতটা করেছিলি অমল্, তাই ক'রে ভৈরবকে ও সৈন্যদিগকে আজ বিদায় দে।"

কহ্লন্ বলিলেন, "বেশ কথা। প্রাণে স্ফূর্ত্তি চাই! নইলে সিদ্ধি লাভ হয় না।"

তখন বায়ু-মণ্ডল নিশ্চল করিয়া, শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্তব্ধ করিয়া, অমলা, বিমলা ও মঞ্জুলের সমবেত স্বর গাইয়া ভবানীর পায় লুটাইয়া পড়িল; ক্ষণিকের মত দেবী যেন রাঙ্গা মুখে হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণে একটা নূতন আশা, একটা সজীব উৎসাহ সঞ্চারিত করিয়া সঙ্গীত সমাপ্ত হইল। খানিকক্ষণ সব নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

তৎপরে রাণী বলিলেন, "যাও ভৈরব যাও; আমাদের গৌরব ও ভরসার স্থল একমাত্র তুমি। ভবানী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

রাজা, রাণী, এবং কহ্লন্‌কে প্রণাম করিয়া, ও ভীমার দিকে প্রেমার্দ্র দৃষ্টিপাত করিয়া ভৈরব প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন কহ্লন্ ঠাকুর অমলা ও মঞ্জুলকে ডাকিয়া বলিলেন "যা, তোরাও যা; অমল, কাজ শেষ হ'লেই তুই ফিরে আসিস্।"

রাজারাণী কহ্লন্ ভীমা সকলকে প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে ভীমার নিকট বিদায় লইয়া, অমলাকে সঙ্গে করিয়া, মঞ্জুল ভৈরবের অনুগমন করিল। অজ্ঞাতসারে ভীমার চক্ষু আদ্র হইয়া উঠিল। তিনি একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

দুর্গের বাহিরে ভৈরব অমলা ও মঞ্জুলের জন্য অশ্ব সজ্জিত ছিল; সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা যাইয়া অশ্বে কষাঘাত করিলেন; আকাশমণ্ডল ধূলি ধূসরিত করিয়া, কর্ণকুহর বধির করিয়া, পর্ব্বত-গাত্রে গাত্রে প্রতিধ্বনি তুলিয়া তাহারা আলোড় ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রমণীগণ উলুধ্বনি করিলেন। ভবানী শৈলপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, রাজা রাণী

ভীমা, যতক্ষণ দেখা গেল, তাহাদিগকে দেখিলেন। কি জানি কেন, অন্যের অলক্ষিতে কহ্লনের নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। নিমীলিত নেত্রে তিনি ভবানীর পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পরে রাজা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "মন আমার আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠেছে। বাবা, তোমার কৃপায় এবারো নিশ্চয়ই আমাদের জয় হ'বে।"

রাণী কমলাবতী বলিয়া উঠিলেন, "জয় পরাজয় ভবানীর হাতে। হারি কি জিতি, তার জন্য এখন আর আমি ভাব্‌চিনে। বাবার উৎসাহ দেখে প্রাণে আমার অপার আনন্দ হয়েছে। আমার ভয় ছিল, শেয়াল-কুকুরের মত বা সিন্ধুবাসী যবনের হাতে প্রাণ দেয়! কিন্তু বাবার উৎসাহে, বাবার উদ্দীপনায় সমস্ত সিন্ধু-বাসীই আজ বীরের মত যুদ্ধে চলেছে; মরে ত মরুক, বীরের মত মর্‌বে—তাই আজ আমার এত আনন্দ। তুই বড় ভাগ্যবতী ভীমা, স্বামী তোর সমগ্র সিন্ধুদেশের গৌরবের জিনিষ!"

অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে ভীমা উত্তর করিলেন "সে তোমাদেরই আশীর্ব্বাদে।"

ভীমার পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া কহ্লন্ বলিলেন, "এমন স্বামীর স্ত্রী তুই ভীমা! স্বামীর মুখ উজ্জ্বল করিস্। ভবানী না করুন্, যুদ্ধে যদি ভৈরবের কোনো অমঙ্গল ঘটে, তুই তার প্রতিশোধ নিস্—জগৎ যেন জানতে পারে, তুই স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী।"

রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "এখনো আমাদের ঢের কাজ রয়েছে, ভীমা! সিন্ধুর প্রতি ঘরে ঘুরে ঘুরে রাজপুত রমণীদিগকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান ও উত্তেজিত কর্‌তে হ'বে—তা'দিগে শিখাতে হ'বে। ভবানীর যদি এমনি ইচ্ছা হয় যে, সিন্ধু বীরশূন্য হ'বে, আমরা যেন তাদের স্থান পূরণ কর্‌তে পারি।"

দাঁড়াইয়া ভীমা উত্তর করিলেন "না, তুমি যা ক'র্বে, আমি তাই কর্তে প্রস্তুত আছি। তুমি দেবী—তুমি সিন্ধুর আদর্শ রমণী। তুমি যা ব'লবে, সিন্ধুদেশে এমন কোন স্ত্রী নেই, যে তার উল্লঙ্ঘন ক'র্বে। শেয়াল কুকুরের মত মরা কেউ ম'র্তে চায় না। সিন্ধু, যবন বীরশূন্য ক'র্তে পারে, করুক্; কিন্তু একটি প্রাণী জীবিত থাক্তেও যেন ব'ল্তে পারে না যে, তারা সিন্ধু জয় করেছে।"

রাজার দিকে চাহিয়া রাণী বলিলেন "মহারাজ, আলোড় সুরক্ষিত করুন্; প্রচুর পরিমাণে রসদাদি এনে দুর্গের ভেতর মজুত ক'র্তে হুকুম দিন্। কে ব'ল্তে পারে, যবন আলোড় পর্য্যন্ত আস্‌বেনা! যদি আসেই, কোনো মতেই তা'দিগকে প্রবেশ ক'র্তে দেওয়া হ'বে না। এক বছর হোক্, দু বছর হোক্, যতদিন না যবন আলোড় ছেড়ে যায়, ততদিন দুর্গদ্বার রুদ্ধ থাক্‌বেই।"

দাহির উঠিলেন, "না, রাণি, জয় পরাজয় তা'র আগেই ঠিক হ'য়ে যাবে।"

দৃঢ়তা সহকারে রাণী উত্তর করিলেন, "তা হো'ক্; যবন সমস্ত সিন্ধু দখল ক'র্লেও, আপনার দাসীর দেহে প্রাণ থাক্‌তে আলোড়-দুর্গ দখল ক'র্তে পার্বে না।"

একে একে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন।

কাতর নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়া কহ্লন্ আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন "এত ক'র্লেম্, ভবানি, একটুও কি প্রসন্ন হ'তে জান্‌লিনে! ব'লে দেনা মা, ভক্ত দাহির তোর পায় কি অপরাধ করেছে, যার জন্য তুই এত কঠিন হ'য়েছিস্। 'সিন্ধু উৎসন্ন হোক, সবংশে দাহির মরুক্, আমার কি?'—আমার অনেক, পাষাণি! বাপের যজ্ঞে স্বামীর নিন্দা শুনে তুই প্রাণ ত্যাগ করেছিলি কেন? তুই ত' দেবী—সর্ব্বভূতে তোর না সমান দৃষ্টি! তবে তোর এমন হ'য়ে ছিল কেন? মানুষ আমি;

অস্থিমজ্জা, রক্তমাংস আমার মানুষের; কেমন করে আমি—তুই যা পারিস্‌নি—কেমন ক'রে আমি তা' পার্‌বো? আর তুইই ত' শিখিয়েছিলি পাষাণি, জন্মভূমির কাজও তোরই কাজ। আমি তোরই কথামত চলেছি; প্রাণপণে মানুষকে তোর কথাই শিখিয়ে আস্‌ছি। ফলাফল তোর হাতে, ইচ্ছামত দিতে পারিস্‌" ঠাকুর দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

—০—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নিশি শেষে।

মুসলমানের যুদ্ধ-জাহাজসমূহ দেবল বন্দরের সম্মুখে আসিয়া নঙ্গর করিয়াছে; তীরে, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, সিন্ধুরাজের সুসজ্জিত সৈন্যগণ, বাহু-উপাধানে, শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে; পনের বিশ জন সৈন্য পালা করিয়া পাহারা দিতেছে; যবন রণ-পোত একটু নড়িয়া উঠিলেই, স্থির দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

ইহাদের পশ্চাতে, অদূরে, সেনাপতির শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখান হইতে আর একটু ভিতরে গেলে বন্দরাধ্যক্ষ কর্ণাদের সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহ। বন্দরে কোনো দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল না।

রাত্রি প্রভাতেই যুদ্ধারম্ভের আশঙ্কা, তাই প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেনাপতি ভৈরব সৈন্য সমাবেশ দেখিয়াছেন, সহকারী-দিগকে উপদেশ দিয়াছেন ও সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। যখন তিনি শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন, তখনো মঞ্জুল, তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। এত রাত্রেও বালক ঘুমাইয়া পড়ে নাই! তিনি তাহার পিঠ্‌ চাপড়াইয়া বলিলেন "আমার জন্য তুই জেগে র'য়েছিস্‌ মঞ্জুল্‌!" তাহার স্বর স্নেহমাখা। তৃপ্ত নয়নে বালক সুধু তাহার মুখের দিকে চাহিল, কোন উত্তর করিল না।

আহারান্তে ভৈরব আসিয়া শিবিরের দরোজার সম্মুখে উপবেশন করিলেন; বালক আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল। বাঁ হাতে তাহার ডান হাত ধরিয়া তিনি তাহাকে কাছে টানিয়া আনিলেন। বুঝিতে পারেন না তিনি কেন এমন হয়, কিন্তু যখনি তিনি বালককে দেখেন, যখনি তাহাদের চারি চক্ষুতে মিলন হয়, তখনি তাহার ইহাকে বুকে উঠাইয়া লইতে ইচ্ছা হয়।

তিনি তাহাকে টানিয়া আনিলেন; কিন্তু বালক একটু পিছাইয়া গেল। তখন ভৈরব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমি যদি মরি, তুই আগোড়ে ফিরে যা'স্; যা'তে তুই পালিয়ে যেতে পারিস্, আমি বন্দরানাককে তার বন্দোবস্ত ক'রে রাখ্তে বলেছি। এই শিবিরের পেছনে, আজই তোর জন্য ঘোড়া এসে প্রস্তুত থাক্বে। যাই দেখ্বি, যবন তীরে নেবেছে, অমনি ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যাস্; আর পেছন দিকে তাকা'স নে। তীমাকে বলিস্, আমার অপূর্ণ কাজ যেন পূর্ণ ক'রে সে মরে।"

কতক্ষণ ভৈরবের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বালক হাসিয়া উঠিল; বলিল "সে ম'র্বে, আর আমি বুঝি পালা'বো?"

তাহার কথা শুনিয়া ভৈরব স্তব্ধ হইলেন; মরাটাকে বালক কি নিতান্তই হাসিয়া উড়াইবার জিনিষ মনে করে? শেষে বলিলেন "পাগল তুই! মরা খেলার জিনিষ নয়। আমি যা' বল্লেম্ তাই করিস্।"

"না এটি পার্বো না।"

"তোকে যে তা'হলে যবন ধরে নিয়ে যা'বে।"

"যাক্।"

ভৈরব মঞ্জুলের মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন সেখানে ছেলে-মানুষি নয়, স্পষ্ট দৃঢ়তা অঙ্কিত রহিয়াছে। বিস্মিত হইলেন। তারপর ভাবিলেন, হয়ত, সংসারে যা'দের স্নেহ ও ভালবাসায় বাঁচিয়া থাকিতে

সাধ হয়, তাদের কেউ না থাকাতে বালক বয়সেই মঞ্জুলের প্রাণে একটা ঔদাস্য ও বৈরাগ্যের ভাব জন্মিয়াছে। তাই স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন "তুই নিতান্ত ছেলে মানুষটি; বেঁচে থাক্‌লে সংসারে অনেক সুখ ভোগ ক'র্‌তে পার্‌বি। আমার কথা শোন্, পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাস্। যবনের হাতে যদি পড়িস্, দুঃখ-দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না।"

ধীরভাবে মঞ্জুল উত্তর করিল "দুঃখদুর্গতি যদি কপালে লেখা থাকে, তবে কিছুতেই তা' খণ্ডন হ'বে না। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এল; ভোর না হ'তেই আবার আপনাকে বেরুতে হ'বে। আপনি এখন শুতে চলুন।"

এতক্ষণ ভৈরব যুদ্ধের কথা বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। বালকের কথায় তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া তিনি শয়ন করিতে গেলেন। মঞ্জুলও যাইয়া শয়ন করিল। কিন্তু আজ আর কিছুতেই তাহার নিদ্রা আসিল না। শয্যায় কতক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া, আস্তে আস্তে সে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

তখন চন্দ্র অস্তগমনোন্মুখ। যবন রণ-পোতগুলি নীরব নিশ্চল; যেন কি এক মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তীরে, রাজপুত সৈন্যগুলিও, সম্মুখে ভীষণ প্রভাতের কথা বিস্মৃত হইয়া, উন্মুক্ত আকাশের তলে, মহা আরামে নিদ্রা যাইতেছে। কেবল সতত-চঞ্চল প্রহরীগুলির পদশব্দে ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, সুপ্ত সাগরতীরের সে মহান্ স্তব্ধতা যা—একটু ভঙ্গ হইতেছে। শিবিরের বাহিরে আসিয়াই মঞ্জুলের হৃদয় যেন এক মহা অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! সে আপনাআপনি বলিয়া উঠিল, "বা, চারিদিকেই কেমন শান্তি! সাগর শান্ত, তরঙ্গ-লেখাটি পর্য্যন্ত নেই; আকাশ স্তব্ধ; যুদ্ধ জাহাজগুলিও নীরব, নিশ্চল। হায়! চিরদিন কেন এমন থাকে না! রাত ভোর হ'য়ে আর কাজ নেই!"

এমন সময় অমলাকে সঙ্গে লইয়া যোদ্ধ,বেশে বন্দরাধ্যক্ষ কণাদ

আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। কণাদ শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইতেই, প্রহরীগণ দ্বার ছাড়িয়া দিল; বৃদ্ধ ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

অমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখ্‌ছিস্‌ মঞ্জুল?"

উত্তর না দিয়া মঞ্জুল প্রতিপ্রশ্ন করিল "তুমি কি এখন চ'লে যাচ্ছ?

"হাঁ, কণাদের স্ত্রী মেয়ে সব প্রস্তুত। সেনাপতির সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আমি এখনি যাবো। তুমিও আমার সঙ্গে চলনা মঞ্জুল?"

"সাধ্য নেই।"

"কেন?"

"প্রেমে পড়েছি।"

অমলা হাসিয়া উঠিলেন "ওই সাগর আছে, ডুবে মর্‌গে।"

ইহাদের কথা শেষ হইতে না হইতে ভৈরব ও কণাদ বাহিরে আসিলেন।

মঞ্জুলকে দেখাইয়া ভৈরব বলিলেন "এই বালকটাকে নিয়ে আমি বড় বিব্রত হ'য়ে পড়ছি! মঞ্জুল, এখনো শোন্‌, তুই আলোড়ে ফিরে যা।"

প্রতিধ্বনি করিয়া কনাদ বলিলেন "হাঁ, তুই আলোড়ে ফিরে যা।"

গ্রীবা বাঁকাইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে মঞ্জুল উত্তর করিল "এই কি আপনাদের দেশের চিন্তা? উন্মুক্ত তলোয়াড় হাতে যবন সম্মুখে দাঁড়িয়ে; দেশের শান্তি, স্বাধীনতা যায় যায়! কোথায় সে চিন্তা কর্‌বেন—না, আপনারা একটা ছোক্‌রাকে নিয়েই এত ব্যস্ত! আমার প্রাণটা কি এতই মূল্যবান্‌ হ'লো! ওই দেখুন, জাহাজগুলো তীরের দিকে আস্‌ছে! যা'তে নিজেদের প্রাণ, দেশের স্বাধীনতা, রক্ষা কর্‌তে পারেন, তাই করুণ গে।" বালক মুখ ফিরাইল।

ভৈরব, কণাদ চাহিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই রণপোতগুলি চঞ্চল

হইয়া উঠিয়াছে; বুঝিলেন, এখনি আক্রমণ আরম্ভ হইবে। উভয়ে ক্রস্ত সৈন্য শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা প্রস্তুত হইয়া সেনাপতির অপেক্ষা করিতেছিল। ভৈরব শঙ্খধ্বনি করিলেন; সব শান্ত নীরব হইল: ধনুর্ব্বাণ হস্তে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া, সেনাপতির আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে ভৈরব বলিলেন "ওই জাহাজ তীরের দিকে আস্‌চে। এখনি যবন আক্রমণ কর্‌বে। প্রাণ পণ, যবনকে সিন্ধুর পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ কর্‌তে দিও না। শুধু আমাদের প্রাণ নয়, সমগ্র হিন্দুস্থানের মান-সম্ভ্রম, ধর্ম্ম-স্বাধীনতা, শান্তি-সুখ—সকলি এ যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর ক'চ্ছে। আজ যদি মুসলমান্ সিন্ধু অধিকার কর্‌তে পারে, রাজপুত বীরবৃন্দ, তোমরা নিশ্চয়ই জেনো, তা হ'লে আমাদের স্বাধীনতা, ধর্ম্ম, স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা কিছুই তা'দের হাতে রক্ষা পাবে না। যা' নিয়ে মনুষ্যত্ব, যা' নিয়ে সংসারে আমরা সুখী, যা নিয়ে আমাদের ইহকাল পরকাল, যা'তে সেগুলো রক্ষা কর্‌তে পারি, এসো ভাই প্রাণপণে আমরা তাই করি। আর যদি না পারি, প্রাণ পাত ক'রে জন্মভূমির কাছে বিদায় নিয়ে অক্ষয় স্বর্গলাভ করি।"

সমবেত কণ্ঠে, দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া, সিন্ধুর ধমণীতে ধমণীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া, সৈন্যগণ চিৎকার করিয়া উঠিল, "জয় মা ভবানীর জয়! জয় সিন্ধু-রাজ দাহিরের জয়।" অমনি যবন জাহাজ হইতে সিন্ধু-বক্ষঃ আলোড়িত করিয়া প্রতিধ্বনি উঠিল "আল্লা আল্লাহো আকবর!" আর মুষলধারে তীর আসিয়া রাজপুত সৈন্যদিগকে অভিবাদন করিল।

———০———

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

আজ দুই দিন ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছে; জয়-পরাজয় আরম্ভে যেমন, এখনো তেমনি অনিশ্চিত রহিয়াছে। অনেক সিন্ধু-সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে—কিন্তু মুসলমানও তীরাভিমুখে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার অন্ধকারে রাত্রিকার মত যুদ্ধ স্থগিত হইল। শিবিকা করিয়া আহতদিগকে শিবিরের পশ্চাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। সেখানে তাহাদের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা আরম্ভ হইল। নৈশ-অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া সিন্ধু-বক্ষ উজ্জ্বলিত করিয়া, মৃত-দিগের সৎকার হইতে লাগিল।

এই দুই দিনের যুদ্ধে মুসলমান্-সেনাপতি কাশেমের মনেও আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে, সিন্ধু বুঝি আর পদানত হইল না। তাহারও অনেক সৈন্য হতাহত হইয়াছে। বুঝিলেন এমন ভাবে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে, সহজে ফল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। পরামর্শের জন্য প্রধান সহকারী রহিম খাঁকে আহ্বান করিলেন।

রহিম খাঁ আসিয়া অভিবাদন করিলেন। তিনি একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় পুরুষ; বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও ক্ষুদ্র; সমগ্র মুখমণ্ডল দাড়িসমাচ্ছন্ন। প্রায়ই বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কথা বলবার তাঁহার কেমন একটা অভ্যাস ছিল।

কাশেম বলিলেন "খাঁ সাহেব, যুদ্ধের গতিক কেমন মনে হ'চ্ছে?" উন্মুক্তগবাক্ষপথে শত্রু-শিবিরের দিকে চাহিয়া সহকারী উত্তর করিলেন "আমার ত' বড় ভাল মনে হ'চ্ছে না। একবার তাঁরে মারতে পারলে যা' হোক্, একটা কিছু করা যেত।"

হাসিয়া কাশেম কহিলেন "তা' তো দেখতে! কিন্তু সেই তীরে নাবাই যে অসম্ভব ব'লে বোধ হ'চ্ছে। কাফের বীর বটে! এখন কি করা যায়? এমন ক'রে সৈন্যক্ষয় ক'রে লাভ কি হ'বে, বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া রহিম বলিলেন "একটা কাজ করলে মন্দ হয় না।"

সাগ্রহে সেনাপতি বলিলেন "কি কাজ?"

দাড়ির মধ্যে উভয় হস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ক্ষুদ্র চক্ষু আরো ক্ষুদ্রতর করিয়া রহিম কতক্ষণ কি ভাবিলেন; শেষে বলিলেন "হুঁ, ভালই হ'বে ব'লে আশা হ'চ্ছে।"

অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে কাশেম জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপারখানা কি?"

তখন রহিম, আরো নিকটে আসিয়া, বঙ্কিম দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন; সন্ধির প্রস্তাব ক'রে কাল দূত পাঠানো যা'ক; আমি নিজে যা'বো।"

"তার পর?"

"সেবার যখন আমি এসেছিলেম, তখন ওই কণাদ ব'লে যে ওদের বন্দরাধ্যক্ষটা আছে, তা'কে আমি বিশেষ ক'রে জেনে গেছি। লোকটা ভারি উচ্চাকাঙ্ক্ষী; স্বার্থসিদ্ধির জন্য বোধ হয় সব কাজই করতে পারে।" রহিম বঙ্কিম নয়নে একবার কাশেমের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

কাশেম বলিলেন "আচ্ছা, তারপর!"

খুব আস্তে আস্তে খাঁ সাহেব বলিতে লাগিলেন "ওই লোকটাকে হাত ক'রতে হ'বে। সিন্ধু জয়ের পর ওকেই রাজসিংহাসন দেবো ব'লে যদি আমরা আশা দিই, তবে বোধ হয়, কাজ হাঁসিল করাটা আর তত কঠিন হ'বে না।"

মুদ্রিত নয়নে কাশেম কতক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন "তা' কাফেরের অন্ধকার দেশে, ধর্ম্মের আলো জাল্‌বার জন্য, সবই করা যেতে পারে। কত কি ভাল জিনিষের প্রলোভন দেখিয়ে মাও ত' রুগ্ন সন্তানকৈ যাচ্ছেতাই ঔষধ সব খাইয়ে থাকেন। আচ্ছা, আপনি ঠিক জানেন, লোকটা এমন প্রকৃতির?"

হাসিয়া সহকারী বলিলেন "নিশ্চিত না জেনে রহিম খাঁ কোনো কাজে হাত দেয় না।"

রজনী প্রভাত হইতে না হইতে, যবন রণপোতগুলির উপর শ্বেত-পতাকাসমূহ পতপত্‌ করিয়া উড়িতে লাগিল। প্রহরীরা তাহা দেখিতে পাইয়া সেনাপতিকে সংবাদ দিল। বাহিরে আসিয়া ভৈরব দেখিলেন, প্রহরীদের কথা সত্য। তিনি বিস্মিত হইলেন—এত সহজেই যবন সন্ধি করিতে চাহিতেছে!

বেলা হইলে, সেনাপতির জাহাজ হইতে একখানা নৌকা জলে নামানো হইল; শ্বেতপতাকা হস্তে সহকারী সেনাপতি রহিম খাঁ নৌকায় আরোহণ করিলেন; তিন জন মাত্র নাবিক বাহিয়া তীরে লইয়া গেল।

রহিম অবতরণ করিলেন। তাহাকে সেনাপতির শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। তখন ভৈরব ও কণাদ বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলেন। রহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, ভৈরবের হস্তে কাশেমের পত্র প্রদান করিলেন। ভৈরব পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। রহিম কণাদের দিকে একবার অর্থসূচক দৃষ্টিপাত করিলেন। কণাদ তাহা দেখিলেন।

পত্র পাঠ হইলে, ভৈরব রহিমকে উপবেশন করিতে বলিয়া কহিতে লাগিলেন "সন্ধির প্রস্তাবে আমার নিজের কোনো অমত নাই। তবে মহারাজার অনুমতি ব্যতীত আমি কোনো কথাই বলিতে পারি না। সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন, এর মধ্যে রাজধানী হইতে উত্তর আসিবে।"

তিনি উঠিয়া দাহিরের নিকট নিজে একখানা পত্র লিখিলেন ; এবং ইহা ও মুসলমান-সেনাপতির পত্র একজন অশ্বারোহী সৈনিককে দিয়া আলোড়ে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর কণাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন "খাঁ সাহেবকে আপনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান ; উপযুক্ত অভ্যর্থনার যেন ত্রুটী না হয়।" অভিবাদন করিয়া কণাদ ও রহিম গাত্রোত্থান করিলেন।

বন্দরাধ্যক্ষ খাঁ সাহেবকে লইয়া আপনার গৃহের এক নিভৃততম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজে একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলেন। প্রহরীকে বলিয়া আসিলেন—কেহ যেন প্রবেশ করিতে না পায়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি আসিয়া উপবেশন করিলেন। প্রাচীর-শীর্ষে, ছাদ-সংলগ্ন কয়েকটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল ; তাহাই দিয়া যে ম্লান আলোক আসিয়া ঘরে পড়িতেছিল, তৎসাহায্যে তিনি দেখিতে পাইলেন, খাঁ সাহেবের চক্ষু দুইটী জল্ জল্ জ্বলিতেছে।

তিনি বসিবামাত্র রহিম খাঁ হাসিয়া বলিলেন "আপনার সাহসকে ধন্যবাদ ! আমায় নিয়ে আপনি এই নিভৃতকক্ষে একাকী এসে বস্‌লেন ; একটু ভয় হ'লো না !"

কণাদ চমকিয়া উঠিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া বলিলেন "শিকারী বেড়ালের গোঁফ্ দেখলেই চেনা যায় ! আমি আপনাকে চিনেছি, আপনি ও আমায় চিনেছেন। এখন কথা বলুন।"

রহিম একখানা পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "আমাদের সহায় হোন্, দাহিরের বদলে সিন্ধুর সিংহাসন আপনার হোক্, এই আমাদের ইচ্ছা ও প্রার্থনা।"

উজ্জ্বল চক্ষুতে একবার মুসলমানের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কণাদ পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। রহিম তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

পত্রপাঠ শেষ হইল; নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া কণাদ কতক্ষণ চিন্তা করিলেন; তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, বক্ষস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। কাছে আসিয়া তিনি রহিমখাঁকে বলিলেন "খাঁ সাহেব, আপনারা যবন,— আপনাদের কথায় প্রত্যয় করি কেমন করে'।"

মিটি-মিটি চাহিয়া ধীরদৃঢ়ভাবে রহিম উত্তর করিলেন "বিশ্বাস করা, না করা আপনার ইচ্ছা। আমরা সত্যই লিখেছি। বিশ্বাস করেন, সিন্ধু-রাজ্য আপনার হ'বে; বিশ্বাস না করেন, যুদ্ধের ফলে যা' হয় হ'বে।"

কণাদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায় রাজ্য দিয়ে আপনাদের লাভ?"

"লাভ এই—সিন্ধু হিন্দুস্থান প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। এই দ্বারের রক্ষী যদি আমাদের বন্ধু হ'ন্, তা'হ'লে সমগ্র হিন্দুস্থানে আমরা ধীরে ধীরে বিজয়-নিশান উড়া'তে পার্‌বো; আবশ্যক হ'লে এখানে এসে আশ্রয়ও নিতে পার্‌বো।"

অবনত মস্তকে কণাদ চিন্তা করিতে লাগিলেন। রহিম্ খাঁ আবার বলিলেন, "পরের দাসত্বে সুখ, না, স্বাধীন ভাবে রাজসিংহাসনে বসা সুখের? সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মুসল্‌মানের বন্ধুত্ব প্রার্থনীয়, না, সামান্য একটা রাজার দাসত্ব বাঞ্ছনীয়?" খাঁ সাহেব আরো নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি বুদ্ধিমান বিবেচক,—একবার মনে তৌলিয়ে দেখুন, প্রবলপ্রতাপান্বিত বাগ্‌দাদ্‌পতির বিরুদ্ধে—যাঁর বিরুদ্ধে কোনো দেশের কোনো জাতি দাঁড়া'তে সাহস করেনি, যাঁর নামে সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হয়, যাঁর উদ্যত অস্ত্রের নিকট স্ত্রীপুরুষ বিচার নাই—সেই কালিফের বিরুদ্ধে এই নগণ্য সিন্ধু-রাজ কয়দিন আত্ম-রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন? এখন আমাদের কথায় যদি অসম্মত হ'ন, পরে—যখন দেখ্‌বেন, যবনের অসির আঘাতে কেমন করে' স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধের রক্তে মেদিনী রঞ্জিত হয়, তখন—এর জন্য আপনাকে

অনেক অনুতাপ ক'র্‌তে হ'বে। কিন্তু তখন আর সময় থাকবে না। যা' হয়, আমায় একটা জবাব দিন্।"

মাথা তুলিয়া কণাদ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সৈন্য-সামন্ত সবই যে সেনাপতির হাতে?"

খাঁ সাহেব তাড়াতাড়ি বলিলেন "হো'ক্ না; তা'দের সাহায্য আমরা চাই না।"

"সিন্ধু-রাজ সন্ধিতে রাজী হ'বেন না।"

"না-ই বা হ'লেন। আপনি একটা কাজ করুন্ না,—সে লোক সিন্ধু-রাজের উত্তর নিয়ে ফিরে আস্‌বে, সে যেন আপনাদের সেনাপতির কাছে আর ফিরে যেতে না পারে। সন্ধ্যার পরে আমি জাহাজে ফিরে যা'বো। রাজার একটা উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত যবন আর যুদ্ধ ক'র্‌বে না, সৈন্যদের মধ্যে আপনি এ কথাটা কোনো প্রকারে প্রচার ক'রে দেওয়া'বেন। উপর্য্যুপরি দু'দিনের এই ভীষণ পরিশ্রমের পর এ সংবাদে নিশ্চয়ই তা'রা গা ছেড়ে দিয়ে পড়্‌বে।"

তার পর, কণাদের কাণের কাছে মুখ আনিয়া অতি মৃদুস্বরে তিনি কি বলিতে লাগিলেন; হঠাৎ কণাদ চমকিয়া উঠিলেন। হাসিয়া খাঁ সাহেব বলিলেন "এই আপনাদের সাহস! আর এ নিয়ে মুসল্‌মানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন! যা ব'ল্লেম্, তা ক'র্‌তেই হ'বে। নইলে সহজে কাজ হাঁসিলের আর আশা নেই। আপনি ভেবে দেখুন।"

কণাদ উঠিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন। খাঁ সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন "ভুল বুঝেছি আমরা; আপনার মত দুর্ব্বলচিত্ত কাপুরুষের সঙ্গে বন্ধুতা করায় কোনো ফল হ'বে না। সেনাপতির সঙ্গেই এ বিষয়ে একটা বন্দোবস্ত ক'র্‌তে হ'বে, দেখ্‌চি। যার যেমন কপাল! তার কপালে রাজত্ব, আপনার অদৃষ্টে দাসত্ব! আপনি রাজা হ'বেন কেমন ক'রে?"

কণাদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন ও ত্রস্তভাবে বলিলেন "না, তার কাছে আর যেতে হ'বে না। আমি ভেবে দেখ্‌লেম, আপনি যা' বলেছেন, তা' না হ'লে আর সহজে কার্য্যসিদ্ধি হ'চ্ছে না। আমি রাজী আছি।"

তখন রহিম খাঁ উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এই ত বীরের মত কথা!"

উভয়ে বাহিরে আসিলেন।

——১——

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পাদ-ক্ষেপ।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। সিন্ধু-রাজের উত্তর লইয়া এখনো কোনো লোক ফিরিয়া আসিল না। ভৈরবকে অভিবাদন করিয়া রহিম খাঁ বলিলেন "আমার এখন জাহাজে ফিরে যেতে হ'চ্ছে। মহারাজের লোক ত এখনো এলোনা; তা',কাল সকালেও আস্‌তে পারে—বিষয়টা বিবেচনার কিনা। কাল সকালে আমি আবার আস্‌বো। মহারাজের উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা অস্ত্রে হাত দেবো না; প্রার্থনা করি, আপনিও তাই কর্‌বেন!"

হাসিয়া ভৈরব উত্তর করিলেন "হিন্দু বিশ্বাসঘাতক নয়!"

কণাদের বুক কাঁপিয়া উঠিল, মুখ ম্লান হইল। কিন্তু কেহ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। অভিবাদন করিয়া খাঁ সাহেব বিদায় হইলেন।

সৈন্যগণ জানিতে পারিয়াছে, সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে; মহারাজার নিকট পত্র প্রেরিত হইয়াছে; উত্তর আসিবার পূর্ব্বে আর কিছু হইবে না। এদিকে ক্রমাগত দুই দিনের পরিশ্রম ও উত্তেজনায় শরীর এবং মনও তাহাদের অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ তাহারা আর উপযুক্ত

সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিল না। অস্ত্র শস্ত্র খুলিয়া রাখিয়া তাহারা বিশ্রাম করিতে লাগিল। যে সকল সৈনিক প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারাও আজ ততটা সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করিল না। মোটকথা, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রম করিতে না করিতেই সিন্ধু-শিবির নীরব, নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল।

যখন চতুর্দ্দিকে জনমানবের সাড়াশব্দ ছিল না, যখন প্রহরীগণ পাদচারণা ত্যাগ করিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল, তখন কণাদ নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে আসিয়া শিবিরপার্শ্বস্থ একটা বৃহৎ বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন। তাহার মুখ নিষ্প্রভ, হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগের, রাজভক্তি ও স্বার্থপরতার, ভীষণ দ্বন্দ চলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন "না, বিশ্বাসঘাতকের মুক্তি নাই। রাজ্যে রাজপাটে আমার কাজ নেই।" ফিরিয়া চলিলেন সত্য; কিন্তু প্রতিপাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই দুইবার করিয়া পশ্চাতে, যবন-জাহাজের দিকে, চাহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেনাপতির জাহাজে একটা লাল আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কণাদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন; নিমিষের মধ্যে কে যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন, রাজার ঐশ্বর্য্য-প্রতাপ, সকল আনিয়া উপস্থিত করিল! রাজমুকুট-পরিহিত, সিংহাসনোপবিষ্ট স্বকীয় প্রতিমূর্ত্তি কণাদের চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; চকিতে সমুদ্রতীরাভিমুখে ছুটিলেন; এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, যবন-পোতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে একখানা ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল।

সহকারী সেনাপতি রহিম খাঁ উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং কণাদের হাত ধরিয়া বলিলেন "বন্ধু, সব ঠিক আছে ত'?"

"হাঁ।"

তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া খাঁ সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন, "খোদার মর্জ্জি হ'লে কালই তোমায় সিন্ধুর সিংহাসনে বসিয়ে চক্ষু সার্থক ক'র্‌বো। চল, আর দেরী করা ঠিক নয়; সেনাপতির শিবিরে চল।"

উভয়ে নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে নিদ্রিত ভৈরবের শিবিরের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ফিস্ ফিস্ করিয়া দু'জনের মধ্যে কি কথা হইল; কণাদ ধীরে ধীরে যাইয়া দেখিয়া আসিলেন, প্রহরী অঘোরে ঘুমাইতেছে।

কণাদ সেইখানেই প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার চক্ষুতে পলক নাই; হস্তপদ বাতপীড়িতের মত আড়ষ্ট,—শক্তিহীন।

অতি সন্তর্পণে পাদক্ষেপ করিতে করিতে রহিম খাঁ শিবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রণ-পোতে লাল আলোর সঙ্গে সঙ্গে একটি সাধারণ আলোকও প্রজ্জলিত হইয়াছে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি শিবির দ্বারে যাইয়া উপনীত হইলেন, প্রহরী তখনো ঘুমে অচেতন। টিপি টিপি পা ফেলিয়া রহিম, প্রহরীকে পশ্চাতে রাখিয়া, শিবির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই স্থানটি একটি বারেন্দার মত। আরো একটু অগ্রসর হইয়া, খাঁ সাহেব যাইয়া ঠিক সেনাপতি ভৈরবের শয়ন কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

"ভীমা, প্রাণেশ্বরি আমার, আমার অপূর্ণ কাজ পূর্ণ ক'রে ম'রো। সুখে থাকিস্, মঞ্জুল" বলিতে বলিতে ভৈরব পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। এতক্ষণ তাহার মুখ রহিম খাঁর দিকে ছিল, এখন পৃষ্ঠদেশ পড়িল। প্রথমটায় রহিম মনে করিলেন, সেনাপতি জাগ্রত রহিয়াছেন;—তাই তিনি একটু পিছাইয়া যাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন,—না, আর কোনো কথা শুনা যাইতেছে না—ঐ যে দিব্য সজোরে শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া চলিতেছে! কাপুরুষ গুপ্তহত্যাকারী পূর্ণ পাপের প্রতিমূর্ত্তি রহিম খাঁ, পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া, শাণিত কৃপাণ হস্তে করিয়া ঠিক কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কোনো দিকে দৃক্পাত

না করিয়া, সলম্ফে নিদ্রিত ভৈরবের উপর পতিত হইয়া তীক্ষ্ণধার ছোরাটি তাহার পৃষ্ঠদেশে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। ভৈরবের মুখ হইতে একটা ভীষণ 'উঃ, বিশ্বাস ঘাতক!' শব্দমাত্র বাহির হইল। পার্শ্বস্থ কক্ষে, চমকিয়া মঙ্গল উঠিয়া দাঁড়াইতেই, ভৈরবের পৃষ্ঠোপরি পতিত রহিম খাঁর ভীষণ মূর্ত্তি তাহার চক্ষুতে পড়িল; অমনি সমুদয় অবস্থা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল। উপাধানের নিম্নে শাণিত ছোরা ছিল; তড়িদ্বেগে তাহা টানিয়া লইয়া রহিম খাঁকে লক্ষ্য করিয়া বালক ছুটিল; এবং সিংহ যেমন করিয়া শিকারের উপর যাইয়া পড়ে, তেমনি ভাবে যাইয়া তাহার উপর পড়িল। লক্ষ্য না করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত রহিম ছুটিয়া পলাইল; বালকের দুর্ব্বল হস্তের আঘাতে তাহার বাম কর্ণ ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইল। নিমেষের মধ্যে এই সকল ঘটিয়া গেল। বালক ভৈরবের মস্তক কোলে করিয়া বসিয়া পড়িল।

এদিকে, রহিম খাঁ আসিবার কিছু পরে, পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে, পাঁচ, সাত, দশ, পনের করিয়া মুসলমান্ সৈন্য চোরের মত আসিয়া তীরে অবতরণ করিতেছিল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে প্রায় চার আনি-পরিমাণ সুসজ্জিত, সুদক্ষ সৈনিক সমভিব্যাহারে কাশেম আসিয়া সিন্ধুর পবিত্র ভূমিতে পদক্ষেপ করিলেন। রহিম খাঁ যখন মঙ্গলের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন, তাহার কিছু পরেই আকাশ পাতাল আলোড়িত করিয়া মুসলমানের আল্লা-আল্লা হো ধ্বনি নিরস্ত্র নিদ্রা-কাতর রাজপুত সৈন্যের কাণের কাছে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভীত, চকিত হইয়া, নিদ্রালস চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে তাহারা, অবস্থা-পর্য্যালোচনা না করিয়াই, যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিতে লাগিল। অধিকসংখ্যক হত ও আহত হইয়া পড়িয়া রহিল; কতক সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল; বাকী যাহারা, তাহারাও অন্ধকারে হস্ত পদ ভাঙ্গিয়া, যে যেখানে পারিল, যাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। হিন্দুর অস্ত্রশস্ত্র, হাতী

ঘোড়া, দ্রব্যজাত সকলই কাশেমের হস্তগত হইল। আবার বিজয়ী মুসলমানের জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিয়াছে; উষার অরুণ রাগে পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

কাশেম চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, "বাঃ! কেমন সুন্দর বন্দর! কাফেরের রুচি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রশংসনীয়। প্রাণ পণ, এদেশে পবিত্র ইস্‌লাম্‌-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত কর্‌তে হ'বেই।" তারপর, সমবেত সৈন্য-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বীরগণ, এ বীরের দেশ; দেখেছিলে ত কাফের কেমন যুদ্ধ করে! এখনো আমরা জয়ী হইনি। যতদিন না রাজধানী আলোর আমরা অধিকার করেছি, তত দিন জয়লাভ করেছ ব'লে মনে ক'রোনা, অন্য কোনো দিকে মন দিও না। নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার অনাচার ক'রো না; যে ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে চলে, খোদা তার সহায় হ'ন। স্ত্রীলোকের রক্তে, বালকের রক্তে, কখনো যেন তোমাদের পবিত্র অস্ত্র কলঙ্কিত না হয়। সর্ব্বত্র স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা ক'রে চ'লো"।

সেনাপতি যখন সৈন্যদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন সহকারী রহিম খাঁ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছেন; তাহার উষ্ণীষটি কাণের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাশেম আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "খাঁ সাহেব, আপনার বুদ্ধি-কৌশলেই এত সহজে আমরা বন্দর অধিকার করেছি। আপনার খবর কি?"

অভিবাদন করিয়া রহিম্‌ বলিলেন "সেনাপতি বোধ হয়, এতক্ষণ বেঁচে নাই। চলুন্‌ একবার দেখে আসিগে। বন্দরাধ্যক্ষ তার আপন গৃহে আছে।"

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মঞ্জুলের পরিচয়।

ভৈরবের আঘাতটি ঠিক পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে না লাগিয়া, কিঞ্চিৎ নিম্নে লাগিয়াছিল। মঞ্জুল্ যখন তাহার মস্তক কোলে করিয়া, উন্মত্তের মত চারিদিকে চাহিতেছিল, কি করিতে হইবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, ভৈরব তখন নিমীলিত নেত্রে, অতি কাতরস্বরে চাহিলেন —"জল।" ধীরে ধীরে তাহার মস্তক উপাধানের উপর রাখিয়া, জল আনিয়া বালক একটু-একটু করিয়া মুখে ও চোখে দিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ভৈরব চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন: তাহার চক্ষুর তারা নিষ্প্রভ; চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। মঞ্জুল্‌কে চিনিতে না পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও?" বালক কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল "আমি মঞ্জুল্।"

ঠিক এই সময়ে তীরাবতীর্ণ মুসল্‌মান্‌গণ প্রথম জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; ভৈরব কাণ খাড়া করিয়া শুনিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সকল মনে পড়িয়া গেল; ক্ষতমুখে হু-হু শব্দে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। কাতর জড়িতস্বরে তিনি বলিলেন "মঞ্জুল, তুই এখনো পালাস্‌নি?—যা, যা, দেরী করিস্‌নে। ঐ মুসলমান্ এসেছে—বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে সর্ব্বনাশ করেছে—উঃ, বিশ্বাস ঘাতক!—পালিয়ে যা, পালিয়ে যা, আর দেরী করিস্‌নে।" তিনি হাত উঠাইবার চেষ্টা করিলেন; পারিলেন না। মঞ্জুল্ তাহার কাছে বসিয়া, আপনার কুসুম-কোমল হস্তে তাহার হস্ত উঠাইয়া লইল। তাহার চক্ষু পলকহীন; নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

ভৈরব আবার কহিলেন "মঞ্জুল, কেন এমন ক'রে আমার জন্ত প্রাণ দিচ্ছিস্? এখনো সময় আছে—পালিয়ে যা।"

ধীর ভাবে বালক বলিল "আপনি অত কথা ব'ল্‌বেন না; বেশী কষ্ট হ'বে।"

ভৈরব তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার চক্ষুর কোণ জলে ভরিয়া আসিল, "পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই তুই আমার কেউ ছিলি! এখনো পালিয়ে যা—কেন আমার জন্য মর্‌বি? আমি তোর কে?"

এবার বালক ধীর স্থির ভাবে ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমার কে?—তবে শোন ভৈরব,—আজ আমাদের উভয়ের শেষ দিন—তুমি আমার কে। তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, ইহ-পরকালের দেবতা, চক্ষুর তারা, হৃদয়ের শান্তি! মনে পড়ে কি ভৈরব, লছমন্ ব'লে তোমার এক শূদ্র চাকর ছিল, তার ছোট একটা মেয়ে ছিল—তা'কে তুমি আদর ক'র্‌তে, সোহাগ ক'র্‌তে! মনে পড়ে কি?"

ভৈরব কোন কথা বলিলেন না।—একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; যন্ত্রণার ছবি যেন তাহার মুখ হইতে অনেকটা অপসারিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববৎ মঞ্জুল্ আবার বলিতে লাগিল, "আমিই সেই সাবিত্রী। তুমি আমায় পাগল করিয়াছিলে! যখন বয়স হলো, তেরো গিয়ে চৌদ্দতে পা দিলেম, তখন প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্‌লো; স্বপ্নজাগরণে তোমায়ই দেখতেম্! তখন তোমার স্ত্রী হয়েছে, পরম সুখী তুমি। একবার মনে হলো, তোমায় সব খুলে বলি; আবার ভাবলেম্, না, ফল হবে না। কহ্লন্ ঠাকুরের অসাধারণ ক্ষমতা; তাঁর পা জড়িয়ে ধরে' সব বল্লেম্—তাঁরই পরামর্শে ঘর থেকে পালিয়ে যাই; তাঁরই উপদেশে পুরুষ সেজে তোমার চাকরী করতে থাকি।"

ধীরে ধীরে ভৈরব বলিলেন "একথা কেন আমায় আগে বলনি?" তাঁহার স্বর কম্পিত; চক্ষু নিমীলিত।

"কেন বল্‌বো? যা চেয়েছিলেম তা'ত পেয়েছি। তুমি আমার

ভাল বেসেছ, আদর করেছ, কাছে কাছে রেখেছ! আমার আর ত কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না! বল্‌লে হয়ত তুমি আমায় তাড়িয়ে দিতে,—ভীমার কত কষ্ট হতো!"

বামহস্ত বাড়াইয়া ভৈরব মঞ্জুলের মুখখানা বুকের উপর টানিয়া নিলেন। এমন সময় আবার যবনের সেই জয়ধ্বনি ঘন ঘন শ্রুত হইতে লাগিল। আহত সেনাপতি সস্নেহে বলিলেন "মঞ্জুল্!—না, সাবিত্রী আমার! আজ আমার মরণেও মহাসুখ! আঃ, আগে যদি আমায় বল্‌তে! আমার কথা শোন, পালাও তুমি, পরকালে আবার আমাদের দেখা হবে; আমরা অনেক সুখী হবো। ঐ যে বড় গোল হচ্ছে, যবন এলো বলে'! পালাও তুমি!"

মুখ তুলিয়া মঞ্জুল্ বলিল "হাঁ, এক সঙ্গেই পালাবো।" তারপর গদ-গদ কণ্ঠে কহিল,—"বল ভৈরব, এই শেষ সময়ে একটি বার বল, আমায় তুমি ঘৃণা কর না!"

কষ্টে হাত বাড়াইয়া এবার মঞ্জুলের সুন্দর মুখখানা আরো নিকটে টানিয়া আনিয়া চুম্বন করিয়া ভৈরব উত্তর করিলেন "ঘৃণা! সময় নেই, সাবিত্রি, তা না হ'লে বোঝাতেম্, কি করি!" তিনি আবার চুম্বন করিলেন; সাবিত্রীর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, শরীর শিহরিয়া উঠিল—পরক্ষণে সে আরাধ্যদেবতার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

এমন সময় দুইজন সৈনিক সমভিব্যাহারে কাশেম ও রহিম আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পদশব্দ শুনিয়াই, শাণিত কৃপাণ হস্তে সাবিত্রী, লাফাইয়া উঠিলেন; ভৈরব চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। রহিমের দিকে নির্ণিমেষ জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চাহিয়া সাবিত্রী বলিলেন "আবার এসেছিস্ পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক যবন! এই তোর পাপের প্রতিফল!" বলিতে বলিতে বাঘিনীর মত যাইয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন; কিন্তু একটা সৈনিকের মুক্ত তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রেমময়ী

ভূতলে পড়িয়া গেলেন! উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া ভৈরব উঠিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে যাইয়া শয্যা হইতে পড়িয়া গেলেন; হু হু শব্দে শোণিত-প্রবাহ ছুটিল; ভৈরবের আত্মা সাবিত্রীর অনুগমন করিল।

—·o—

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—আরও একটুকু।

কাশেমের নিষেধ সত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান সৈন্যগণ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে, দেবল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধক্ষম যাহারা ছিল, তাহারা গতরজনীতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; এখন দেবলে রহিয়াছে, সুধু যাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, যাহারা সুধু মার খাইতে জানে, মারিতে জানে না; যাহারা পলাইতে যাইয়াও দশবার আছাড় খাইয়া পড়ে। ধনদৌলত, বিত্তসম্পত্তির মমতা ত্যাগ করিয়া, মা সন্তানকে বুকে আকড়িয়া ধরিয়া, ভ্রাতা ভগিনীর হাত ধরিয়া, বৃদ্ধ চলচ্ছক্তিরহিত স্বামী স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া, চীৎকার করিতে করিতে, বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ভীতচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, যে যে দিকে পথ পাইল, সে সেই দিকে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু যাইবে কোথায়! যমের দোসর অর্থলোলুপ রক্তপিপাসু যবন সৈন্য দ্বারা তাহারা বেড়া আগুনের মত পরিবেষ্টিত হইয়াছে। দক্ষিণে যবন, বামে যবন; সম্মুখে যবন, পশ্চাতে যবন! দেবলের ছোট বড় রাজপথ অলি গলি নালা নর্দ্দমা দিয়া কল কল নাদে রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; সেই স্রোতে কতশত আত্মীয় অনাত্মীয়ের, পরিচিত অপরিচিতের, বালক বৃদ্ধ যুবতীর, হস্ত-পদ-মুণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছে। এর উপর আবার অগ্নির ভীষণ খেলা; চটাপট চটাপট শব্দে দালান-কোঠা ফাটিয়া পড়িতেছে! সজোরে প্রস্তর ইষ্টক বিম্ বরগা নিক্ষেপ করিয়া,

লেলিহান্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া, অগ্নিদেব আকাশ মণ্ডল ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ঘোর গর্জ্জন করিতেছেন! চতুর্দ্দিকে যবনের মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দ। কত লোকের হস্ত পদ মুণ্ডচ্যুত হইয়া রক্ত স্রোতে ভাসিয়া গেল; কত লোক অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল! বাকী যাহারা, তাহারা প্রস্তর ইষ্টক চাপা পড়িয়া দুঃখের জীবন অবসান করিল! দ্বিপ্রহরের মধ্যেই দেবল ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত হইল।

ভৈরবকে আঘাত করিয়াই রহিমখাঁ আসিয়া কণাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। কণাদ তখন অবসন্নভাবে মাটিতে বসিয়া কত কি আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল; একবার মনে হইল, সে আজ যে কাজ করিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই—জলন্ত আগুনে জীবন্ত দাহনেও তাহার এ পাপের উপযুক্ত দণ্ডবিধান হয় না; আবার পরক্ষণেই তাহার মনে হইল —পাপ-পুণ্য কথার কথা মাত্র; কর্ম্মাক্ষম কাপুরুষের কপোলকল্পিত বিভীষিকা বই আর কিছুই নহে। আজ সে যাহা করিল, তাহার ফলে শুধু সে নহে, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাহার বংশধরগণ, রাজমুকুট ধারণ ও রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকিবে। তাহার চক্ষু ঝল্‌সাইয়া ঈদৃশ ভাবীবংশধরগণের একটা উজ্জল ছবি জাগিয়া উঠিল। তাহার মনের ভার অনেকটা কমিয়া গেল; মুখ প্রসন্ন হইল।

খাঁ সাহেব আসিয়া বলিলেন "বন্ধুবর, কাজ হাঁসিল্ করিয়াছি; একটা কাণ গিয়াছে! তা' যা'ক্। কা'লই তোমায় সিন্ধুর রাজসিংহাসনে বসিয়ে চক্ষু সার্থক ক'র্‌বো—বন্ধুত্বের পুরস্কার দেবো।"

এমন সময় তীরে উঠিয়া মুসলমান সৈন্যগণ প্রথম জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কণাদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সজোরে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "বন্ধু, কাল আর কেমন ক'রে আমায় সিন্ধুর সিংহাসনে বসা'বে? এখনো যে আলোর জয় হ'তে ঢের দেরী!"

তাহার পিঠ্ চাপড়াইয়া রহিম্ বলিলেন "হোক্ না। কালই তোমাকে

সিন্ধুর রাজা ব'লে ঘোষণা ক'রে দেওয়া যা'বে। এখন চল, তোমার ঘরে যেয়ে খানিকটা বিশ্রাম ক'রে আসি। এখানে এখন শুধু মারামারি কাটাকাটি চ'ল্‌বে।" উভয়ে যাইয়া ধীরে ধীরে কণাদের গৃহে প্রবেশ করিলেন। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে, রহিম উঠিলেন, বলিলেন "আমায় একবার যেতে হ'চ্ছে। তোমার কথাটা সেনাপতি সাহেবকে জানিয়ে রাখ্‌তে হয়।"

তারপর, রহিম্ যাইয়া কাশেমের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

আহারান্তে কাশেম সমভিব্যাহারে রহিম্ আসিয়া কণাদের বৈঠক-খানা-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রহিম্ পরিচয় করিয়া দিলেন "এই আমাদের সেই ক্ষত্রিয় বন্ধু, যাহার বন্ধুত্ব ও সহায়তায় আজ আমরা এত সহজে দেবল অধিকার করেছি।"

কাশেম অভিবাদন করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন "আপনার কাজের যথেষ্ট পুরস্কার দিতে আমি কখনো বিস্মৃত হ'বো না; খোদার নিকট প্রার্থনা করুন, এমনি নির্ব্বিবাদে আমরা আলোর জয় ক'রে উঠতে পারি।"

বিস্মিত কণাদ্ ভাবিতে লাগিল "কৈ, খাঁ সাহেব না ব'লেছিলেন, আজই আমায় সিন্ধুর রাজা ব'লে ঘোষণা ক'রে দিবেন।" সে ঘন-ঘন রহিমের মুখের দিকে সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

বুঝিতে পারিয়া রহিম বলিলেন "আজই তোমাকে আমরা সিন্ধুর রাজা ব'লে রটিয়ে দিতেম, কিন্তু বন্দরাধ্যক্ষরূপেই তোমায় দিয়ে এখনো কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া আবশ্যক।"

তাহার কথায় সায় দিয়া কাশেম্ বলিতে লাগিলেন "হাঁ, হাঁ, নিতান্ত আবশ্যক। আপনার সহায়তা না পেলে আমাদের অবস্থা কি হ'য়ে দাঁড়াতো, তা' ভেবেই উঠ্‌তে পারিনে। শুনুন্ আপনি—সন্ধ্যার পরেই আমরা হায়দরাবাদ রওনা হ'বো। হয়ত, এখানকার খবর পেয়ে দাহির হায়দরাবাদ রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেছেন। তাই আপনার

সাহায্য আবশ্যক হয়েছে। আপনি যে আমাদের সঙ্গে বন্ধুতা করেছেন, এখনো কেউ তা জান্তে পারে নি। আর মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে দ্রুতগামী ঘোড়া চালিয়ে আপনি সেখানে চ'লে যান্। যা'তে সৈন্যদের মনে আমাদের কথায় খুব একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়, তার বিশেষ চেষ্টা ক'র্‌বেন; আর ওদের অন্ধি-সন্ধি সব জেনে রাখ্‌বেন, যেন যাওয়া মাত্রই আমি সব জান্তে পারি।"

রহিম খাঁ কণাদের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন "তুমি ঠিক জেনো, বন্ধু, তোমার এ উপকার আমরা জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো না। যাও, কণাদ্ যাও, যেমন ক'রে দেবল অধিকার হয়েছে, তেমনি ক'রেই যেন হায়দরাবাদ, আলোর, সব অধিকার হয়।" রহিম ও কাশেম উঠিয়া দাঁড়াইয়া কণাদকে আলিঙ্গন করিলেন।

মুগ্ধ বন্দরাধ্যক্ষ বলিলেন "যখন একবার আপনাদিগকে বন্ধুত্ব দান করেছি, তখন, বাঁচা কি মরা, আপনাদের কাজেই দেহ পাত ক'র্‌বো। আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রে যাচ্ছি—আপনাদের কর্ত্তব্য—"

বাধা দিয়া রহিম কহিলেন "কখনো আমরা বিস্মৃত হ'বো না। যাও দোস্ত, মনে কোনো সন্দেহ রেখো না।" তখনি দ্রুতগামী অশ্ব চালাইয়া কণাদ্ হায়দরাবাদ রওনা হইয়া গেল।

উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদিগকে সমবেত করিতে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তাদি করিতে করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন আপনার সমগ্র সৈন্যের এক তৃতীয়াংশকে একজন সহকারীর নেতৃত্বে দেবলে রাখিয়া, কাশেম, রহিম খাঁ ও বাকী সৈন্য লইয়া হায়দরাবাদ যাত্রা করিলেন। অতি সন্তর্পণে, প্রায় নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে, সেই দুর্গম পার্ব্বত্যপথ তাহারা অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কখনো তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ, পরক্ষণেই আবার সহস্র সহস্র হস্ত নিম্নে অবস্থিত সমতলে অবতরণ, আবার আরোহণ আবার অবতরণ করিয়া, কখনো

অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন গিরি গুহায় পথভ্রষ্ট হইয়া, কখনো যে স্থান একবার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেইখানে আসিয়া, তাহারা মধ্য রাত্রের পরে হায়দরাবাদের প্রান্তসীমায় উপনীত হইলেন। এইখানে পঁহুছিয়াই যবন সৈন্যগণ, নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, সমবেত ভীম কণ্ঠে আল্লা-আল্লা-হু! করিয়া উঠিল; নিদ্রিত পক্ষীগুলি কলরব করিতে করিতে আপন-আপন নীড় পরিত্যাগ করিয়া ইতঃস্তত উড়িয়া পলাইতে লাগিল। শিবা ও সারমেয়দলও সেই সঙ্গে যোগ দান করিল।

মুসল্‌মান কর্ত্তৃক দেবল-অধিকারের সংবাদ ও তাহার শোচনীয় পরিণামের কথা শুনিয়া দিবাভাগেই হায়দরাবাদবাসীগণ বৃদ্ধা পিতা মাতা, স্ত্রীপুত্র কন্যা প্রভৃতি লইয়া পাহাড়-পর্ব্বতে, ঝোড়-জঙ্গলে, যে যেখানে পারিয়াছে, যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। মুসলমানের এই আগমন-ধ্বনি যাইয়া যাহাদের কাণে পঁহুছিল, তাহারা প্রমাদ গণিল—তাহাদের হস্তপদ আড়ষ্ট হইয়া আসিল। এই নিভৃত প্রদেশেও তাহারা আপনাদিগকে মৃত্যুবেষ্টিত মনে করিয়া কাঁপিতে লাগিল! তাহাতে আবার অন্ধকার—আলো প্রজ্জালিত করিতে সাহস হয় না, পাছে মুসল্‌মান্ দেখিতে পায়।—হাত পা ভাঙ্গিয়া তাহারা সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের ক্রন্দন ও চীৎকারে বন্য পশুপক্ষীও আকুল হইয়া উঠিল।

হায়দরাবাদ রক্ষার্থ রহিয়াছিল মাত্র কয়েক শত সিপাহী ও তাহাদের অধিনায়ক। যখন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভীত কাতর বাক্‌শক্তিহীন দেবল-বন্দরাধ্যক্ষ কণাদ আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন তাহাকে মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিতে না দিয়া উদ্বিগ্ন অধিনায়ক ও সিপাহীরা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কণাদের মুখে যাহা শুনিল, তাহাতে তাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল! তাহারা শুনিল, মুসল্‌মান্ সেনাপতি; কেবল যে অসাধারণ বীর, তাহা নহে; তাল-বেতাল, জিন্-পৈরি,

দৈত্য-দানবও তাহার সহায়—পলাইয়াও তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর। দেবলটাকে তাহারা যে ভাবে লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, তাহা চক্ষুতে দেখিলেও বিশ্বাস করা যায় না। মুসল্‌মান্ সেনাপতির এই সকল অশরীরী অনুচরেরা অট্টহাস্যে আগুনের শিখায় শিখায় লাফাইয়া বেড়াইয়াছে; প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড, গৃহের ছাদ ইত্যাদি দুই হাতে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়াছে! শুনিতে শুনিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহী-গণের মুখ বিবর্ণ, হস্তপদ শীর্ণ হইয়াছে, বুকের রক্ত জমিয়া গিয়াছে! তাহাদের সাহস বীর্য্যবল ভরসা, বাষ্পের মত, কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। অধিনায়কের আশ্বাস-উত্তেজনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গেল। সাহস করিয়া কে এমন নিশ্চিত মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে যাইবে? অধিনায়কের বারণ তাহারা মানিল না; আপন-আপন প্রাণ লইয়া তাহারা সরিয়া পড়িল। তখন নিরুপায় অধিনায়ক কণাদ্‌কে বলিলেন "তবে আর এখানে থাকায় প্রয়োজন কি? চলুন, রাজধানী যাই। রাজার পরামর্শ মত যা' হয় করা যা'বে।" কণাদ্ উত্তর করিলেন "আপনি যা'ন; লুকিয়ে থেকে আমি মুসলমানের কার্য্যকলাপ দেখে যা'বো।" অধিনায়ক চলিয়া গেল। এইরূপে বিশ্বাসঘাতক বন্দরাধ্যক্ষ স্বদেশ-দ্রোহী কণাদের কূট কৌশলে বিনা রক্তপাতেই হায়দরাবাদও মুসল্‌মানের হস্তগত হইল।

—০—
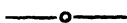
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

ভৈরবের মৃত্যু, মুসল্‌মানের দেবল-অধিকার, দেবলের শোচনীয় লোম-হর্ষণ পরিণাম, মুসল্‌মান কর্ত্তৃক বিনাযুদ্ধে হায়দরাবাদ অধিকার,—ক্রমে ক্রমে সকল সংবাদই আলোরে পঁহুছিয়াছে। আলোরবাসী ঠিক

বুঝিয়াছে, এ যাত্রা তাহাদের রক্ষা নাই ; তাহাদের যাহা কিছু প্রিয়,—দেবধর্ম্ম, পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রকন্যা, গৃহ গৃহস্থালী—কিছুই যবনের হাতে ত্রাণ পাইবে না। তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিল ; অলিতে গলিতে মাঠে ঘাটে, আনাচে-কাণাচে, স্ত্রীপুরুষবালক-বৃদ্ধে মিলিয়া কেবল পরস্পর পরস্পরকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাণী কমলাবতী ও রাজকন্যা অমলা সমস্ত আলোর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলোরবাসীদিগকে আশ্বাস ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন ; যত অক্ষম বালকবৃদ্ধস্ত্রীলোকদিগকে আনিয়া দুর্গে আশ্রয় দিলেন। রাণী কহিলেন "তোমরা কোনো ভয় ক'রো না। যবন আলোরের দিকে আসতে আরম্ভ ক'রলেই, আমি দুর্গে কবাট দেবো। যতদিন আহার্য্য থাকবে, ততদিন আমাদের কোনো আশঙ্কা নেই। দু'মাস ছ'মাস দেখে বাধা হয়ে নিশ্চয়ই যবনকে ফিরতে হবে। আর দুর্গের মধ্যে নিরাপদ থেকে আমরা যুদ্ধ ক'রে তাহাদিগকেই বরং—আর কিছু না পারি—একটু শিখিয়েও ত' দিতে পারবো।" সকলে আসিয়া দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

হায়দরাবাদের অধিনায়ক আসিয়া কণাদের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা রাজসভায় নিবেদন করিয়াছে। রাজা, মন্ত্রী, কহ্লন্, রাণী, সকলেই ভাবিয়াছেন, শোকে দুঃখে কণাদ উন্মাদ হইয়াছে। কিন্তু সকলেই অধিনায়ককে নিষেধ করিয়া দিলেন, "ওসব ভূতপ্রেতের কথা যেন আলোরবাসীদিগের কানে না যায়।" কণাদের স্ত্রী, কৃষ্ণা, তখন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না ; পরে শুনিয়া, তিনি বলিয়া উঠিলেন "মরেন নি ? ভৈরব গেল, স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা, সব গেল, ধর্ম্ম, মান, সম্ভ্রম গেল, দেবল শ্মশান হ'লো, তিনি এখনো বেঁচে!"

দ্বিপ্রহরে রাজা, মন্ত্রী, কহ্লন্ মন্ত্রণাকক্ষে বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। কহ্লন্ বলিলেন "দাহির, আলোর রক্ষার জন্য উঠে' পড়ে' লাগতে হয়।

দু'টো জায়গা যবন দখল করেছে ব'লে, আমাদের নির্ভরসা হ'বার কোনো কারণ নেই।"

মন্ত্রী কহিলেন,"আমি আগেই মানা করেছিলেম্; তখন আমার কথা কেউ শোনেন্‌নি। জয়-পরাজয় জেনেই'ত কাজে হাত দেওয়া গেছে। এখন প্রাণে পূরো ভরসা রেখেই চ'ল্‌তে হ'বে। মহারাজ, ভৈরব গেছে, কণাদ পাগল হয়েছে, ব'লে কি সিন্ধু বীরশূন্য হয়েছে?"

এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে একজন সিপাহী আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, খবর কি?"

পাইক উত্তর করিল "মুসলমান্ এখনো হায়দরাবাদেই রয়েছে। যত দূর জানা গেছে, তা'তে এই বুঝেছি, সৈন্যগণ একটি দিন বিশ্রাম চেয়েছে। তা'রা হায়দরাবাদ লুট্‌তে আরম্ভ করেছে; ঘর, বাড়ী জালিয়ে দিচ্ছে, ধন-দৌলত, টাকাক'ড়, যেখানে যা পাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে: ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি ভেঙ্গে চুরমার ক'চ্ছে!—তবে লোকজন কাউকেও পায়নি; সব আগেই পালিয়েছিল।"

তখন দাহির উঠিয়া মন্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন "যাও তুমি, দীর্ঘল, অবিলম্বে সেবনে যাত্রা ক'রো। প্রাণত' দিতে হ'বেই; কিন্তু খুব উচ্চ মূল্যে যেন দেওয়া হয়।" রাজা মন্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন।

কহ্লন্‌কে প্রণাম করিয়া নিরুদ্বিগ্ন মন্ত্রী কহিলেন "তোমাদের আশীর্ব্বাদে বিশ্বাস নেই, ঠাকুর! কর, তবু আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দাও, যবনের রক্তে হাত রাঙ্গিয়ে যেন মর্‌তে পারি।"

কহ্লন্ তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন "যাও, ভবানী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।"

মন্ত্রী বিদায় হইল; যত দূর তাহাকে দেখা গেল, রাজা নির্ণিমেষদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন;—তাঁহার বক্ষ স্ফীত করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস

উঠিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল; তাঁহার চক্ষু ছল্‌-ছল্‌ করিতে লাগিল, "বোধ হয় দীর্ঘল, তোমায় আমায় এ জীবনের মত এই শেষ দেখা!"

তারপর ঠাকুরের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—

"বাবা, আমি দোষী হ'তে পারি; অসংখ্য পাপে আমি পাপী হ'তে পারি। কিন্তু সিন্ধুবাসীরা এমন কি অপরাধ করেছিল, যার জন্য আজ তাদের মানসম্ভ্রম, ধনপ্রাণ এমন ভাবে লাঞ্ছিত হ'চ্চে? এতদিন ভবানীর কি সেবা কর্‌'লেম্‌!"

ঠাকুরের নেত্রপল্লব ভিজিয়া উঠিল; দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন "তোমার দোষ নেই, ভবানীর দোষ নেই; দোষ আমার কপালের! তুমি যে এখনি এমন নিরুৎসাহ হ'বে, তা' আমি আগে বুঝ্‌তে পারিনি! আমার বিশ্বাস ছিল,শরীরে প্রৌঢ়ত্ব এসে থাক্‌লেও, মন তোমার, সে যৌবনের মনই রয়েছে!" তার পর কণ্ঠস্বর উঠাইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "আমি আগেও বলেছি, এখনো ব'ল্‌চি, পরিণামে তোমারই জয় হ'বে। হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে আপন কর্ত্তব্য ভুল্‌তে আরম্ভ করেছে; ব্রাহ্মণ এখন ধীরে ধীরে শূদ্রাচারী হ'য়ে উঠ্‌চে; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র একাকার হ'তে বসেছে; ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ক্রমে ক্রমে, সুধু সিন্ধুবাসীর নয়, সমগ্র হিন্দু জাতির, উপাস্য দেবতা হ'য়ে উঠ্‌চে! যে সমাজে সকলে 'আপ্‌সে আপ্‌'; যে সমাজে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হয়েছে; যে সমাজে স্বার্থপরতা ঢুকেছে, তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দু'দিন আগে হো'ক্‌, পরে হোক্‌, হিন্দুস্থান যবনের অধিকারে যা'বেই যাবে। তা'দের এখন উঠ্‌তির সময়; ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য তা'রা অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে; এক জনের স্থানে লক্ষ জন দাঁড়াচ্ছে; সকলে একজনের কর্তৃত্ব মেনে চ'ল্‌চে! হিন্দুস্থানের সাধ্য নেই, এ জাতির আক্রমণ রোধ কর্‌তে পারে। তুমি না, ভারতের রাজন্যবর্গের কাছে সাহায্য চেয়েছিলে? কেউ কি এসেছে, দাহির?—

না, একজনও আসেনি; একজনও আস্‌বেনা! 'যার দুঃখ-বিপদ্ তারই,—আমার কি মাথাব্যথা পড়েচে?' এই এখন ভারতবাসী রাজা-প্রজার মূল মন্ত্র! তাই ব'ল্‌চি, ভারতের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তোমার এই কাজে, ভবানীর অনুগ্রহে, আর কিছু না হো'ক, অন্ততঃ চার পাঁচশো বছরের মতন যবনকে পেছিয়ে যেতে হ'বে। এর মধ্যে ভারতবাসী আপনাদের অবস্থা বু'ঝে, আপনাদের শক্তি ওজন ক'রে চল্‌তে শেখে, ভালই; নতুবা তাদের অদৃষ্টে যবনের যে দাসত্ব লেখা রয়েছে, তা কেউ খণ্ডন ক'র্‌তে পার্‌বে না—স্বয়ং ভগবান্‌ও ন'ন।"

অনুতপ্ত ভাবে দাহির উত্তর করিলেন "বাবা, আমায় ক্ষমা কর। আমার এত সাধের প্রজাগুলিকে এমন ভাবে লাঞ্ছিত হ'তে দেখে,আমার মাথার ঠিক নেই।"

এমন সময়ে রাণী কমলাবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন; তাঁহার চক্ষুতে শুধু দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার ভাব প্রকটিত। নিরুদ্বিগ্ন ভাবে তিনি কহিলেন "আপনি আদেশ করুন, মহারাজ, আমি আলোরের সমস্ত দরজা রুদ্ধ করি। সকল বালক বালিকা স্ত্রীলোকদের এনে দুর্গে স্থান দিয়েছি।"

উদাস দৃষ্টিতে রাণীর দিকে চাহিয়া রাজা উত্তর করিলেন "না, রাণি, আমি বেঁচে থাক্‌তে, সে হ'তে পার্‌বে না। যবন আলোরে আস্‌বে,—আসুক। আগে আমি যুদ্ধ ক'রে মরি, তারপর তুমি যা ইচ্ছা ক'রো। আমি বেঁচে থাক্‌তে যবন আমার আলোরের পবিত্র ধূলি স্পর্শও কর্‌'তে পার্‌বেনা।" তাঁহার স্বর দৃঢ় ও অকম্পিত।

এমন সময় অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ক্ষিপ্রপদে ভীমা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন ও রাজা, রাণী, এবং কহ্লনের উপর চক্ষু ঘুরাইয়া কহিলেন "ছি! ছি! ছি! তোমরা এখনো ব'সে আছ'! যবন, এসে যুদ্ধের জন্য ডাক্‌চে, সিন্ধুতে পুরুষ নেই ব'লে কত হাস্‌চে! আর

তোমাদের লজ্জা নেই! ওঠ রাণি, তুমি না যবনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে, ব'লেছিলে? এই বুঝি তোমার যুদ্ধ! তুমি না সিন্ধুদেশের রাণী? তোমার কত প্রজার স্ত্রী স্বামী হারিয়ে আজ কেঁদে কেঁদে বেড়া'চ্ছে; আর স্বামী নিয়ে ব'সে তুমি গল্প ক'চ্ছো! ছি! ছি! লজ্জার কথা! উঠে এসো, যুদ্ধ ক'রবে চল।"

ভীমার হাত ধরিয়া কাতর ভাবে রাণী উত্তর করিলেন, "না ভীমা, স্বামী নিয়ে আমি গল্প কচ্ছিনে! দাঁড়াও, আমি যুদ্ধের পরামর্শ কর্‌তেই এসেছি।"

বাধা দিয়া ভীমা কহিলেন "কেবল পরামর্শ ক'র্‌লে যুদ্ধ হয় না। পরামর্শ ক'র্‌বে কার সঙ্গে? যিনি যুদ্ধ ক'র্‌তে জান্‌তেন, যুদ্ধের মন্ত্রণা দিতে জান্‌তেন, যাঁ'র সাহস ছিল, তিনি ত' চ'লে গেছেন। যা'বেনা তুমি?—আমি চল্লেম্।"

রাণী তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইলেন। বসিতে বসিতে শূন্য নয়নে চাহিয়া ভীমা গাহিয়া উঠিলেন,

কেটেছি বাঁধন কঠিন হাতে
খুলেছি তরুণী আঁধার রাতে,
আমি ত গেলাম চ'লে!

আমি ত চলিনু সাগর-পার
উতরি' উতাল তরঙ্গ তা'র,
তুমি যে পড়িয়া র'লে!

প্রাণের বেদনা, আকুল তৃষা,
বাসনা-ভঙ্গে নব নব আশা,
সকলি সমীরে ক'বো!

সাগর-সলিলে লহরী লীলা
চন্দ্রমা-কিরণে নর্ত্তন-শীলা !
আমি ত মজিয়ে র'বো !

সংসার-যাতনা—বিষম জ্বালা ;—
সহিবে কেনলো হ'য়ে উতলা !
এসোনা চলিয়ে সঙ্গে,

ব'সিয়ে বিরলে সাগর-কূলে
রহিব যাতনা সকল ভুলে'
খেলিব দুজনে রঙ্গে

ভীমা যখন গাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, অমলা তখন আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন। গীত শেষ হইলে ভীমা আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাসিয়া অমলা বলিলেন "একা যেতে পার্‌লিনে ভীমা, আমিও তোর সঙ্গে যাবো। নিবি নে!"

বিদ্যুৎ-চমকের মত তাঁহার দিকে ফিরিয়া, বিধবা উত্তর করিলেন "আমার সঙ্গে যাওয়া তোর কাজ নয় অমল! তোর কচি বয়েস, প্রাণে তোর নিত্য-নূতন আশা, তুই যেতে পার্‌বিনে। আমি একাই যা'বো। আমার এখানকার সব সাধ ফুরিয়েছে; আমার জন্য নূতন সংসার সৃষ্টি হয়েছে; ঐ দেখ্‌চিস্‌না, স্বামী এসে আমায় ডাক্‌চেন!" অঙ্গুলি-সংকেতে ভীমা দরোজার মধ্য দিয়া নীল আকাশ দেখাইয়া দিলেন।

অশ্রুসিক্ত নয়নে চাহিয়া অমলা কহিলেন "আমারো সব সাধই পূর্ণ হয়েছে! এত সাধের সিন্ধু আমার, যবনের পায় লাঞ্ছিত; এত গৌরবের বধূ আমার, যবনের হাতে কলঙ্কিত; এত আদরের ভবানী আমার, আমার প্রতি বিমুখ! জীবনে আর সাধ নেই ভীমা, আমি মরবো!"

মাথা নাড়িয়া ভীমা বলিলেন "সুধু ম'র্‌লে আমার সঙ্গে যাওয়া হ'লো

না। ঐ শোন্, হেসে হেসে আমার স্বামী বল্‌চেন 'মরতে সকলেই পারে; শেয়াল কুকুরও ত মরে! কাজ ক'রে মর।' আমি যবন মেরে ম'র্‌বো; তুই তা পার্‌বি?" পলকহীন দৃষ্টিতে তিনি অমলার মুখের দিকে চাহিলেন।

দৃঢ়কণ্ঠে সুস্পষ্টভাবে রাজকুমারী উত্তর করিলেন "আমিও যবন সেনাপতির মুণ্ড পাত না করে মর্‌চিনে! যে সিন্ধুর বুকে পরাজয়ের ছুরি বসিয়েছে, সে বেঁচে থাক্‌তে, ম'রেও আমার শান্তি হ'বে না।" তারপরে ভীমার হাত ধরিয়া কহিলেন "আমার সঙ্গে চল, দুর্গ রক্ষার কেমন বন্দোবস্ত হ'চ্চে, দেখো এসে। এবার মুসল্‌মান্ দেখে যাবে, সিন্ধুর স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ।" উভয়ে চলিয়া গেলেন।

তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজা কহিলেন "ভীমা প্রায় পাগল হ'য়ে উঠেছে!"

তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে কহ্লন্ বলিলেন "পাগল হবার ত' কথাই; ওযে ভৈরবকে বড্ড ভাল বাস্‌তো! এখন একা ভীমা যা ক'র্‌বে, দশজন পুরুষও তা ক'র্‌তে পার্‌বেনা।" তার পর গাত্রোত্থান করিতে করিতে ঠাকুর কহিলেন "চল, একবার ভবানীর মন্দিরে চল; মনের আশঙ্কা-উদ্বেগ কিছুই থাক্‌বে না।" সকলে প্রস্থান করিলেন।
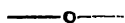
চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীমার প্রতিজ্ঞাপূরণ।

হায়দরাবাদ অধিকারের পর মুসল্‌মান্‌গণ পূর্ণ একদিন বিশ্রাম করিয়া পরদিবস প্রত্যূষে, সেবন অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদের লোমহর্ষণ কার্য্যকলাপের কথা, সিন্ধুর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পাহাড় পর্ব্বতে, শতমুখে প্রচারিত হইয়াছে। তাহাদের যে পথে আলোড় যাইবার কথা, সেই পথের উভয় পার্শ্বে, দশ-বারো ক্রোশের মধ্যেও, কোনো জন-প্রাণীর

সাড়া-শব্দ নাই ; গ্রাম-জনপদ, সহরবন্দর, ছাড়িয়া সকলে যাইয়া পাহাড়-পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের সেই সভয়-আশঙ্কা-ক্লিষ্ট অন্নবস্ত্র-শূন্য, গৃহদ্বারহীন জীবনের দুঃখদুর্দ্দশা বর্ণনীয় নহে। সুরম্য হর্ম্ম্যে, দুগ্ধ-ফেণনিভশয্যায় যাহাদের নিদ্রা আসে নাই, আজ তাহারা উন্মুক্ত বারি-বজ্র-সমন্বিত আকাশের তলে, শ্বাপদ-সঙ্কুল বন্ধুর পর্ব্বত-পৃষ্ঠে কোনো প্রকারে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই, চৌদ্দপুরুষ কৃতার্থ হইল, মনে করিতেছে! দুই দণ্ড যে সন্তান অনাহারে থাকিলে, জননীর স্নেহ-কোমল প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিত, স্তন হইতে শতমুখে অমৃতধারা ছুটিতে থাকিত, লক্ষমুখে গৃহের কর্ত্তার উপর কটুকাটব্য বর্ষিত হইতে থাকিত, আজ রৌদ্রদগ্ধ বৃন্তচ্যুত ম্লান কুসুমের মত সুন্দর সেই সন্তানগুলি চিরাতৃপ্ত জঠর-জ্বালায় কাঁদিয়া উঠিলে, দুই হস্তে জননী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছেন,—পাছে বা এই ক্রন্দন-ধ্বনি যবনের শাণিত কৃপাণ ডাকিয়া আনে! যে বৃদ্ধ পিতামাতার সুখস্বচ্ছন্দতায় সামান্য একটু বিঘ্ন জন্মিলে পুত্রের বুক ফাটিয়া যাইত, আজ পথে হাটিতে হাটিতে তাঁহাদের পা ফাটিয়া শোণিতস্রাব হইতেছে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় সেই সন্তানের সম্মুখেই তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন!

সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময়ে মুসলমানগণ আসিয়া আলোর হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্বে একটা উপত্যকার মধ্যে শিবির সংস্থাপন করিল। কাশেমের ইচ্ছা, শেষ রাত্রিতে যাইয়া আলোর আক্রমণ করেন; কিন্তু সেই বন্ধুর পর্ব্বতপৃষ্ঠে সমস্ত দিনের পথশ্রান্তির পর, সৈন্যগণ সেনা-পতির প্রস্তাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিল। অগত্যা,কাশেমকে রাত্রি-প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। ভীষণ-ভীষণ মশাল প্রজ্বলিত করিয়া, পাহারার সুবন্দোবস্ত করিয়া, সৈন্যদিগকে সজ্জিত ও প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া, কাশেম একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড অতীত হইয়াছে। সৈন্যরা সব ইচ্ছামত এখানে

সেখানে পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছে; কেহ হাত পা ছড়াইয়া শিস্ দিতেছে কেহ চিৎ হইয়া পড়িয়া আকাশের তারা গুণিতেছে; কেহ ঈষদুচ্চ প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া পা দোলাইতেছে; স্থানে স্থানে পাঁচ, সাত জন মণ্ডলাকারে বসিয়া যুদ্ধের কথা, রসের গল্প, করিতেছে। এমনি একদল, অন্যান্য সকলের অপেক্ষা একটু দূরে, উপত্যকা-মুখের প্রায় কাছে, বসিয়া উচ্চস্বরে কথা কহিতেছে ও থাকিয়া থাকিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিতেছে। হঠাৎ একজন সলম্ফে উঠিয়া অন্যান্যের মুখের সম্মুখে হাত ঘুরাইয়া বলিল "সেনাপতি সায়েব যা'ই বলুন, আর তোরা যে যা'ই বলিস্, এবার বাপু আমি কারো কথা শুন্‌চিনে। বাপ্‌রে! এদেশের মাগীগুলো যেন আল্লা খোদাতাল্লার রাজ্যের হুরি! দু'টো-চা'ট্রে নেবোই নেবো।" অমনি আর একজন উঠিয়া বক্তার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া কহিল "আমিও আর ছাড়্‌চিনে! সুধু মুখ দেখে যাবো বলেই কি এতটা কষ্ট করে এয়েচি! পৈতৃক প্রাণটার পর্য্যন্ত মমতা কচ্ছিনে! না, সেটি হচ্চেনা; রাজাটার বাড়ী লুট্‌ করে, টাকা পয়সা, যা' হয়, ত' নেবোই; ঐ লাল-টুক্-টুকে দু'চা'র শো বিবিদেরও নিতে হ'বে।' তৃতীয় ব্যক্তি উঠিয়া গম্ভীর ভাবে সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া গোঁফে চাড়া দিতে দিতে কহিল "ওসব মাগী ছাগীতে আমার বড় একটা লোভ নেই। সয়তানের পয়দা, কাফেরকে মার্‌তে পার্‌লে আমার যা সুখ হয়, তত আমার কিছুতেই হয়না। যুদ্ধের পর যখন মিন্সেমাগীদের ধ'রে ধ'রে এক সঙ্গে জবাই করি, হাত পা কেটে দিলে, চোখ দুটো উপরে ফেল্‌লে যখন সেই বাঁদা-বাঁদী ছট্‌ফট্‌ করে, আঃ! তোদের আর বল্‌বো কি, তখন আমার প্রাণে যা' সুখ হয়, হাজার দেড় হাজার মাগীতেও তা' হয় না!" আর একজন উঠিয়া তাড়াতাড়ি বক্তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল "আরে, চুপ্ চুপ্! ওই, সেনাপতি সায়েব আস্‌চে!" সকলে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে কাশেমকে অভিবাদন করিল।

তিনি বলিলেন "আজ যখন আলোর আক্রমণ করা হলোই না, তখন তোমরা সকাল-সকাল বিশ্রাম করো গে। কালপ্রত্যুষেই যেন আমরা রওনা হতে পারি। তোমাদের উৎসাহ ও সাহসে আমি চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েছি; কিন্তু সৈন্যগণ, একটি কথা তোমাদিগকে বড় দুঃখের সঙ্গে ব'ল্‌তে হচ্ছে; নিরীহ প্রজার উপর অমন্ অত্যাচার তোমরা কোন্ প্রাণে কর? সর্ব্বদা মনে রেখো, খোদা অন্যায়-অধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করেন না, বরং, কঠিন হাতে দণ্ড দেন।—"

এমন সময় উপত্যকা-মুখের বহির্ভাগ হইতে সুমিষ্টস্বর-লহরী আসিয়া সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া তুলিল। নিস্পন্দ ভাবে কাশেম শুনিতে লাগিলেন, কে গায়িতেছে—

"পাগল করে গেছ তুমি, তাইতে পাগল সেজেছি;
পাষাণ দিয়ে প্রাণ বেঁধে, মূরতি যত্নে রেখেছি!
লোকে বলে মূর্ত্তি ফেলে দে—,
মনের মত মানুষ খুঁজে নে—
পাগল কিনা, তাই আমি, কাণে তুলো দিয়েছি।—"

সংগীতধ্বনি যেন ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। বিস্মিত কাশেম বলিলেন "ও কি! গান গেয়ে যায় কে?" অমনি "কে যায়! কে যায়" চীৎকার করিতে করিতে সৈন্যরা যাইয়া হুটাপুটি করিয়া প্রবেশ-মুখের কাছে উপস্থিত হইল। এমন সময়ে এক পাগলিনী—কপালে সিন্দুর-তিলক ধব্‌-ধব্ জ্বলিতেছে, চোখে খল্ খল্ হাসি খেলিতেছে, হাতে ভীষণ মশাল জ্বল্ জ্বল্ জ্বলিতেছে—

"দুষ্ট লোকে নিতুই এসে
বলে আমায় কত কি হেসে,
পাগল আমি তোমার তরে, তা'দের তাড়া করেছি,—
তোমায় পেয়ে আজ আমি এখানে সরে' এসেছি।"

গাইতে গাইতে ঠিক তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সৈন্যরা সব পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছে ; পাগলিনী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে ? কি চাস্ ?"

পাগলিনী নীরব, কেবল বামে ও দক্ষিণে, দক্ষিণে ও বামে সরিতে লাগিল। তাহারা ধরিতে যায় আর কি! পাগলিনী ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল ; পর্ব্বতে পর্ব্বতে উপত্যকায় উপত্যকায় তাহা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেকে আসিয়া সেখানে সমবেত হইল। সকলকে দূরে সরিয়া যাইতে বলিয়া কাশেম অগ্রসর হইলেন। সসম্ভ্রমে সকলে সরিয়া দাঁড়াইল ; পাগলিনী তাহা লক্ষ্য করিল। সস্নেহ ভাবে কাশেম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ? কি চাও ?"

স্থির চাহিয়া পাগলিনী উত্তর করিল "আমি সেনাপতিকে চাই—তার কাছে এসেছি।"

হাসিয়া কাশেম বলিলেন "পাগল! সেনাপতিতে তোমার প্রয়োজন ?" পাগলিনী বলিল "প্রয়োজন! প্রয়োজনের কথা ব'ল্‌চো!—হাঁ, আছে ; নইলে কেউ কা'রো কাছে যায় না।" তার পরে আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া আব্দারের স্বরে কহিল "দাও না আমায় তাকে দেখিয়ে।"

কাশেম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, তাকে দিয়ে তোমার কি দরকার ?"

কুটীল কটাক্ষ করিয়া পাগলিনী বলিতে লাগিল "সে সিন্ধু অধিকার ক'র্‌তে এসেছে! ব'লো গো তাকে, যে তা'র মত মূর্খ সেনাপতির অদৃষ্টে তা' নেই।"

কাশেম হাসিলেন "কেন ?"

মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে যুবতী কহিলেন "তোমায় সে কথা আমি ব'ল্‌চিনে!"

"আমিই সেনাপতি।" ধীর ভাবে কাশেম এই কথা ক'টি উচ্চারণ করিলেন।

"তুমিই সেনাপতি!" কাশেমেরদিকে চাহিয়া,সৈন্যদিগের দিকে ত্বরিত দৃষ্টিপাত করিয়া,আবার নভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া,পাগলিনী ভাবিলেন "তুমিই সেনাপতি! এত কাছে এসে পড়েছি! এসো ভৈরব আমার, মাথার উপরে এসে দাঁড়াও!"

কাশেম চাহিয়া চাহিয়া যুবতীকে দেখিতে লাগিলেন; ক্রমেই তাঁহার ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, বিশ্বাস হ'লো না পাগলি?"

"না, আমি চল্লেম," দক্ষিণে বামে মস্তক দোলাইতে,দোলাইতে,ভীত চকিত দৃষ্টিতে ভীমা কহিতে লাগিলেন "বাপ্‌রে! রাজা শুন্‌লে, আমায় মেরেই ফেল্‌বে!" পাগলিনী প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। কাশেম অগ্রসর হইয়া বলিলেন "ব'লে যা পাগলি, নইলে যেতে দেবো না।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যুবতী কহিলেন "যেতে দেবে না আমায়!" তার পরে কাশেমের নিকটে আসিয়া ভীত চোখে, কাতরস্বরে বলিলেন "না, না, যেতে দিও। রাজা যে তা না হ'লে আমায় কেটেই ফেল্‌বে।"

"বলে যা, রাজা তোকে কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমি তোকে রক্ষা ক'র্‌বো।"

হা-হা-হা-হি-হি-হি শব্দে ভীমা উচ্চ হাসিয়া উঠিলেন "ইঃ, কি বীর পুরুষ রে! রাজার হাত থেকে ইনি আমায় রক্ষা ক'র্‌বেন! তোমায় কে রক্ষা ক'র্‌বে, তার ঠিক নেই, তুমি আবার বাঁচাবে আমাকে! 'চাচা, আপন বাঁচা' "হা-হা-হা, হি-হি-হি"—এবার পাগলী প্রতিধ্বনির উপর প্রতিধ্বনি তুলিয়া হা সতে হাসিতে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

কাশেম কিছু বিরক্ত, কিছু অসন্তুষ্ট, হইয়াছেন। "আমি বল্‌চি, তোর

কোনো ভয় নেই, পাগলি! জানিস্‌নে তুই, দেবল, হায়দরাবাদ, সোবন—আমিই দখল করেছি?"

মুখ ঘুরাইয়া, চক্ষুর কোণে কটাক্ষ করিয়া, ভীমা কহিলেন "সে আবার যুদ্ধের মধ্যে! এবার আমাদের রাজা যে যোগাড় করেছে—নাঃ আমি চল্লেম্। বাপ্‌রে, রাজা ত' নয় যেন বাঘ!" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কাশেম কতৃত্বের স্বরে বলিলেন "না ব'ল্লে তোকে কিছুতেই যেতে দেবো না। সিন্ধুরাজ কি করেছেন?"

পাগলিনী উচ্চ হাসিয়া উঠিলেন "এইত' তুমি সেনাপতি! 'এই মুখে খাবে তুমি কিষ্কিন্ধ্যানগরী?'—তা' খাও-গে; আমি এখন গাই। আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। মঞ্জুল্ ব'ল্‌তো, গাইলে মন ভাল থাকে।"

তোষামোদের স্বরে কাশেম বলিলেন "আগে বলে' নে না, পাগলি!"

"না, আমি আগে, গাইবো।"

কাশেমের পশ্চাদস্থ জনৈক সৈনিক হঠাৎ ধমকাইয়া উঠিল, "আগে বল, হারামজাদি!"

"দ্যাখ ত'; দ্যাখ ত' মিন্সের রকম খানা!" বলিতে বলিতে বক্তার দিকে চকিত দৃষ্টি করিয়া সশঙ্ক ভাবে ভীমা আসিয়া কাশেমের অতি সন্নিকটে দাঁড়াইলেন।

অসন্তুষ্ট ভাবে সৈনিকের দিকে চাহিয়া সেনাপতি বলিলেন "তুমি বড়ই দুর্ব্বৃত্ত হয়ে উঠেছ, আলি!" তারপর সস্নেহভাবে পাগলীকে বলিলেন "আচ্ছা পাগলি, তুই গান কর্।"

ধেই ধেই করিয়া পাগলিনী নাচিতে আরম্ভ করিলেন, আর গাইয়া উঠিলেন।

"যার জন্যে গো পাগল আমি, আজ পেয়েছি তা'রে;
সে যে আপনি এসে আদর করে ডেকেছে আমারে!

সোহাগ করে কাছে এসে,
ব'লচে কত হেসে হেসে!
(আমরা) এক প্রাণেতে ছুটি প্রাণ, যেন বাঁধা সেতারে!—
(আমি) বাঁচবো ম'র্‌বো এক সঙ্গেগো, আর ছাড়্‌বোনা তারে।"

গাইতে গাইতে পাগলিনী একেবারে কাশেমের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছেন; হঠাৎ বস্ত্রান্তরাল হইতে ছুই হাতে ছুইটি শাণিত ছোরা বাহির করিয়া চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে একটি কাশেমের বুকে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন! এবং ছুই হস্তে ধরিয়া অপরটি সবলে আপন বক্ষে বিদ্ধ করিলেন। পরক্ষণেই ভীমা মাটিতে পড়িয়া গেলেন: প্রবল বেগে শোণিত-স্রাব হইতে লাগিল। "আমার কাজ শেষ হইয়াছে! ঐ দেখ হেসে হেসে ভৈরব আস্‌চে। চল, চল, আমিও আস্‌চি—" মরণের কোলে চীৎকার করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে পাগলিনী শান্ত নীরব হইলেন।

—০—

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ।

যবনের শিবির সন্নিবেশের সংবাদ পাইয়া দাহির সংকল্প করিলেন, তাহাদিগকে আলোরে আসিয়া আক্রমণ করিবার অবসর ও সুযোগ না দিয়া, তিনিই যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন। পূর্ব্ব হইতেই সৈন্য-সামন্ত সব প্রস্তুত ছিল। রাজা, রাণী এবং কহ্লনঠাকুরকে তাঁহার সংকল্পের কথা বলিলেন। রাণী আপত্তি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ছুর্গের ভিতর সুরক্ষিত হ'য়ে যুদ্ধ করাই ভাল।—ছুর্গজয় সম্পূর্ণ অসাধ্য; বাধ্য হ'য়েই যবনকে ফির্‌তে হ'বে।"

অবিচলিত ভাবে রাজা উত্তর করিলেন "না রাণি, যবন যে

দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত এসে জয়োল্লাস ক'র্‌বে, আমি তা' সইতে পার্‌বো না। আমিই যেয়ে তা'দের আক্রমণ ক'র্‌বো। তোমরা দুর্গদ্বার রোধ ক'রে ব'সে থাক; যখন দেখবে যে, আর পার্‌বেনা, তখন ম'রে মান বাঁচা'য়ো।" পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "বাবা, তোমার উপর রাণীকে, আমার অমলাবিমলাকে, দুর্গবাসীদিগকে রেখে আমি চ'ল্লেম্। আশীর্ব্বাদ কর, যেন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে ম'র্‌তে পারি।" ঠাকুর মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; রাণী মাটিতে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। অমলা ও বিমলার মুখ চুম্বন করিয়া, রাণীর দিকে চাহিয়া, "পরজন্মে আবার দেখা হ'বে" বলিতে বলিতে রাজা বাহিরে আসিলেন। কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিতে চাহিতে অশ্রু-সিক্ত নয়নে রাণী দুর্গদ্বার বন্ধ করিলেন।

তখন রাত্রি প্রহরেক উত্তীর্ণ হইয়াছে; যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া সৈন্য-সামন্ত সব অপেক্ষা করিতেছে; অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহী সৈন্যের শ্রেণী, পশ্চাতে পদাতিক। সর্ব্বাগ্রে প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের বল্গা ধরিয়া সহিস দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ছুটিয়া চলিবার জন্য অশ্ববর ছট্‌ফট্ করি-তেছে। দাহির আসিয়া ভবানী ভবানী বলিয়া অশ্বারোহণ করিলেন; সৈন্যরা জয় ধ্বনি করিতে উদ্যত হইলে, বলিলেন "না, নিঃশব্দে চল, যবন যেন টের না পায়।" অতি সন্তর্পণে তাহারা রওনা হইলেন—এমন ভাবে, যেন অশ্বখুরগুলিকে অতি মোটা কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহারা যখন আসিয়া উপত্যকার অপর প্রান্তে উপনীত হইলেন, তাহার অল্প পূর্ব্বে ভীমা কাশেমের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছেন।

মুসলমান্ সৈন্যগণ প্রথমটায় আপনাদের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই; শেষে ভাল করিয়া চক্ষু রগড়াইয়াও যখন দেখিল যে, কাশেম্ অবসন্ন ভাবে মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছেন; পাগলিনী তাহার

সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন তাহাদের অবস্থা-বোধ হইল। দৌড়িয়া যাইয়া তাহারা সেনাপতিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; কয়েকজন তাঁহাকে ধরিয়া বসিল। ধীরে ধীরে কাশেম বলিলেন "তোমরা উতলা হ'য়োনা; আঘাত বোধ হয় গুরুতর হয় নাই। আমাকে শিবিরে নিয়ে চল।" কয়েক জন পাগলিনীকে বল্লমের অগ্রভাগ দিয়া নাড়িয়া দেখিল, সে বাঁচিয়া নাই। তাহারা কাশেমকে শিবিরে লইয়া গেল। সংবাদ পাইয়া হেকিমকে সঙ্গে করিয়া রহিম খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৈন্যদের মধ্যে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল; বিশৃঙ্খল ও বিব্রত ভাবে তাহারা সেনাপতির শিবিরের দিকে চলিল। হেকিম বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মোটা কাপড়ের জন্য আঘাতটা অনেক প্রতিহত হইয়াছিল, তাই রক্ষা। তিনি ক্ষতমুখে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পটি বাঁধিয়া দিলেন।

শয্যায় পড়িয়া নিমীলিত নেত্রে কাশেম ভাবিতে লাগিলেন "কি ভীষণ পাগলী! অমন্ কোমল স্নেহ-পরায়ণা স্ত্রীলোকও কি এমন ভয়ানক হ'তে পারে। আজ যদি পাগলীর হাতে মর্‌তেম্, মর্জ্জিণার সঙ্গে আর দেখা হ'তো না। তাই বুঝি মর্জ্জিণা এতটা বারণ করেছিল!" এমন সময় উপত্যকা-মুখে ঘন ঘন শঙ্খ বাজিয়া উঠিতে লাগিল; ধাবমানোন্মত্ত, তেজস্বী অশ্বের হ্রেষা-ধ্বনি ও হিন্দু সৈন্যের পৌনঃপুনিক জয়ধ্বনিতে এবং অতর্কিত আক্রমণে বিত্রস্ত ও ভগ্নোৎসাহ মুসলমান সৈন্যের চীৎকার-আহ্বানে, উপত্যকা ঠিক নরকের কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। চমকিয়া কাশেম উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার আঘাত-বোধ চলিয়া গিয়াছে। রহিম, হেকিম, সকলে, কাশেমের মুখের দিকে চাহিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে সেনাপতি বলিলেন "খাঁ সায়েব, আর দেখ্‌ছেন কি? বেরিয়ে পড়ুন; সৈন্যরা সব অপ্রস্তুত। এবার বুঝি আর পারা গেল না!" শিবিরের বাহিরেই অশ্ব সজ্জিত ছিল; তাড়াতাড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া, কাশেম ও রহিম্ অশ্বে উঠিয়া ঘন ঘন তুরীধ্বনি করিতে

লাগিলেন। সেনাপতির তূরীধ্বনি শুনিয়া সৈন্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল—দ্বিগুণ তেজে তাহারা হিন্দু-সৈন্যের গতিরোধ করিতে লাগিল।

প্রথম আক্রমণের সময় মুসলমান সৈন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল; সকল ভুলিয়া যাইয়া তাহারা কাশেমের আবাত লইয়াই তোলপাড় করিতেছিল; কাজেই হিন্দুগণ প্রথম আক্রমণে বড় সুবিধা করিয়া ফেলিলেন। তাহাদের বর্ষাবল্লমের খোঁচায়, তরবারি ও খর্পরের আঘাতে, এবং অশ্বপদতলে দলিত হইয়া, শত শত মুসলমান্ প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল।

কিন্তু শাহ কাশেম আসিয়া রণক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন; "প্রাণপণ মুসলমান বীরগণ, প্রাণপণ,—একটি কাফের ও যেন ফিরে যেতে না পারে! তোমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমরা ধর্ম্মের জন্য এসেছ; খোদা তোমাদের সহায়।"—তাহার এই উদ্দীপনা বাই উপত্যকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, অমনি আল্লা-আল্লা-আল্লা রবে, মত্ত মাতঙ্গের মত, তাহারা যাইয়া হিন্দু-সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; যে দিকে দৃষ্টি ফিরানো যায়, সে দিকেই চন্দ্রালোকে দীপ্ত তরবারি সকল মাথার উপর ঝলক দিয়া উঠিতেছে, এবং কাহারো মুণ্ড, কাহারো বাহু, কাহারো হস্তপদ, কাহারো অশ্ব-গ্রীবা লইয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছে। সটাসট্ তীর ছুটিতেছে; সোঁ-সোঁ শব্দে বর্ষাবল্লম ছুটিয়া যাইয়া হস্তপদমুণ্ড বিদ্ধ করিতেছে। প্রহরেকের মধ্যেই, পুঞ্জীকৃত হতাহতের শোণিতে জানু-গভীর রক্তনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুমূর্ষু-মৃতের দেহে প্রতিহত হইয়া, অশ্বগুলিও আর চলিতে পারিতেছেনা। শ্রাবণের দুই প্রবল ধারার মধ্যে যেমন ক্ষণেকের জন্য জলভারাবনত মেঘগুলি বিশ্রাম করিয়া লয়, তেমনি, যেন, উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারেই, শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ই ক্ষণেকের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

আবার প্রচণ্ড বেগে তীরবর্ষা ছুটিতে আরম্ভ হইল। কিছুতে ভ্রূক্ষেপ

না করিয়া, হতাহতদিগকে অশ্বপদদলিত করিয়া, বীর-শ্রেষ্ঠ মহারাজ দাহির আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার উৎসাহ-পূর্ণ রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার সমস্ত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া, হিন্দু বীর-গণের বাহুতে আবার নূতন বল, অস্ত্রে আবার নূতন তীক্ষ্ণতা, কোথা হইতে আসিয়া সঞ্চারিত হইতে লাগিল। ঝাঁকে ঝাঁকে মুসলমান-সৈন্য পড়িতে লাগিল। মুসলমানের তীরন্দাজ দল পড়িতেছে, কাতর হইয়া যবন-সৈন্যের অশ্বগুলি আর স্থির থাকিতে পারিল না; আরোহীর পায়ের খোঁচা, কশাঘাত, সকল উপেক্ষা করিয়া, পদাতিক সৈন্যদিগকে খুরের আঘাতে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া, তাহারা মুখ ফিরাইয়া ধাবমান হইল। কাশেম ও রহিমের যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও আরোহীগণ অশ্বের গতি ফিরাইতে পারিলেন না; তাহারা 'নিরুপায় হইয়া' পড়িলেন। তখন কাশেম ও রহিম পদাতিক সৈন্যদিগকে, দুই পাশে বিভক্ত হইয়া, অশ্বারোহীদিগের পশ্চাতে সরিয়া যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া, শত্রুর সম্মুখীন হইতে আদেশ করিলেন। নির্ভীক ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান বীরগণ সেনাপতির আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল,—অদম্য তেজে আসিয়া তাহারা হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্যের সম্মুখে, বর্ষাবল্লম হাতে করিয়া, দাঁড়াইল। আবার তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

আবার উভয়পক্ষের অনেক হতাহত হইতে লাগিল। দুই হস্ত সমানে চালাইয়া উন্মত্ত দাহির, শত্রু-শোণিতে বর্ষা-তরবারি আমূল রঞ্জিত করিতে করিতে একেবারে যাইয়া কাশেমের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বর্ষা উত্তোলিত করিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে একটা তীর আসিয়া তাঁহার বাম চক্ষু বিদ্ধ করিল। দক্ষিণ হস্তে সবলে তীরটা উত্তোলিত করিয়া, বাম হস্তে আহত চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া, আবার তিনি বর্ষা উঠাইলেন, কিন্তু বাকী চোখে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

কিন্তু হিন্দু-বীরগণ পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহারা মরিয়া হইয়া প্রাণপণে লড়িতে লাগিলেন। বাহিরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যবনের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাহাদের দেহে নূতন বলের সঞ্চার হইয়াছে। আবার ভীষণ মারামারি কাটাকাটি চলিতে লাগিল। এই ভাবে পরদিবস প্রায় দেড়প্রহর বেলা পর্য্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলিল। একটিও হিন্দুবীর যতক্ষণ জীবিত ছিল, ততক্ষণ মুসলমান সেনাপতি মনে করিতে পারেন নাই, তাহার জয়লাভ হইয়াছে।

যুদ্ধ শান্ত হইয়াছে। কাশেম শিবিরে ফিরিয়াছেন। তাঁহার আহত দেহের উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ক্রমাগত রক্ত ও ঘর্ম্মস্রাবে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। হেকিম্ আসিয়া নাড়ী ধরিয়া দেখিলেন, ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। যবন-শিবিরে আমোদ-উল্লাস বন্ধ হইয়া গেল। রহিম খাঁ চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন—সেনাপতি সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এখানেই থাকিতে হইবে।

——o——

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

জোবেদীর প্রস্তাব।

অনেক দিন বাগ্দাদের কোনো সংবাদ লওয়া হয় নাই। আসুন পাঠক, আমরাও ইতিমধ্যে একবার সেখানে বেড়াইয়া আসি।

মর্জ্জিণাকে বন্দিনী করিয়াও সাজ্রাদীর প্রাণে শান্তি আসে নাই।—কাশেম যে জানে না! মর্জ্জিণা সুখে শান্তিতে আছে মনে করিয়া, কাশেম যে নিশ্চিন্ত আছে! কবে কাশেম ফিরিবে? কবে তাঁহার চোখের উপর, তাঁহার "সুধু বাহিরের নয়, অন্তরেরও" মর্জ্জিণাকে মারিয়া তাঁহার জ্বালা দেখিয়া তিনি হাসিতে পারিবেন? এমনতর ভাবনা জোবেদী কত ভাবিতে থাকেন, আর কাশেমের অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠে।

একদিন দ্বিপ্রহরে তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ; জহর তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছে ; নেহার কখনো ফুলের তোড়া আনিয়া নাকের সম্মুখে ধরিতেছে, কখনো মস্তকে ও চক্ষুতে গোলাপজল সিঞ্চন করিতেছে, কখনো সরাবের বোতল হইতে সরাব ঢালিয়া কর্ত্রীর মুখের নিকট ধরিতেছে। একবার, সরাবের গেলাস নিঃশেষ পান করিয়া, গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিয়া তিনি ঘরের মর্ম্মরপ্রস্তরাচ্ছাদিত তলে উপড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তাহার বুক জ্বলিয়া যাইতেছে। খানিক পরে আবার উঠিয়া বসিলেন, "এ ও কি সম্ভব, আমি চেষ্টা ক'র্‌লে, কাশেমের মন ফির্‌বে না ?—ফির্‌বে, নিশ্চয়ই ফির্‌বে।—আর যদি না ফেরে ?—যদি না ফেরে ?"—তাহার নেত্রদ্বয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল. নাসিকা-গহ্বর স্ফীত হইতে লাগিল। মসৃণ কপালের উপর যে কুঞ্চিত কেশরাজি আসিয়া এলাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা পশ্চাতে সরাইয়া দিয়া, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—প্রকাশ্যে বলিলেন "যদি না ফেরে ?—মর্জ্জিণা ম'র্‌বে, কাশেম্ ম'র্‌বে। তা'র পর আমি—যা' কপালে থাকে, তাই হ'বে।" আবার তিনি বসিয়া পড়িলেন ; দক্ষিণ হস্তের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া, দক্ষিণউরুর উপর বাম উরু রাখিয়া, বামহস্ত কোমরের উপর স্থাপন করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "মর্জ্জিণা ম'র্‌বে কেন ?—তার অপরাধ কি ?—মর্জ্জিণা ম'র্‌বে, সে আমার সুখের পথের কণ্টক' তাই ; মর্জ্জিণা ম'র্‌বে, সে আমার কাশেমের প্রণয়িনী, তাই। কাশেম্ ম'র্‌বে কেন ?—তাঁকে যদি ম'র্‌তেই হ'বে, তবে এ সব কেন ?"—তিনি সোজা হইয়া বসিলেন, "দরকার আছে—আমি যার পায় ধ'রে সেধেছি, যে আমায় হাতে ধ'রে উঠায়নি, আমার দুর্ব্বলতার কথা মনে ক'রে যে হাস্‌বে, সে বাঁচ্‌তে পারে না, তার মৃত্যু আগে দরকার।—কেন, আমি মর্‌লেইত সব ফুরিয়ে যায় ? তার পর, কাশেম আমার কথা মনে ক'রে হাসে, হাসুক ; মর্জ্জিণাকে—ওই পেত্নীকে, দাঁড়কাকীকে—ভালবাসে, বাসুক।' তিনি

ভ্রযুগের মধ্যস্থল টিপিয়া ধরিলেন "না, আমি ম'র্‌তে পারিনে—কাশেমকে মর্জ্জিণার রেখে, আমি কিছুতেই ম'র্‌তে পারিনে।" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন "আমার প্রাণে তা' হ'লে শান্তি এলো কৈ? আমায় জ্বালিয়ে কাঁশেম জ্ব'ল্‌লে কৈ?"

—"না কাশেম, তুমি বেঁচে থাক্‌তে আমি ম'র্‌তে পারিনে। মর্জ্জিণাকে মার্‌বো; তুমি জ্ব'ল্‌বে—এম্‌নি ক'রে জ্ব'ল্‌বে। আর আমি হাস্‌বো, প্রাণভ'রে হাস্‌বো।" তখন তৃপ্ত দৃষ্টিতে জহরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "মর্জ্জিণাকে নিয়ে আয়।" জহর প্রস্থান করিল। নেহারকে আদেশ করিলেন "সরাব দাও"; সে সরাব আনিয়া দিল।

বন্দিনী হইয়া অবধি মর্জ্জিণা উন্মাদিনীর মত হইয়াছেন। নিজের বিপদের ভাবনায় যে তিনি এমন হইয়াছেন, তাহা নহে; কাশেমের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কায়ই তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জোবেদীকে বেশ ভালরকমই চিনিয়াছেন; তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কাশেমকে না পাইলে সাজাদী কোনো ভীষণ কার্য্য করিতেই পশ্চাৎপদ হইবেন না। এক দিন, দুই দিন নহে, অনেক দিন তিনি জোবেদীর পায় ধরিয়া কাঁদিয়াছেন; কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। তাহার আহার্য্য যেমন দিয়া যায়, তেমনি পড়িয়া থাকে; শয্যায় তাহার শরীর অতি অল্পই লাগিয়া থাকে। এই কয়দিনেই তিনি এতটা শীর্ণ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাহাকে আর চিনিতে পারা যায় না।

যখন জহর আসিয়া উপস্থিত হইল, মর্জ্জিণা তখন গবাক্ষ-সমীপে বসিয়া গালে হাত দিয়া, সম্মুখস্থ বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট, ঘুঘু-দম্পতির সোহাগ-আদর দেখিতেছিলেন, আর তাহার দুই গণ্ড বহিয়া ঝড়্ ঝড়্ করিয়া অশ্রু পড়িতেছিল। হৃদয়-হীন, প্রেমাস্বাদবঞ্চিত খোজা হইলেও, জহরের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! সে অনেকক্ষণ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া

রহিল। মর্জ্জিণা যখন তাহার দিকে চাহিলেন, তখন অভিবাদন করিয়া সে তাহার আগমনের কারণ জানাইল।

মর্জ্জিণা কতক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন, সহর কি বলিয়াছে, তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; খোজা দ্বিতীয়বার বলিলে, তিনি নির্ব্বাক্‌ভাবে উঠিলেন এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জোবেদীর সান্নিধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়াই মর্জ্জিণার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে তিনি বলিলেন "আবার, সাজাদি, আবার কেন? মার্‌তে হয়, মেরে ফেল—এমন ক'রে আমায় আর জ্বালা'ওনা।" তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল; জানু পাতিয়া উপবেশন-পূর্ব্বক, বাদশাজাদীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া তিনি বলিলেন "তোমার পায় পড়ি, সাজাদি, আমায় এখনি মেরে ফেল, কাশেম আসা পর্য্যন্ত আমায় রেখোনা; তোমার মুখ আর আমি দেখ্‌তে পারিনে।"

গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার দিকে বিজয়-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, জোবেদী উত্তর করিলেন "না মর্জ্জিণা, কাশেম না এলে তুমি ম'র্‌তে পার না। তা'র চোখের উপর তুমি ম'র্‌বে, সে জ্ব'ল্‌বে, আমি হাস্‌বো।" তারপর ঈষৎ দয়ার্দ্র-ভাবে বলিলেন "আমার কথা শুন্‌লে, তোমায় আমি বাঁচা'তে পারি, মর্জ্জিণা। কাশেমকে আর এ জীবনে তুমি দেখা দিতে পার্‌বে না—স্বীকার হও, আমি তোমায় ছেড়ে দি, কিন্তু বাগদাদে আর তুমি থাক্‌তে পার্‌বেনা; কেমন রাজী আছ?"

মুখ ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া, জোবেদীর চক্ষুর উপর পলকহীন দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কাশেম-প্রিয়া উত্তর করিলেন "প্রাণের আমার মমতা নেই, সাজাদি; কাশেমকে যদি দেখ্‌তে না পেলেম, আমার বাঁচা-মরা একই কথা। তবে তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, আমি বাগদাদ্‌ ছেড়ে গেলে, তুমি তাঁর কোনো অনিষ্ট ক'র্‌বেনা, আমি জন্মের মত যেতে রাজী আছি— আর তাঁ'কে দেখ্‌তে আস্‌বো না।"

দৃঢ়কণ্ঠে সাজাদী উত্তর করিলেন "তোমায় ভু'লে যেয়ে কাশেম যদি আমায় হৃদয়ে স্থান দেয়, আমি তার কোনো অনিষ্ট ক'র্‌বোনা।"

মর্জ্জিণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন "কাশেম আমায় কখনো ভু'ল্‌বেনা। তোমায়ও কখনো হৃদয়ে স্থান দেবে না।"

"তবে মর্জ্জিণা তোমার নিস্তার নেই। তোমায় ম'র্‌তেই হ'বে।"

"ম'র্‌তেই আমি চাই—তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা ক'চ্ছিনে। এখনই আমায় মেরে ফেল, সুধু এইটুকু অনুগ্রহ কর।"

বাদশাজাদী পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন "না, মর্জ্জিণা, কতবার আর আমি বলবে? এখন তুমি ম'র্‌তে পার না। বাগদাদ্ ছেড়ে যেতে তুমি রাজী নও?"

"না!"

"দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণে রাজী আছ?"

"তোমার মুখে আগুণ!" মর্জ্জিণা ঝাঁপিয়া দাঁড়াইলেন।

"আর একজনকে ভালবাস,—অন্ততঃ এ কথা মুখে ব'ল্‌তে রাজী আছ?"

জোবেদীর দিকে চাহিয়া যুবতী উত্তর করিলেন "যদি প্রতিজ্ঞা কর, কাশেমের কোনো অনিষ্ট ক'র্‌বে না।"

"না, সে প্রতিজ্ঞা আমি ক'র্‌তে পারিনে।"

মস্তক পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া দৃঢ়ভাবে মর্জ্জিণা কহিলেন "তবে আমি রাজী নই। আর আমায় তুমি বিরক্ত ক'রোনা—আমায় কারাগারে পাঠিয়ে দাও।"

চক্ষু রাঙ্গাইয়া জোবেদী উত্তর করিলেন "বাঁদী তুই—তোর ইচ্ছায় আমি চ'ল্‌বো! আমার যখন ইচ্ছা কারাগারে রাখ্‌বো, যখন ইচ্ছা নিয়ে আস্‌বো। তোর কোনো কথাই আমি শুন্‌তে চাইনে।"

মর্জ্জিণার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি

উত্তর করিলেন "তা তুমি ক'র্‌তে পার। কিন্তু মনে রেখো সাজাদি, তুমিই দিন্‌-দুনিয়ার মালিক নও; তোমার উপরও একজন আছেন—তিনি বিচার ক'র্‌বেন।"

আরক্তিম চক্ষুতে চাহিয়া, মৃত্তিকায় পদাঘাত করিয়া, জোবেদী গর্জ্জিয়া উঠিলেন "বাঁদী তুই, মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্‌!"

বঙ্কিম গ্রীবায়, বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া মর্জ্জিণা বলিয়া উঠিলেন "বাঁদী আমি, স্বীকার কচ্ছি!—বাঁদীর স্বামীর উপর অত লোভ কেন সাজাদি? এখন কেন মনে থাকে না, কালিফের মেয়ে তুমি—সাজাদী তুমি; কত কালিফ্‌ বাদ্‌শা তোমার জন্য লালায়িত!"

তাহার প্রাণের ক্ষতে আঘাত লাগিয়াছে; জোবেদী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া ধাক্কা দিয়া মর্জ্জিণাকে তিনি ফেলিয়া দিলেন; তাহার মাথা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। জোবেদীর চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "নেহার, নেহার, বাঁদীকে কারাগারে রেখে আয়।"

মর্জ্জিণাকে লইয়া নেহার প্রস্থান করিল।

"বাঁদীর স্বামীর উপর অত লোভ কেন?" এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিতে করিতে জোবেদী কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া পড়িলেন। "কথাটা মনে হ'লেও প্রাণ জ্ব'লে যায়! বাঁদীর মুখে অত বড় কথা!" তাহার চক্ষু হইতে টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুই হাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "কাশেম, কাশেম, তোমায় ভালবেসে একটা বাঁদীর কথাও আমায় শুন্‌তে হ'লো? মর্জ্জিণা বাঁদী—বাঁদীরও বাঁদী!—না কাশেম, এ অপমান আমি সইতে পার্‌বো না। সুন্দর তুমি, বীর তুমি, বাগ্দাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ তুমি, সাজাদীর গলার হার তুমি, মাথার মুকুট তুমি, বাঁদীর তুমি হ'তে

পারবে না—বাঁদীর তুমি থাকতে পারবে না।" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "না কাশেম, তুমি বাঁদীর বাঁদী মর্জ্জিণার নও—সাহান্-শা বাগদাদ-পতির মেয়ে জোবেদীর তুমি।" জোবেদী বাহিরে আসিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুলতানা বেগমের প্রাণে অশান্তি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে শশাঙ্কের স্নিগ্ধ রশ্মি, ফুর্‌ফুরে শীতল সমীরণ, আর সমীরণে ভাসিয়া মন-মাতানো পুষ্প-সম্ভার আসিয়া কক্ষটিকে শান্ত-শীতল করিয়া তুলিয়াছে। গবাক্ষ-সমীপে বসিয়া, কুসুম-কোমল পা-দানের উপর পদ রক্ষা করিয়া, পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইয়া সুলতানা বেগম, শূন্যনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাহার কিছুতেই লক্ষ্য নাই। সমীর-তরঙ্গের মধ্যে বসিয়াও, কর্পূর-বিনিন্দী কাচ-মসৃণ কপালটি তাহার স্বেদ-বিন্দুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিয়ৎকাল এইভাবে কাটাইয়া, রুমালে মুখ মুছিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "হায়! দুনিয়ার রীতিই অদ্ভুত! কালিফের প্রধান বেগম আমি, বাগদাদের প্রধান সুন্দরী আমি,—আমার কণামাত্র অভাব পূরণের জন্য স্বয়ং কালিফ্ সর্ব্বদা যোড়হাত—আর আমার প্রাণেও অশান্তি আসে? কোনো কারণই ত খুঁজে পাচ্ছিনে। কালিফ্ আমায় কত ভালবাসেন, আমায় সুখে রাখ্‌বার জন্য তাঁর কত চেষ্টা, আমার ইচ্ছার উপরই তাঁর জীবন-মরণ!—আমার প্রাণে শান্তি নেই কেন? সকলি হারা'তে বসেছি ব'লে আমার ভয় হ'চ্ছে কেন? আমার বুক এমন শূন্য বোধ হচ্ছে কেন! সৌন্দর্য্যে, যৌবনে, ঐশ্বর্য্যে, ক্ষমতায় সকলের মাথার উপর ব'সেও আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌চে কেন?" তিনি অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণা

করিতে লাগিলেন! আবার জানালার নিকট দাঁড়াইয়া মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া সুলতানা বলিয়া উঠিলেন "কৈ, কোনো কারণই ত খুঁজে পাচ্ছিনে! তবে আমার এমন হ'লো কেন? আমি কি চেয়ে ছলেম, যা' পাইনি! কই, মনে ত' পড়ছে না! তবে—তবে।—" উঠিয়া তিনি সেতার লইয়া বসিলেন, আঙ্গুলে মেরজ্বাপ্ পরিলেন; কিন্তু তারে দুই ঘা দিয়া, সেতার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন "কালিক্ এখনো আস্‌চেনা কেন? কোনো নূতন প্রণয়িনী জুটলো কি? কোনো সুন্দরী বেগমের জন্য নূতন মহল তৈয়ার হ'লো কি?" গৃহের মধ্যস্থলে তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল "না, সুলতানা বেঁচে থাক্‌তে সে হ'তে পারবে না। যাঁদের চিরকাল উপপত্নী ব'লে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে এলেম, তাঁদের দলে যেয়ে আমি মিশ্‌তে পারবো না! যদি তাই হয়—" তাহার, জ্বালাময়ী কল্পনায় বাধা দিয়া সহাস্যমুখে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বেগমকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া, কালিক্ বলিলেন "সুলতানা, সুলতানা, আজ দেখ কালিফের— তোমার গোলামের—প্রতিভার মূল্য কত! একটা যুদ্ধে কাফের পরাজিত হয়েছে।—সিন্ধুজয় হ'লো ব'লে! কাশেমের অসাধ্য কাজ নেই! আর দু'দিন পরেই হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার আমার পদানত হ'বে; তোমার হীরের ঘর সহস্র সূর্য্যের ন্যায় জ'লতে থাকবে, আর—"

স্থির উদাস দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সুলতানা বলিয়া উঠিলেন "আমি ভুল বুঝেছিলেম্; ওতে আমার সুখ হ'বে না—

তাড়াতাড়ি কালিফ্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন সুলতানা?"

স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, গদ-গদকণ্ঠে বেগম উত্তর করিলেন "তোমার আবার নূতন বেগম জুটবে; সুলতানার তখন কোনো মূল্যই থাক্‌বে না, কেউ তা'কে আদর ক'রবে না!"

সোহাগে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, মুখের নিকট মুখ তুলিয়া, চোখে চোখ

মিলাইয়া, স্বামী কহিলেন "না, সুলতানা, আমার প্রাণের প্রাণ তুমি, চোখের দৃষ্টি তুমি, হৃদয়ের প্রেম তুমি,—তুমি আমার সর্ব্বস্ব। হাজার বেগম হ'লেও কালিন্দ্‌ চিরদিনই তোমার বান্দা!"

সরিয়া দাঁড়াইয়া, যেন স্বামীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতে দেখিতে, অধরের কোণে ঈষৎ ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বেগম বলিতে লাগিলেন, "এমন ত' তুমি অনেক জনকেই বলেছ! যখন আমি তোমার চোখে পড়িনি, তখনো তোমার প্রাণের প্রাণ, চোখের দৃষ্টি, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ছিল! আমি এলেম—তারা তোমার প্রাণের মরণ, চোখের আঁধার, হৃদয়ের বিষ হ'য়ে সরে প'ড়লো! আবার আমার সময়ও পূর্ণ হ'য়ে এসেছে ব'লে বোধ হচ্ছে। সিন্ধু জয় ক'রে, তোমার প্রাণের নূতন প্রাণ—"

দুই হাতে কালিন্দ্‌ সুলতানার মুখ চাপিয়া ধরিলেন; "না, প্রাণেশ্বরি আমার, আমি শপথ ক'রে ব'লতে পারি, তোমায় আমি যেমন ভালবেসেছি, তেমন ভাল আমি কাউকেও বাসিনি; আর বাসতেও পারবো না। বিশ্বাস কর, আমি তোমার—চিরদিনই তোমার থাকবো। আজ আমার বড় আশা ছিল, তোমায় সুখী ক'রবো,—সিন্ধুর সংবাদে তুমি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে! আমার এমনি কপাল মন্দ, সব উল্টো হ'য়ে গেল!"—তিনি আর বলিতে পারিলেন না; তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া উঠিল। কতক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন। শেষে সুলতানা বলিলেন "দেখ, এতদিন তোমার কাছে সুধু জিনিষ-পত্র আসবাবের জন্য,—খেলেনার জন্যই আব্দার করেছি; তুমিও যথেষ্ট দিয়েছ—না চাইতেও দিয়েছ! সে সবের মধ্যে প্রাণটা আমার আমি হারিয়ে ফেলেছিলেম। কিন্তু, কেন, তা জান? তুমি আদর ক'রে দিতে ব'লে। আজ ক'দিন হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেছে; একটি, একটি ক'রে জিনিষগুলিকে বুকে নিয়ে জড়িয়ে ধ'রে দেখেছি—তুমি কাছে না এলে তা'দের বুকে ক'রে শান্তি হয় না। আমি আর এখন সে সব চাইনে--আসল

জিনিষ চিনেছি! তুমিই আমার শান্তি, তুমিই আমার সুখ। তাই, এখন আর সিন্ধুর ঐশ্বর্য্যলাভের কথা মনে হ'লে আনন্দ হয় না—কিজানি কেমন একটা ভয়ের ছায়া এসে প্রাণটা চেপে ধ'র্‌তে চায়! আচ্ছা দেখ, শুনেছি সেখানকার মেয়ে মানুষগুলো নাকি ভারি সুন্দরী!—"

কথা শেষ হইতে না দিয়া কালিফ্‌ তাঁহার সুন্দর মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন "কিন্তু এর কাছে নয়!"

রমণী আবার বলিলেন "তা'দের দু'একটা এনে বেগম্‌ ক'র্‌বে না তুমি?"

ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া কালিফ্‌ বলিলেন "ঐ একটা কথা তুমি ভুল্‌তে পার্‌লে না! এই তোমার ভালবাসা! আমার শপথে তোমার বিশ্বাস নেই! থাক্‌, আমি চল্লেম্‌—"

তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া সুল্‌তানা বলিলেন "না প্রিয়তম, যেও না তুমি। জানি না কেন, প্রাণটা আমার বড়ই উতলা হ'য়ে উঠেছে! খোদা ব'ল্‌তে পারেন, এ সুখ আমার কপালে আর ক'দিন আছে। তোমার ভালবাসায় মুগ্ধ হ'য়ে যা'দের এতদিন আমি তোমার উপপত্নীর মত মনে করেছি—"

সায় দিয়া কালিফ্‌ বলিয়া উঠিলেন "তারা উপপত্নীই বটে!"

"উপপত্নী"ই বটে! বিস্মিত হইয়া সুল্‌তানা মনে ভাবিলেন "তুমিও তাই মনে কর?"—তার পর কালিফ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তা'দের মত হ'য়ে আমি বাঁচ্‌তে পার্‌বো না—"

তাঁহাকে বুকে টানিয়া আনিয়া কালিফ্‌ বলিলেন "তোমায় কখনো তা'দের মত হ'তে হ'বে না। এসো প্রেয়সি, এ মিছে কোঁদল ত্যাগ ক'রে একবার তোমার প্রমোদ-কাননে বেড়িয়ে আসিগে। দেখ, কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে!" তিনি বেগমের হাত ধরিয়া চলিলেন।

———০———

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুরুশিষ্যে।

যুদ্ধের শোচনীয় পরিণামের কথা দুর্গে পঁহুছিয়াছে। রাণী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন—যখন সংবাদ পঁহুছিল, তিনি পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন; বিমলা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; অমলা কথাটিও না বলিয়া ভবানী মন্দিরে চলিয়া গেলেন; কণাদ-পত্নী কৃষ্ণা বিমলাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "বীর তাঁরা—বীরের মত মরেছেন। এতে কান্না কেন?" দুর্গবাসী বালকবৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগকে তিনি এমনি করিয়াই প্রবোধ দিতে লাগিলেন। রাণী বলিলেন "তাঁদের কর্ত্তব্য ক'রে তাঁরা স্বর্গে গেছেন। আমাদের এ জগতের সুখ-শান্তি ফুরিয়েছে। এখন যাতে তাঁদের যোগ্য হ'য়ে স্বর্গে যেয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলতে পারি, এসো ভগিনীগণ, আমরা তাই করি। আমার খুব বিশ্বাস, মুসলমানের হাত থেকে আমরা দুর্গ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো;—যদি একান্তই না পারি, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মান বাঁচা'তে ত' পার্‌বো।"

শোকের ঝড় কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, দুর্গের একটি নিভৃত কক্ষে রাণী, অমলা, বিমলা ও কৃষ্ণা আসিয়া মিলিত হইলেন। অনেকক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন; শেষে রাণী কমলাবতী বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আর চিন্তায় কোনো ফল নেই। কখন মুসলমান এসে যে দুর্গ আক্রমণ করে, তার ঠিক নেই। যা'তে দুর্গ রক্ষা করা যেতে পারে, এখন তারই চেষ্টা দেখতে হয়। সম্মুখের দ্বার আমি নিজে রক্ষা কর্‌বো; উত্তরে ভবানী শৈল, সহজে যবন সে পথে দুর্গে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌বে না—আর সেখানে ঠাকুর কহ্লন্ আছেন। পূর্ব্বদিক্ কৃষ্ণা, তোমার উপর রইলো, পশ্চিমে অমল, তুই থাকিস্। আর বিমল, তুই সব ঘু'রে ঘু'রে দেখ্‌বি, যখন যেখানে যা' দরকার হয় কর্‌বি।"

কৃষ্ণা কহিলেন "মহারাণি, আমার একটা কথা শুনুন। যে দুর্দ্ধর্ষ যবন, একদিনে হোক, দু'দিনে হোক, আর দু'মাসে হোক, কি ছ' মাসে হোক, দুর্গ তা'রা অধিকার ক'র্‌বেই ক'র্‌বে। বাহিরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বন্ধ—খাদ্য-সংগ্রহের আমাদের কোনো উপায় নেই। যা' মজুত আছে, সে গুলো যে কয়দিন, সে কয়দিনই আমরা যবনের আক্রমণ প্রতিহত কর্‌তে পার্‌বো। তারপর আর আমাদের কোনো উপায় থাক্‌বে না। তাই আমার ইচ্ছা, দুর্গের বাহিরে যেয়েই আমরা যবনদের আক্রমণ করি—মরি, মারি,—সম্মুখ রণই ভাল।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া রাণী উত্তর করিলেন "না, কৃষ্ণা, তা'তে আমাদের লাভ নেই। পুরুষ সৈন্যের সংখ্যা আমাদের নিতান্তই অল্প; যা' স্ত্রীলোক আছে, তাদেরও অধিকাংশই অশিক্ষিত। যবনের সংখ্যা অগণিত; সকলেই আবার সুশিক্ষিত। পুনঃপুনঃ পরাজয়ে আমাদের লোকেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে, আর উপর্যুপরি জয়ে তা'রা উৎফুল্ল ও উৎসাহিত। সম্মুখ-যুদ্ধে আমাদের কোনো ভরসাই নেই। এখানে থেকে কিছুদিন তা'দের আক্রমণ প্রতিহত ক'রে তা'দের সৈন্য-সংখ্যা যদি কিছুও কমাতে পারি, তবে তখন সুযোগ ও সুবিধা বুঝে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে তা'দের আক্রমণ করা যাবে।"

অমলা কহিলেন "পিসিমা, মা যা বলেছেন, তাই ঠিক। আমরা যদি দুর্গের বাইরে যাই, একদল হয়ত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে ও ততক্ষণ আর এক দল এসে দুর্গ দখল ক'রে ব'স্‌বে। এক দিনেই আমাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হবে! সেটা হ'তে দিতে পারিনে। দুর্গে আমরা সুরক্ষিত—যত দিন রসদাদি আছে, যবন আমাদের কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না, বরং আক্রমণে আক্রমণে প্রতিনিয়ত তা'দের সৈন্যসংখ্যাই কম্‌বে। ম'র্‌তে ত আমাদিগকে হবেই, যত পারি শত্রু নিপাত ক'রে মরি। বাবা আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন, ম'র্‌লে আমাদের আত্মার শান্তি হবে।"

জননীর অঞ্চল ধরিয়া বিমলা ধীরে ধীরে বলিলেন "আমার একটা কথা শোন মা। বাইরে গেলেই আক্রমণ করি, আর ভেতর থেকেই আত্মরক্ষা করি, মুসলমানের সঙ্গে শত্রুতায় মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত। ভৈরবের মত, বাবার মত বীর যাঁদের কিছুই করতে পারেননি, স্ত্রীলোক আমরা যে তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠবো—এ স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা। আমার কথা শোন, যবনের সঙ্গে সন্ধি কর—"

কমলা গর্জ্জিয়া উঠিলেন "তোর কথায় আমার গা জ্বলে যায়, বিমল যে যবনের হাতে সিন্ধু এমন লাঞ্ছিত হয়েছে, যে যবনের হাতে সিন্ধু শ্মশানে পরিণত হয়েছে, সেই যবনের সঙ্গে সন্ধি। না, বিমল, প্রাণের অপমান রাখিবনে—প্রাণের মমতায় বংশে কালি দিবনে।"

রাণীর চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন "তোর কথা আমার প্রাণে বড় লেগেছে বিমল! তুচ্ছ প্রাণের এত মমতা!" তার পর কন্যাকে বুকে টানিয়া বলিলেন "মা আমার, চিরকাল কিছু বেঁচে থাকবো না এ সংসারে আসিনি, মরতে একদিন হবেই। প্রাণ দিব, তবু মান খোয়াবনে।" বালিকা আর কিছু বলিল না। কমলাবতী দাঁড়াইয়া বলিলেন "চল, আমরা প্রস্তুত হইগে।"

এ দিকে যখন কহ্লন্ প্রথম শুনিলেন, যুদ্ধে যবনের জয় হইয়াছে, দাহিরপ্রমুখ সকলেই নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি প্রথমটায় কিছুই বলিলেন না; কেবল শূন্য নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সংসারে কোন দিন যে তাঁহার কেহ আপনার ছিল, সে কথা তাঁহার মনে নাই; জ্ঞান হইয়া অবধি তিনি কাহাকেও আপনার করিতে চেষ্টা করেন নাই। চিরকাল ঠাকুর ভবানীর পূজা করিয়া আসিয়াছেন—স্বদেশের মঙ্গলসাধনার্থ সিন্ধুবাসীদিগকে শিক্ষিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন; স্বহস্তে মহারাজ দাহির ও তাঁহার কন্যাদ্বয়কে গড়িয়া তুলিয়াছেন—মনে ভাবিয়াছেন, ইহাও ভবানীরই কাজ। কিন্তু যাহাতে

কাহারো উপর আসক্তি না জন্মে, সর্ব্বদা তিনি সেই চেষ্টা করিয়াছেন। এবং তাঁহার বিশ্বাসও হইয়াছিল, তিনি মায়ামুক্ত হইয়াছেন। যোগ-বলে প্রথমেই ঠাকুর যখন আক্রমণের ফলাফল অবগত হইয়াছিলেন; পুরুষকার অবলম্বন করিয়া যথাসাধ্য সেই কুফল বারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সিন্ধুবাসী স্ত্রী-পুরুষ, সকলকে জন্মভূমির স্বাধীনতা-রক্ষার্থ উত্তেজিত করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যাহা কখনো তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, আজ তাহাই হইল। তাঁহার বড় গর্ব্ব ছিল, তিনি মমতার হাত এড়াইয়াছেন; আজ বুঝিলেন, তাহা বড়াই মিথ্যা। অজ্ঞাতসারে, তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, দাহিরের প্রতি তাঁহার অপরিমেয় বাৎসল্যভাব জন্মিয়াছিল,—আজ ঠিক ভবানী-মূর্ত্তিরই পাশে তেমনি উজ্জ্বল ভাবে, তেমনি মোহন-সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীরণ করিয়া, জননী জন্মভূমির স্বর্গীয় মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। দাহিরের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া—সে মৃত্যুর কথা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন—তাঁহার যোগাভ্যাস, তাঁহার সংযম, তাঁহার গর্ব্ব, সব মিথ্যা হইয়া গেল; এত দিনের প্রচ্ছন্ন বাৎসল্যভাব আজ, তাহার মত সহস্র মুখে ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল, 'দাহির কৈ? আমার দাহির কৈ?'—আবার, দাহিরের অনুসন্ধানে হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করিতে যাইয়া মর্ম্মাহত হইয়া, কহলান্ ভূতলে পড়িয়া গেলেন—জননী জন্মভূমির সেই স্বর্গীয় মূর্ত্তি, হস্তপদ ছিন্ন হইয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন, 'কৈ, কহলান্, আমার দাহির কৈ? যখন আজ আমার এ অবস্থা হবে কেন?' ঠাকুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন ঠাকুরের উন্মত্ত অবস্থা। পূজোপকরণ প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি আপনা আপনি বকিতে লাগিলেন "আর না, আর ভবানীর পূজায় কাজ নেই। পাষাণী, চিরকালই পাষাণী থাকে—তাহাতে কখনো দেবত্ব হ'তে পারে

না।" তারপর, ভবানীমূর্ত্তির দিকে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিলেন "এ হাতে আর ভবানি তোর পূজো করবো না। যবনী তুই, যবন তোর পূজো করবে। ভক্তের রক্তে তোর এতই প্রীতি! সমগ্র সিন্ধুবাসীর রক্ত পান ক'রেও তোর তৃপ্তি হ'লো না! —দাদ্রিকেও নিলি! আচ্ছা, প্রাণভরে ভক্তের রক্ত দেবো, তুই লক্ লক্ জিহ্বা বের করে যত পারিস্, পান করিস্!" ঠাকুর মূর্ত্তির সম্মুখস্থ গঙ্গাজলকুম্ভ পুষ্করিণী-বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন; তার পর, বিকট নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দাদ্রি কৈ? আমার দাদ্রি কৈ? আমার সিন্ধু আজ শ্মশান হলো কেন?"

এমন সময় অমলা আসিয়া, মন্দিরের অবস্থা ও কল্লনের ভাব দেখিয়া বিস্মিত-স্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে কহিলেন "একি ঠাকুর্দ্দা, তুমি কচ্ছো কি? মার পূজোর উপকরণ দেখ্‌চি, ভেঙ্গে চুরমাড় করেছ! তোমার হ'লো কি ঠাকুর্দ্দা!"

তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া কল্লন্ মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "এখনো পাষাণি, এখনো মুখ তুলে' চা।" স্থির দৃষ্টিতে কতক্ষণ ভবানীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া, উন্মত্তের মত লাফাইয়া পড়িয়া মূর্ত্তি ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কি, এখনো চাইবিনে? আচ্ছা, দেখি তোর ক্ষমতা কত!—এই আমি তোকে পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ ক'রবো।"

দৌড়িয়া অমলা যাইয়া ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন "ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুর্দ্দা—"

তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রতিমা ত্যাগ করিতে করিতে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, গম্ভীর স্বরে ঠাকুর বলিলেন "কে ও!—অমল! এসেছিস্ বোন, ভালই করেছিস্।" তারপর বসিতে বসিতে বসিতে বলিলেন "আর, ভবানীর পূজোয় কাজ নেই! পষাণ প্রতিমা আজ আমি পুকুরের জলে ডুবিয়ে দেবো; রক্ত পানে ইচ্ছা!—প্রাণ ভ'রে আজ রক্ত দেবো।"

পদপ্রান্তে উপবেশন করিতে করিতে যুবতী কহিলেন "তুমি ক্ষেপেছ কি? পাগলের মত কি ব'কচো ঠিক নেই!"

আবার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন "না, আমি ক্ষেপিনি। তুই চিনিস্নি—আমি চিনেছি, ভবানী দনুজদলনী নয়, দেব-দলনী! তাই আজ আমার প্রাণ শূন্য,—আমার দাহির নাই!"

ধীর ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অমলা বলিলেন "তুমিই ত শিখিয়েছ, সকলকেই ম'র্তে হবে; মরার জন্য দুঃখ করা অজ্ঞানের কাজ। তুমিই ত বুঝিয়েছ, মানুষ মরে না, সুধু জীর্ণ শীর্ণ কর্ম্মাক্ষম দেহ বদলিয়ে নূতন দেহ ধারণ করে। আগ থেকেইত তুমি আমায় সব ব'লে এসেছ! তবে আজ তোমার এ দুঃখ কেন?"

ঠাকুর কহিলেন "দুঃখ কেন?—শোন্ অমলে, দুঃখ কেন। আমার বিশ্বাস ছিল চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই; চেষ্টায় মনকে স্নেহ-মমতার অতীত ক'রে ফেলেছি, জীবন মরণ আমার পক্ষে সমান। আরো বিশ্বাস ছিল চেষ্টায় ভবানীর মন ফিরবে। কিন্তু এমন যে পাষাণী, আগে কে জানতো! আর আমি পাষাণ পুজো কর্বো না।"

আবার অমলা বলিলেন "তোমার চেষ্টা তুমি করেছ; আর ক্ষোভ কেন? তুমিইত ব'লতে, ফলাফল ভবানীর হাতে! তবে ফলের জন্য দুঃখিত হ'চ্ছো কেন? তোমার পূর্ব্ব কর্ম্ম কোথায় যা'বে? যেমন ক্রিয়া ক'রে এসেছ, তেমনি প্রতিক্রিয়া ভুগতে হ'বে। তোমার কর্ম্ম অনুযায়ী ভবানী ফল দিচ্ছেন; তাঁর উপর এ ক্রোধ কেন? আবার কেন কর্ম্ম-বন্ধন বাড়া'তে যাও! চল, এখনো প্রশান্ত মনে কর্ত্তব্য ক'রে যাই—ফল যা' পা'বো, তাই সচ্ছন্দ মনে ভোগ ক'র্বো।"

দুই হস্তে কপাল চাপিয়া ধরিয়া কহলন্ উত্তর করিলেন "না, অমল, আর আমি কর্ম্মের মধ্যে নাই। আমার এতদিনের জপতপ, সুধর্মশিক্ষা, সকলই বিফল হয়েছে,—দাহিরের শোক আমি কিছুতেই সাম্লাতে,

পাচ্ছিনে; চেষ্টার অনুরূপ ফল পাইনি বলে, প্রাণে আজ আমার অসহ্য যন্ত্রণা! দুর্ব্বল আমি, আর কর্ম্মে যেতে সাহস হয় না। দেবী তুই, কর্ম্মে তোর অধিকার। ভবানী আমায় সিন্ধু ছেড়ে যেতে বলেছিল, আমি শুনিনি; শুন্‌তেম্ যদি, তবে হয়তঃ এমন হ'তো না! আজ আমি, সুধু সিন্ধু কেন, হিন্দুস্থান ছেড়ে যা'বো, পৃথিবীর খেলা সাঙ্গ ক'র্‌বো।"

দৃঢ়স্বরে অমলা বলিলেন "ক'র্‌বে যদি আমার সঙ্গে এসো। শত্রু মেরে প্রাণ দিই, আত্মার শান্তি হবে, ভবানীও তৃপ্ত হ'বেন।"

মাথা নাড়িয়া কহ্লন কহিলেন "ভক্তের রক্তে ভবানীর তৃপ্তি, শত্রু-শোণিতে তার তৃষ্ণা বারণ হবে না। আমার রক্ত পেলে ভবানীর যদি শোণিত পিপাসার শান্তি হয়, তবে তোরা বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারিস্, সিন্ধুর স্বাধীনতা রক্ষা হলেও হ'তে পারে।" বলিতে বলিতে ঠাকুর ভবানীর দিকে মুখ ফিরিয়া বসিয়া ভ্রূযুগের মধ্যস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, নিশ্বাস রোধ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। মুগ্ধ নয়নে যুবতী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

প্রায় চারিদণ্ড পরে কহ্লন্ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন ও জানু পাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক, অমলা লক্ষ্য করিতে না করিতে, আসনের নীচ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া, বুক চিঁড়িয়া বাম হস্তে তাম্রপত্রে রক্ত ধরিয়া, মূর্ত্তির চরণ-প্রান্তে রাখিয়া বলিলেন "নে, শোণিতলোলুপা লোলরসনা ভবানি, আমার বুকের রক্ত নে। যদি পাষাণি, তো'তে বিন্দু মাত্রও দেবত্ব থাকে, তবে এখনো সিন্ধুর দিকে মুখ তু'লে চা'স্।"—ঠাকুর আসিয়া আবার আসনে বসিলেন; ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে; কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই।

অমলা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন—তাঁহার মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কতক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "অমল, ভবানী এখন প্রসন্ন হ'লেও হ'তে পারে। তোরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিস্—"

অমলার কথা ফুটিল; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "আর তোমার কথা শুনতে চাইনে, ঠাকুর্দ্দা। জপ, তপ, সংযমে মাথার চুল পাকিয়ে আজ কিনা তুমি—আমার শিক্ষাদাতা, আমার ইষ্টদেবতা—তুমি শোকে মুহ্যমান্ হ'য়ে প'ড়্‌লে! এতদিন যা শিখিয়েছিলে, যা বুঝিয়েছিলে—ধর্ম্ম কর্ম্ম সব উলটিয়ে দিতে চাচ্ছো! আর তোমার কাছে কোনো শিক্ষা, কোনো উপদেশ, চাইনে; এত দিন আমায় যা শিখিয়েছ, আমি তাই ক'র্‌বো। তোমার চরণে প্রণাম!" যুবতী ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেলেন।

বহ্লন্ তখন নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে বসিলেন। অমলার কাছে সকল শুনিয়া রাণী কমলাবতী দৌড়িয়া আসিলেন। ঠাকুরের পদ-তলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "বাবা, এ বিপদের সময় তুমিও আমায় ত্যাগ ক'রে যাচ্ছো!"

ঠাকুর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, রাণীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আমার জন্য অস্থির হ'য়োনা, মা। সংসারে আমরা খেলতে আসি মাত্র। মহারাজার খেলা সাঙ্গ হয়েছিল, তাঁকে যেতে হয়েছে। আমার সাঙ্গ হলো, আমি চল্লেম। তোমাদের খেলা সাঙ্গ হলে, তোমাদেরও যেতে হ'বে। একটা কাজ ক'রো, প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রো; যখন বুঝ্‌বে আর রক্ষা হলো না, তখন অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত ক'রে তাতে ঝাঁপ দিও; অর্চ্চি-পথে যেয়ে মহারাজের সঙ্গে মিলিত হ'তে পার্‌বে। তোমার এ দৃষ্টান্ত বহুকাল রাজপুত-রমণীরা অনুসরণ কর্‌বে। এখন আমায় বিদায় দাও মা।" বলিতে বলিতে ঠাকুর নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হইলেন; তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া একটা তীব্রজ্যোতিঃ বাহির হইয়া গেল।

——c——

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গজয়ের মন্ত্রণা।

আজ চারিদিন হইল মুসলমানগণ সেই ভীষণ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু এখনো তাঁহারা উপত্যকা ত্যাগ করিয়া দুর্গ দখলের জন্য যাত্রা করিতে পারেন নাই ! যুদ্ধাবসানে সেই যে কাশেম অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। তদবধি হেকিম্ রোগীর শয্যা পার্শ্বেই বসিয়া রহিয়াছেন, প্রহরে প্রহরে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতেছেন—কিন্তু জ্বরের বিরাম কি হ্রাস হইতেছে না ; রোগীরও জ্ঞান সঞ্চার হইতেছে না। আঘাত-মুখে প্রথম দিন ভয়ানক রক্তস্রাব হইয়াছিল ; এখন তাহা বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঘা পাকিয়া, ফুলিয়া উঠিয়াছে। সেনাপতির এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যবনশিবির যেন বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছে ; তাহাদের পরম আদরের পাত্র, সেনাপতির জীবন সম্বন্ধে ঈদৃশ অনিশ্চয়তাবশতঃ সৈন্যগুলি সম্পূর্ণ ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। একটিবার ও তাহাদের সেই লুট্-তরাজের কথা মনে হইতেছে না।

সহকারী সেনাপতি রহিম একাধিকবার দুর্গ আক্রমণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেনাপতি সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সৈন্যগণ উপত্যকা হইতে একটি পদও বাহির হইতে স্বীকৃত হয় নাই ; কাজেই ক্ষুণ্ণ মনে খাঁ সাহেবকে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে হইয়াছে।

চতুর্থ দিন বৈকালে কাশেমের অবস্থা অধিকতর খারাপ বোধ হইতে লাগিল ; হেকিমের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে ; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনি ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। সৈন্যরা সব আসিয়া সেনাপতির শিবির ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। রহিম খাঁ শিবিরে প্রবেশ করিলেন, ও তাহার ক্ষুদ্র চক্ষুতে কটাক্ষ করিয়া হেকিমকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন।

চিকিৎসক উত্তর করিলেন, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। তখন জ্বর ত্যাগ হইবে; সেই সন্ধিলগ্ন কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, আর সেনাপতির জীবনের কোন ভয় নাই। খাঁ সাহেব আবার বাহির হইয়া আসিলেন।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল; কাশেমের অবিরল ঘর্ম্মস্রাব হইতেছে; দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার পোষাক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। হেকিম নূতন নূতন ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোকজন সব উদগ্রীব হইয়া তাঁহার মুখের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া আসিল, কাশেমের ঘর্ম্মস্রাব কমিয়া আসিয়াছে; শরীর একেবারে হিম হইয়াছিল; ক্রমে তাহা একটু একটু করিয়া উষ্ণ হইতেছে, হেকিমের মুখ ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। মধ্য রাত্র উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, কাশেম চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, বলিলেন "বীরগণ অগ্রসর হও, একটি কাফের ও যেন জীবিত না ফিরে যায়।" তারপর স্তম্ভিতের মত চারিদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমারা সব কা'রা? আমি কোথায়?" হেকিম হাঁফ্ ছাড়িলেন; নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন "আপনার শিবিরেই রয়েছেন।" রহিম খাঁ আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন; তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া হেকিম বলিলেন "জ্বর সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়াছে; আর ভয় নেই।" সৈন্যগণ আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। চক্ষু নিমীলিত করিয়া কাশেম বলিতে লাগিলেন "শিবিরে! শিবিরে! মর্জ্জিনা কই?" হেকিম্ উত্তর করিলেন, "তিনি এখানেই আছেন; আপনি এখন বেশী কথা ব'লবেন না; শরীর বড় দুর্ব্বল।"

রজনী প্রভাত হইয়াছে। একে একে সেনাপতির শিবির সম্মুখে আসিয়া সৈন্যগণ জড় হইয়াছে; কাশেম সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া তাহারা, এত দিনের রুদ্ধ আনন্দোচ্ছ্বাস ছুটাইয়া দিয়া, সমস্বরে জয় ধ্বনি

করিয়া উঠিল। যুদ্ধের পরে এই তাহাদের প্রথম জয়োল্লাস। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া কাশেম পার্শ্বোপবিষ্ট খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দুর্গ দখল হয়েছে কি ?"

রহিম কহিলেন "আপনাকে নিয়েই সব ব্যস্ত, দুর্গ দখল করি কখন ?

কাশেমের শুষ্ক অধর-প্রান্তে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "আমার মত একটা তুচ্ছ প্রাণের জন্য কেন আপনারা অত উদ্বিগ্ন হ'য়েছিলেন ? আপনাদের মত স্বদেশ-প্রিয়, স্বজাতিবৎসল বীর থাক্‌তে, আমার মত দু'টো একটা কাশেমে কি এসে যায় ? আপনারা কাল্‌ই দুর্গ আক্রমণ করুণ।"

খাঁ সাহেব উত্তর করিলেন "এত দিনই গিয়েছে ; আপনি সুস্থ সবল হ'য়ে উঠুন, তখন করা যা'বে।"

"না, তা'তে শত্রুপক্ষ বেশী সময় পা'বে ; দুর্গ-জয় কঠিন হ'য়ে প'ড়্‌বে।" তারপর হেকিমের দিকে চাহিয়া কহিলেন "কতদিন আর আমায় এমন্ ভাবে থাক্‌তে হ'বে ? এ যে বড় বিরক্তিজনক, বড় অসহ্য!"

অভিবাদন করিয়া হেকিম উত্তর করিলেন "আর একহপ্তা পরেই আপনি সম্পূর্ণ সেরে উঠ্‌বেন।"

তখন সেনাপতি রহিমের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আচ্ছা, এর মধ্যে তা হ'লে একটা কাজ করা যেতে পারে।—হিন্দু কণাদ্ কই ?"

খাঁ সাহেব উত্তর করিলেন "আমার শিবিরেই আছে।"

কাশেম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তা'র মতের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি ত ?"

কটাক্ষ করিয়া রহিম বলিলেন "খাঁচায় যখন পুরেছি, তখন আর হ'লেই বা কি ? তবে, এখনো কিছু হয়েছে ব'লে বোধ হয় না ; যদিও

সময় সময় স্ত্রীকন্যার জন্য একটু উতলা হ'য়ে ওঠে! কিন্তু তখনি আবার সিংহাসনের লোভ দেখা'লে সব ভু'লে যায়!"

"এখনো কি নিজের হাতেই খায়?"

হাসিয়া খাঁ সাহেব বলিলেন "হুঁ, সেটা এখনো ছাড়েনি।"

"এখন তাঁতে আপত্তি কর'বেন না। একবার তাঁকে ডেকে পাঠান; পরামর্শের আবশ্যক আছে।" খাঁ সাহেব আপনিই উঠিয়া গেলেন; কাশেম চক্ষু বুজিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই কণাদ কে লইয়া রহিম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমাদরে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া কাশেম জিজ্ঞাসা করিলেন "দুর্গ-জয় করা কি বড় কঠিন হইবে?"

গম্ভীর ভাবে কণাদ উত্তর করিলেন "বড় সহজও হইবে না। উত্তরে খাড়া পাহাড়; পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণে অভ্রভেদী প্রস্তরগ্রথিত সুদৃঢ় প্রাচীর: এই তিনদিকে তিনটি দরোজা আছে সত্য; কিন্তু তাহাতে পুরু-পুরু লৌহ কপাট। প্রাচীর বেষ্টন ক'রে আবার দশহাত পরিসর একটি পরিখা; দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও তাতে অন্ততঃ সাত হাত জল থাকে।"

কাশেম রহিমের দিকে চাহিলেন। খাঁ সাহেব বলিলেন "অনাহারে তা'দের মার্'বো। দুর্গ প্রবেশের সমস্ত পথ যদি আমরা আগ্'লে ব'সে থাকি, তা'হ'লে খাদ্যের অভাবেই যে ওরা ম'রবে; মজুত জিনিষে আর ক'দিন চ'ল্'বে?"

সেনাপতি উত্তর করিলেন "সে ত' বেশ কর্'তে হ'বেই; কিন্তু এতে আমাদিগকে ও অসুবিধায় প'ড়্'তে হ'বে। ক'মাস, ক'বছর এমনি ভাবে থাক্'তে হ'বে, তার ঠিক কি? ব'সে থেকে সৈন্যদের অসন্তুষ্টি বাড়্'বে, ব্যামোপীড়া হ'বে! কোন সহজ পথ দেখ্'তে হ'চ্ছে।" তার পর কতক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া, কণাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনি বই এ বিপদে আমাদিগকে কেউ ত'রাতে পার্'বে না।

আপনার স্ত্রীকন্যা সেখানে আছে। আজই রাত দুপুরের পরে, একটা ঘোড়া, আমরা যেখানে আছি, ঠিক এর বিপরীত দিক্ থেকে, ছুটিয়ে, খুব হাঁপিয়ে-হুঁপিয়ে যেয়ে আপনি দুর্গের দরজায় পড়ুন। তারা অবশ্যই জানে না যে আপনি আমাদের সঙ্গে মিত্রতা করেছেন। তারা দোর খুলে বেরিয়ে আস্বে। আর এদিক থেকে, খাঁ সাহেব একদল পদাতিক সৈন্য নিয়ে, আনাচে-কানাচে চুপি-চুপি যেয়ে লুকিয়ে থাকুন। যাই তা'রা দোর খুলে বেরুবে, অম্নি ইনি মার্ মার্ ক'রে ঢু'কে প'ড়্বেন। আপনার মেয়ে ও স্ত্রীকে আপনি দেখিয়ে দেবেন; কেউ তাঁ'দের কেশ স্পর্শও কর্'বে না। কেমন, এভাবে ছাড়া সহজে কাজ হ'বে না?"

রহিম সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলেন। হাসিয়া কণাদ্ বলিলেন "আপনার বুদ্ধির তারিফ্ কর্'তে হয়, সেনাপতি সাহেব।"

দুর্বল হস্তে কণাদের হস্ত ধরিয়া কাশেম জিজ্ঞাসা করিলেন "এতে আপনি রাজী আছেন?"

কণাদ হাসিলেন "বন্ধুর জন্য হিন্দু প্রাণও দিতে পারে। আমায় যা' বল্বেন, আমি তাই কর্'তে রাজী আছি।"

তাহার পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া রহিম কহিলেন "যদি কাজটা হাঁসিল্ ক'রে উঠ্তে পারি, দোস্ত, তবে ত' কালই তুমি সিন্ধুর রাজা!" কাসেম হাসিলেন। এই পরামর্শই স্থিরীকৃত হইল; যাত্রার উদ্যোগ করিবার জন্য রহিম ও কণাদ উঠিয়া গেলেন।

——o——

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী-স্ত্রীতে

প্রভাতে, কাশেমের রোগ-মুক্তিতে যবন-সৈন্যগণ যে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল, সেই ধ্বনি শুনিয়া রাণীপ্রমুখ দুর্গবাসিগণ বুঝিয়াছিলেন, মুসলমান্ আসিয়া তখনই দুর্গ আক্রমণ করিবে। তাই তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। প্রাচীরটি অনুমান বিশহস্ত প্রশস্ত হইবে ; প্রাচীর-শিরে উঠিবার জন্য ভিতরের দিকে সুপ্রশস্ত সোপানাবলী ছিল ; এবং প্রাচীর-শিরের সম্মুখ প্রান্তে দেড় হস্ত পুরু, দুই হস্ত উচ্চ আর একটি ক্ষুদ্র প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার গাত্রে এক-এক হাত অন্তর আধ হাত প্রশস্ত, একহাত উচ্চ এক একটি ফাঁক্ ছিল ; তাহাদের মধ্য দিয়া বহির্ভাগে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিত। এই ফাঁকে ফাঁকে বসিয়া বহিঃ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ-কার্য্য বেশ চলিতে পারিত। এই প্রাচীর-গাত্রে পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণে, যে ফটক ছিল, পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে, ঠিক তাহাদের উপরিভাগে এক একদল তীরধনুকধারিণী রমণী লইয়া, রাণী, অমলা ও কৃষ্ণা আসিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা আরো একটি কার্য্য করিয়াছেন ; রাশি-রাশি প্রস্তর ও ইষ্টক খণ্ড আনিয়া প্রাচীর-শিরে মজুত করিয়াছেন। যখন তীর-ধনুকের কার্য্য চলিবে না,—যখন শত্রু পরিখা পার হইয়া একেবারে প্রাচীর-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইবে,—তখন এই সব অস্ত্র কাজে লাগিতে পারে।

বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহারা এই ভাবে বসিয়া রহিলেন ; কিন্তু শত্রুর কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। তখন তাঁহারা, দলে-দলে আসিয়া স্নানাহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আবার সুপ্রস্তুত হইয়া শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তখনো যবনের দেখা

নাই। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় প্রহরেক হইতে চলিল; মেঘান্তরিত চন্দ্রের ম্লান আলোকে চক্ষুতে বেগ দিয়া তাঁহারা চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু শত্রুর কোনো নিদর্শনই দেখা গেল না। তবু তাঁহাদের শ্রান্তি-ক্লান্তি বোধ নাই।

আরো কতক্ষণ গেল। অকস্মাৎ পাহাড়পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিতে তুলিতে কতজন যেন অশ্ব ছুটাইয়া আসিতেছে,এমন শব্দ কাণে পঁহুছিল। ধনু-র্ব্বাণ হস্তে করিয়া যে যাহার স্থানে দৃঢ় হইয়া বসিলেন ও সোৎসুক দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে বোধ হইল; শেষে বেশ বুঝা গেল, একটি মাত্র অশ্বারোহী দক্ষিণ ফটকের পথ ধরিয়া তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিবার জন্য সকলে উঠিয়া দাঁড়াইতে ছিলেন; রাণী নিষেধ করিয়া বলিলেন "কেহ নড়িওনা।" সকলে আবার স্বস্ব স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে চন্দ্রদেব পাহাড়ের পশ্চাতে নামিয়া পড়িয়াছেন। একজন মাত্র অশ্বারোহী আসিতেছে, বুঝা গেল; কিন্তু কে যে সে, তাহা চিনিতে পারা গেল না। শেষে পরিখা-প্রান্তে দাঁড়াইয়া অশ্বারোহী চীৎকার করিয়া বলিল "রাণীজি, রাণীজি, আমি কণাদ এসেছি; শীঘ্র ফটক খু'লে দিন্; এখনো যবন টের পায়নি।" রাণী বিস্মিত, স্তব্ধ হইলেন। কণাদের কথা এতদিন তাঁহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। স্বর শুনিয়া রাণী ভাবিতে লাগিলেন, "এ আবার কি? এত দিনও কি সে যবনের হাতে বেঁচে রয়েছে!—না, সম্পূর্ণ অসম্ভব! এ নিশ্চয়ই যবনের প্রতারণা।" রাণী কোনো উত্তর করিলেন না। আবারো সেই পরিচিত স্বরে সেই চিৎকার-ধ্বনি উঠিল। রাণী ধীরে ধীরে উঠিয়া, সকলকে স্থির ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া, কৃষ্ণা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সোদ্বেগে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন "যবন দেখা দিয়েছে কি?" রাণী তাঁহার কাণে-কাণে

অশ্বারোহীর কথা বলিলেন; কৃষ্ণা চীৎকার করিয়া উঠিলেন "অসম্ভব! তিনি কখনো পালিয়ে প্রাণ বাঁচা'তে আসেন নি।" তারপর কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, বলিয়া উঠিলেন "তবে কি বাস্তবিকই তিনি উন্মত্ত হ'য়েছেন?" রাণী উত্তর করিলেন "কথা শুনে ত' তেমন কিছু মনে হয় না। আমি এখানে রইলেম্, তুমি যেয়ে সব বিবেচনা ক'রে যা' হয় ক'র।" রাণী তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন; কৃষ্ণা দক্ষিণ দিকে চলিয়া আসিলেন।

লোকটা পুনঃ পুনঃ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে "আমি কণাদ, আমি কণাদ—বড় কষ্টে যবনের হাত এড়িয়ে এসেছি। আমায় ভিতরে নিন্, রাণীজি, আমায় ভিতরে নিন্।" কৃষ্ণা শুনিলেন, সেই স্বর! লজ্জায় ঘৃণায় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল—কতক্ষণ তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, শেষে একান্ত উত্তেজিত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন "তুমি নিশ্চয়ই কণাদ নও। হয় কোনো ছদ্মবেশী যবন, নতুবা তাহার প্রেতাত্মা। তিনি কখনো স্ত্রীর আঁচলের আড়ালে প্রাণ বাঁচা'তে আসেন নি।" তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে স্তব্ধ-বিস্মিত হইল। কণাদ গদ-গদকণ্ঠে বলিলেন "কেও, কৃষ্ণা? প্রাণেশ্বরি, দোর খোল; সাধ্য যতক্ষণ ছিল, যবনের সঙ্গে যুঝেছিলেম্"—বাধা দিয়া স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন "বল তবে যবন জয় ক'রে এসেছ,—সিন্ধুবাসিনীদের স্বামীর শোক, পুত্রের শোক, পিতার শোক মুছিয়ে দিতে এসেছ?" এমন সময় ত্রস্তপদে অমলা আসিয়া বলিলেন "মা কৈ?" "পূব দিকে রয়েছেন" বলিয়া কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?" সকলে হৈ চৈ করিয়া উঠিবে আশঙ্কা করিয়া অমলা তাঁহাকে সরাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "আমার বিশ্বাস পশ্চিম দিকে যবন পরিখা পার হয়েছে। প্রথমটায় আমার মনে হ'লো কেউ যেন জলে সাঁতার কাট্‌চে। চাইলেম্, অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু খুব কাণখাড়া

ক'রে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে থাক্‌লেম্‌, স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু আমার যেন বোধ হ'তে লাগ্‌লো যে, অনেকগুলো খালি পায়ের শব্দ আমি শুন্‌তে পেলেম্‌। কি করি—যে দিকে হ'তে শব্দ আস্‌ছিল, সেই দিক লক্ষ্য ক'রে তীর ছোড়্‌লেম্‌। ঝপাস্‌ ক'রে কি একটা জলে প'ড়্‌লো। কিন্তু আর কোনো শব্দই হ'লো না। আরো দু'চারটা তীর ছু'ড়ে দেখ্‌লেম্‌; বেশী কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম্‌ না।" কতক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কৃষ্ণা ভাবিতে লাগিলেন; শেষে বলিলেন "আমারো বিশ্বাস যবনই এসেছে।" এমন সময়ে কণাদের কাতর চিৎকার অমলার কাণে গেল: তিনি চমকিয়া উঠিলেন "ওকি?" হাসিয়া কৃষ্ণা বলিলেন "ওই আর এক উপদ্রব জুটেছে! তুমি যাও রাণীকে ব'লে এসোগে।"

"এ আবার কি বলনা, পিশিমা? এযে পিশামশায়ের স্বর!"

"হাঁ। তুমি রাণীকে ব'লে এসোগে যাও।" কৃষ্ণা আসিয়া স্বস্থানে দাঁড়াইলেন। বিস্মিত মনে ভাবিতে ভাবিতে যুবতী চলিয়া গেলেন।

লোকটা পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিতেছে; কোনো উত্তর না দিয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা ভাবিতে লাগিলেন "শেষে কি তিনি যবনের চর হ'য়ে এলেন? না, তাঁর মত লোক কি এমন নীচ হ'তে পারে?—এ নিশ্চয়ই কোনো ছদ্মবেশী যবন, তাঁর স্বর অনুকরণ ক'রে কথা ব'লচে!" শেষে তিনি ডাকিয়া বলিলেন "তুমি যেই হও, দুর্গে তোমার প্রবেশ নাই। সিন্ধুতে যাঁরা পুরুষ ছিল, তাঁরা সম্মুখ যুদ্ধেই মরেছেন। কণাদ বীরপুরুষ ছিলেন, শত্রুর হাত থেকে তিনি কখনো পালিয়ে আসেন নি। আর যদি এসেও থাকেন, তাঁর মত কাপুরুষের স্থান সিন্ধুর জলে!"

নিতান্ত ব্যথিত স্বরে কণাদ বলিলেন "কৃষ্ণা, কৃষ্ণা আমার, অসময়ে তুমিও কি এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে দাঁড়ালে? দোর খোল, স্বামীর প্রাণ বাঁচাও।"

রমণী পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে কহিলেন "কৃষ্ণার যিনি স্বামী ছিলেন, তিনি

ম'রে স্বর্গে গেছেন। তোমার মত কলঙ্কী কাপুরুষ, যার কথা শোন্‌লে, যার মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়, সে আমার স্বামীর পাদুকাবহনেরও যোগ্য নয়। পালাও তুমি, নইলে এই আমি তীর ছুড়্‌লেম্‌।" এমন সময় রাণী ও অমলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু বুঝ্‌লে?" কৃষ্ণা ত্রস্ত উত্তর করিলেন, "ছদ্মবেশী যবন।"

রাণী আবার বলিতে লাগিলেন "এখন আমারো তাই মনে হ'চ্ছে। যদি অমলার কথা ঠিক হয়, তবে পরিখা পার হ'য়ে যবন-সৈন্য নিশ্চয়ই এতক্ষণে এই ফটকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কণাদ এসেছে মনে ক'রে আমরা ফটক খুলে দিলে, তারা এসে ভিতরে ঢু'কে পড়্‌তো!"

লোকটা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল "কৃষ্ণা, এই কি তোর পতি-ভক্তি? স্বামী আমি বাইরে প'ড়ে চীৎকার ক'চ্ছি—প্রাণের দায়; আর তুই কিনা নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছিস্‌! ধিক্‌ তোকে, ধিক্‌ তোর সতীত্বে!"

তড়িদ্বেগে কৃষ্ণার ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল; তাঁহার কেশরাজি কাঁটা দিয়া উঠিল; সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। এমন সময় অমলা বলিলেন "ঠিক তো পিশামশায়ের স্বর! তবে কি তিনি যবনের চর সেজে এলেন?"

"হাঁ, যবনের চরই এসেছে" বলিতে বলিতে শব্দ লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণা তীর ছুড়িয়া ডাকিয়া বলিলেন "তুমি যেই হও, এই আমার পতিভক্তি, এই আমার সতীত্ব! ভবানী বিচার ক'র্‌বেন।"

"রাক্ষুসি, ডাকিনি, পিশাচি, স্বামী বধ কর্‌লি!" চীৎকার করিয়া কণাদ ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রাণী অমলা ও অন্যান্য রমণীরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে কণাদ আবার বলিলেন "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লো! আমি সিন্ধুর রাজা—হ'তে—গেছিলেম, দেশের শত্রু হয়েছিলেম—এই তার—পুরস্কার,

রাণীজি—রাণীজি—ওই দ্যাখ—যবন তোমার—দুয়ারে। ক্ষমা—ক্ষমা—বিদায়”—আর কিছু শোনা গেল না।

রাণী ও অমলা কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন “দেখ্‌চো কি? যবন পরিখা পার হ’য়ে এসেছে; ইট্ পাথর ছুড়ে মার। একটিও যেন ফিরে যেতে না পারে।” বলিতে বলিতে প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড উর্দ্ধোত্তোলিত করিয়া তিনি নীচে নিক্ষেপ করিলেন; রাণী ও অন্যান্য রমণীগণ যন্ত্র-চালিতার ন্যায় তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে লাগিলেন। নীচে যবন ভীষণ আর্ত্তনাদ ও কোলাহল করিয়া উঠিল; প্রস্তর-ইষ্টকচাপে ঝাঁকে ঝাঁকে তাহারা মরিতে লাগিল; পলাইতে যাইয়া ধূপ্ ধাপ্ করিয়া পরিখার জলে পড়িতে লাগিল; অন্য যে দিকে যাইতেছে, সে দিকেই উপর হইতে অবিরাম মুষলধারে প্রস্তর বর্ষণ হইতেছে। অতি কষ্টে কয়েকজন অনুচর সহ রহিম খাঁ পরিখা পার হইয়া পলায়ন করিলেন।

যতক্ষণ একটি প্রাণীরও আর্ত্তনাদ শোনা গেল, ততক্ষণ প্রস্তর বৃষ্টির বিরাম হইল না। শেষে যখন সব শান্তনীরব হইল, তখন রাণী কহিলেন “এখন যে যবন আমাদের দেখ্‌তে পা’বে, সে ভয় নাই। আলো জেলে দেখ, ওপারে কোনো যবন রয়েছে কি?” আলো প্রজ্বালিত হইল; ফাঁকে ফাঁকে যে রশ্মি যাইয়া বাহিরে পড়িল, তাহার সাহায্যে যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে বুঝা গেল, নিকটে শত্রু নাই।

যবনের কোলাহল নিবৃত্ত হইতেই, কৃষ্ণা প্রাচীর-গাত্রে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; প্রজ্বালিত আলোকে রাণী দেখিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু নিষ্প্রভ, হস্তপদ কম্পিত। ত্রস্ত তিনি নিকটে যাইয়া তাঁহার হাত ধরিবা মাত্র কৃষ্ণা পড়িয়া গেলেন। একটা মহা হৈ-চৈ উঠিল। সকলকে সরিয়া যাইতে বলিয়া রাণী তাহার মস্তক কোলে লইয়া বসিলেন; অমলা চক্ষুতে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—বিমলা বাতাস

করিতে থাকিলেন। প্রায় দুইদণ্ড পরে কৃষ্ণা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; তখন পালাক্রমে উপরে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া, রাণী, অমলা ও বিমলা তাঁহাকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

---o---

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গ-আক্রমণ।

চতুরঙ্গ-অবলম্বনে দুর্গে প্রবেশের বৃথা চেষ্টায় অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় করিয়া রহিম খাঁ প্রাণে-প্রাণে ফিরিয়া আসিবার পরে প্রায় একপক্ষ অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কাশেম বেশ সুস্থ সবল হইয়া উঠিয়াছেন; দেহে পূর্ব্বের বল, পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য প্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দুর্গ-অধিকারের অসম্ভাব্যতা চিন্তা করিয়া, মন তাঁহার সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন, মুখ গম্ভীর। অশ্বারোহণে অনেকবার তিনি দুর্গের চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু কোনোদিকে সূচি-পরিমাণ সুযোগও দেখিতে পা'ন নাই। অবশেষে স্থির করিলেন, দুর্গ হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে যত দূর আসিতে পারে, ঠিক সেই সীমার বাহিরে, দুর্গ বেষ্টন করিয়া অল্প দূরে দূরে, শিবির সন্নিবেশ করিয়া বসিয়া থাকিবেন।—যত দিন না খাদ্য সামগ্রীর অপ্রতুলতায় দুর্গবাসিগণ আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এতৎপূর্ব্বে একবার তাহারা প্রকাশ্য ভাবে আক্রমণ করিয়া দেখিবেন, ফল কতদূর কি হয়। তদনুসারে, তিনি, আগামী দিবস অতি প্রত্যুষেই দুর্গ আক্রমণ করিবেন বলিয়া সৈন্য সামন্তদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

এদিকে, সেই রাত্রে যখন রাণী কৃষ্ণাকে লইয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন কৃষ্ণা শয্যায় উপর ঢলিয়া পড়িয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া, রাণীকে, রাত্রিকার মত তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য,

অনুরোধ করিলেন। কমলাবতী প্রথমটায় ইতস্ততঃ করিলেন; কিন্তু যখন কৃষ্ণা আবার অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে কৃষ্ণা উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া, আলো নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন; তারপর, বক্ষাবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "হায়! আমি কি পোড়ারমুখী! যাঁহাকে বিয়ে অবধি দেবতা ব'লে বিশ্বাস করেছি, দেবতার মত জ্ঞান করেছি, সেই স্বামী আমার, পিশাচেরও হেয়! রাজ্যলোভে তিনি সুনাম-সুযশ খুইয়ে, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলেন, যবনের পায়ে স্বদেশের শান্তি সুখ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন ক'র্‌লেন্‌, জগতের চোখে ঘর-শত্রু বিভীষণ হ'য়ে দাঁড়ালেন! পোড়ারমুখী আমি, এর আগে ম'লেম্‌ না কেন? স্বহস্তে স্বামী বধ ক'র্‌তে হ'বে ব'লেই কি হতভাগিনী আমি বেঁচে ছিলেম্‌! আমি কোথা যা'বো!—কোথা গেলে এ জ্বালা জুড়োবো? তোর মনে এত ছিল, ভবানি!" কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন; হৃদয়ে শান্তি আসিল। পরদিবস প্রাতে জানু পাতিয়া বসিয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন "মা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, স্বামীর কলঙ্ক, স্বামীর পাপ যেন আমি ধৌত ক'রে ম'র্‌তে পারি; তাঁর হত্যার জন্য জন্ম-জন্ম আমায় নরক ভোগ ক'র্‌তে হয়, সেও ভাল; তাঁর অপরাধ মা তুই ক্ষমা করিস্‌।"

কমলাবতী সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন; কেহ এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না—যেন কেহ কিছু জানে না!

যে দিন কাশেম ঠিক করিলেন, পরদিবস প্রত্যূষে তিনি দুর্গ আক্রমণ করিবেন, সেই রাত্রের শেষভাগে পাহারার কার্য্য কেমন চলিতেছে, দেখিবার জন্য দুর্গশিরে আসিয়া কৃষ্ণা যবন শিবিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কতক্ষণ তিনি চাহিয়া রহিয়াছেন, ঠিক নাই;

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, যবন শিবিরে যেন তিনি কতকগুলি চলন-শীলা অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন। ত্রস্ত পদে তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন এবং রাণীও অমলাকে জাগ্রত করিয়া তাহা পরিজ্ঞাত করিলেন। আবার তাহারা উপরে আসিলেন; মনোযোগ সহকারে দেখিয়া রাণী বলিলেন "হাঁ, তাইত! যবন বুঝি আবার দুর্গ আক্রমণ ক'র্‌বে।" তখন দুর্গ-বাসিনী স্ত্রীলোকদিগকে জাগ্রত করিয়া তাহারা প্রস্তুত হইয়া বসিলেন।

ক্রমে প্রভাত হইল; না, একটু বেলাও হইল। পাহাড়-পর্ব্বতের ফাঁকে ফাঁকে স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ আসিয়া, দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমিটিকে নানাভাবে রঞ্জিত করিতে লাগিল। অকস্মাৎ দূরে যবন-সৈন্য দৃষ্টি-গোচর হইল। কমলাবতী সঙ্গিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভগ্নিগণ, প্রস্তুত হও, শত্রু এসে দাঁড়ানো মাত্রই যেন আমরা শ্রাবণের ধারার মত বাণ-বৃষ্টি ক'র্‌তে পারি।" অমলা, কৃষ্ণা, স্ব-স্ব স্থানে যাইয়া স্থির হইয়া বসিলেন। সকলের মুখেই দৃঢ়সংকল্পতার ভাব প্রকটিত!

অল্পক্ষণ পরেই আল্লা-আল্লা-আল্লা হো রবে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া, মুসল্‌মানগণ পরিখা প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গের তিন ফটক অনুসারে তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক দলের সঙ্গেই দুই দুইটি করিয়া অতি প্রকাণ্ড মই আছে। পরিখা পার হইতে পারিলে, ইহাদিগকে প্রাচীরে লাগাইয়া ভিতরে যাওয়া যাইবে।

যবন আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে প্রাচীরের অন্তরাল হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া তাহাদের উপর পড়িতে লাগিল। তাহাদের অনেক হতাহত হইয়া পড়িল। এ দিকে ফাঁক লক্ষ্য করিয়া তাহারা যে বাণ বর্ষণ করে, তাহার অধিকাংশই প্রাচীর-গাত্রে আহত হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়; আর যেগুলি ভিতরে প্রবেশ করে, সেগুলিও সকল বার কাজ করিয়া উঠিতে পারে না। তবে যবনের সংখ্যা অগণিত, দুর্গবাসিনীদের

সংখ্যা অতি অল্প মাত্র, এই যা' ভরসা। উহাদের দশটি আর ইহাদের একটি সমান। অশ্বারোহণে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাশেম, সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন!—জীবন মরণে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহারা বাণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

কিন্তু বেশী সময় আর এই ভাবে যুদ্ধ চলিতে পারিলনা; শত্রুর হতাহতের পরিমাণ করা ত দূরের কথা, তাহারা হতাহত হইতেছে কিনা তাহাও দেখা যায় না! এ দিকে আপনারা ক্রমেই সংখ্যায় হীন হইয়া পড়িতেছে! পরিখা পার হইবার জন্য কাশেমের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা সত্ত্বেও যবন-সৈন্য ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল; শত্রুর অবিরল বাণবৃষ্টির নীচে আর তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না—ক্রমে ক্রমে পশ্চাতে সরিয়া যাইতে লাগিল। শত্রু সীমার বাহিরে যাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া দুর্গবাসিনীগণও বাণ বর্ষণে ক্ষান্ত হইলেন এবং কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া, যাহারা মরিয়াছিলেন, তাহাদিগের সৎকারের ও আহতদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

কাশেম দুর্গ-বেষ্টন করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রাণী বেশ বুঝিলেন, বাহিরের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণা আবার তাঁহাকে বুঝাইলেন, মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন সম্মুখ-যুদ্ধে মরাই ভাল। রাণী আবার সেই আপত্তি করিলেন, যদি হয়রাণ হইয়া যবন শেষে ফিরিয়া যায়! আবারো বিমলা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সকলের নিকট তিরস্কৃত হইলেন।

———o———

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দ নাই কোথায় ?

সিন্ধুরাজ দাহিরের পরাজয় ও মৃত্যু সংবাদ যথাসময়ে বাগদাদে প্রেরিত হইয়াছিল। আজ সে সংবাদ বাগদাদে পঁহুছিয়াছে। কালিফ্ আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন; আজ তাঁহার কোষাগার উন্মুক্তদ্বার—দীন-দুঃখী যে যাহা চাহিতেছে তাহাই পাইতেছে। সমগ্র সহরময় আজ যেন আনন্দের উৎস ছুটিয়া পড়িতেছে। কালিফের হুকুম, আজ কেহ নিরানন্দ থাকিতে পারিবে না। দোকান, পশার আজ দোকানার নহে—কালিফের; যে যাহা চায়, তাহাকে তাহাই দিতে হইবে—মূল্য কালিফ্ স্বয়ং দিবেন। বাগদাদের প্রমোদোদ্যানগুলি আজ অবারিতদ্বার; দলে দলে আমোদপ্রিয় রসিক পুরুষেরা, নানাভাবে সজ্জিত হইয়া, নৃত্যগীতে সহরটাকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে; যাহাদের দিনান্তে একবার অন্ন জুটে নাই, আজ তাহারা নানাবিধ সুস্বাদ খাদ্য ও সরাবে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছে; ক্রীত দাসদাসীগণ আজ স্বাধীনতার সুখাস্বাদে আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছে! ছোট বড় সকলেরই আজ আমোদের দিন- সকলেরই আজ ফুর্‌ত্তি! সমগ্র বাগদাদবাসিগণ আজ দুই হাত তুলিয়া কাশেমকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে; মস্‌জিদে মস্‌জিদে তাঁহার মঙ্গলার্থ কোরাণ পাঠ হইতেছে; তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী নানাভাবে রঞ্জিত হইয়া আজ লোকের চিত্ত-বিনোদন করিতেছে! সম্মুখে থাকিলে আজ কালিফও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেন।

সহরময় আজ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত—ধনীদরিদ্র, ছোট বড়, প্রভুভৃত্য, বালকবৃদ্ধ, বুঝিয়া না বুঝিয়া, সকলেই আজ সে আনন্দ-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। দেখিয়া কালিফের মনে হইল—আজ আনন্দ নাই কোথায়? সহরবাসীরাও ভাবিতে লাগিল, আনন্দ নাই কোথায়?

—আনন্দ নাই, স্বয়ং কালিফের অন্তঃপুরে। সপ্তদ্বারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহ কবাটে বাধা পাইয়া পাইক্-প্রহরীদের রাঙা চক্ষু, দীর্ঘশ্মশ্রু, স্বর্গমর্ত্ত্য-জোড়া বর্ষাবল্লম্ দেখিয়া, আনন্দ দূর হইতেই সেলাম্ করিয়া সরিয়া পড়ে। কালিফের উপেক্ষিত শত শত বেগম অনেক দিন হইতেই ইহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। ইহাদের মহলে সুধু নৈরাশ্যের হাহাকার, হৃদয়-বেদনার অশ্রুপাত, হিংসা দ্বেষ ও ষড়যন্ত্র, অন্ধকারের রাজত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। সিন্ধুর জয়ে কি বাগদাদের পরাজয়ে তাহাদের কিছুই আসিয়া যায় না। তাহারা যে তিমিরে, সে তিমিরে! তাঁহার প্রিয়তমা বেগম সুলতানা আমোদ আহ্লাদে নিমজ্জিত থাকিয়াও এত দিন আনন্দ কাহাকে বলে জানিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাণে সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষার বৃশ্চিকদংশন ছিল। একটির জ্বালা জুড়াইতে না জুড়াইতেই অপরটি জ্বলিয়া উঠিয়াছে; সর্ব্বদাই তাহার মন, ইহা না হইলে চলে না—উহা না হইলে চলে না, করিয়াছে; সম্প্রতি এসব জালা দূরীকৃত করিয়া নূতন এক জালা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে; কখন্ কোন্ নূতন সপত্নী আসিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিবে—যে সপত্নীদিগকে স্বামীর উপপত্নী স্বরূপ মনে করিয়া এত কাল তিনি ঘৃণা ও দয়ার চোখে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে তাহাদের সমকক্ষ করিয়া ফেলিবে,—এই ভাবনায় এখন তাঁহার প্রাণের শান্তি তিরোহিত হইয়াছে। আজিকার এই আনন্দ-সংবাদে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, হৃদয় দমিয়া পড়িয়াছে; মাটিতে জানু পাতিয়া বসিয়া উর্দ্ধনেত্রে যুক্ত-করে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন "দয়াময়, যদি আমার সতীন আসিবে, তবে আমাকে তোমার চরণ তলে স্থান দাও!—তার আগেই যেন আমি মরিতে পাই!" স্বামীর আদরে আজ তাঁহার প্রাণ জ্বলিয়া গিয়াছে!

ঐশ্বর্য্য, বিলাস, বৈভব, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, পিতার হৃদয়ভরা স্নেহ, কত বাদশাসম্রাটের বুকভরা প্রেমের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও

কালিফ্-কন্যা জোবেদী কখনো আনন্দের মুখ দেখিতে পা'ন নাই :—প্রণয়ের প্রতিদান না পাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, কত কত নিশি তিনি কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন; আপনার আরাধ্য-দেবতার পদপ্রান্তে পড়িয়া কত গড়াগড়ি গিয়াছেন! আর এখন ত তাঁহার প্রাণে প্রতিহিংসার অগ্নি লোলিহান্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহার সুখ-শান্তি সব পুড়িয়া ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিতেছে! যে আনন্দ-স্রোতে বাগদাদবাসীরা ভাসিয়া চলিয়াছে, তাঁহার প্রাণ সেই আনন্দ-স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, সুধু আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছে! "কাশেমের গৌরবে বাগদাদ্‌বাসীর এত আনন্দ কেন? কালিফের এত স্ফূর্ত্তি কেন? কাশেম তাহাদের কে?—কাশেম আমার কি? আমার আনন্দ হইবে কেন? মর্জ্জিণার কাশেম—আনন্দ তাহার। না, তাহারই বা হইবে কেন?—আমি জ্বলিব, আর সে হাসিবে?—না, না—তাহাকেও জ্বলিতে হইবে।"

দেখিলাম সর্ব্বত্রই আনন্দ!—আনন্দ নাই, সুধু কালিফের হারেমে। বন্দিনী মর্জ্জিণার কক্ষে?—ভাল একবার দেখিয়া আসা যাউক্।

গালে হাত দিয়া মর্জ্জিণা বসিয়া ভাবিতেছেন, "আমার ম'র্‌তে দুঃখ হ'বে কেন? কাশেম আমায় ভালবাসে; আমার মরণ—ভালবাসার মরণ। এতে অনন্ত সুখ জোবেদি, অনন্ত সুখ! আমার প্রাণেরই সুধু তুমি বাদী হ'তে পারো, সুখের আমার তুমি কোনো বাদই সাধ্‌তে পার না। প্রাণে আমার অনন্ত শান্তি—তুমি মার্‌বে, আমি হেসে হেসে মর্‌বো—তা'র তুমি কি কর্‌বে? আমি জানি কাশেম সুধু আমারই,—আমি ম'লেও তুমি তাকে পাবে না।"

এমন সময় তাহার আহার্য্য লইয়া জোবেদীর বাঁদী নেহার আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, বলিল "খাবার এনেছি, মর্জ্জিণা বিবি।"

"রেখে যাও।"

থালা রাখিয়া বাঁদী কহিল "না খেয়ে না খেয়ে শরীব তোমার একেবারে আধখানা হ'য়ে গেছে যে ! তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়, বিবি ।"

ফিরিয়া চাহিয়া মর্জ্জিণা উত্তর করিলেন "না, না, কষ্ট হ'বে কেন ? আমার দুঃখ কি ? কাশেম আমায় ভালবাসে : সেই ভালবাসার জন্য জোবেদী আমায় হিংসা করে ! এতে সুখ, খুব সুখ, নেহার । তোমার কষ্ট হ'বে কেন ?"

বাঁদী অগ্রসর হইয়া চুপি-চুপি কহিল "শুনেছ বিবি, সিন্ধুজয় হয়েছে, তোমার স্বামীর নামে ধন্য ধন্য পড়েছে !"

ত্রস্ত আসিয়া নেহারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া গদ-গদ কণ্ঠে কাশেম-প্রিয়া কহিলেন "বল, নেহার, আবার বল ; কাশেম আমার কি করেছে । খোদা, খোদা !" তার পর কণ্ঠ হইতে হার খুলিতে খুলিতে বলিলেন "আজ আমি বন্দিনী নেহার ! যে সংবাদ দিলে, তার উপযুক্ত বখ্‌সিস্ দিতে পারি, এমন আমার সাধ্য নাই ! ধর, এই হার লও—এটি কাশেম আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল ।"

নেহারের চক্ষু ছল্‌-ছল্‌ করিতেছে ; মাটির দিকে চাহিয়া সে বলিল "না, হারে আমার কাজ নাই ! তোমায় যে সুখী কর্‌'তে পেরেছি, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার ! সাজাদীর জ্বালায় একটি দিনও তোমায় মিষ্টি কথা বল্‌'তে পারি নি !"

তাহার হাত ধরিয়া মর্জ্জিণা কহিলেন "আমার জন্য তুমি দুঃখিত হ'য়োনা, নেহার । আমার কপাল মন্দ ; সাজাদীর দোষ কি ? আমার স্বামী দেখে তা'রও মনে ঈর্ষা হয়, এ ত আমার গৌরবের কথা ! তুমি হার লও, নইলে আমি দুঃখিত হ'বো ।" বলিতে বলিতে হার তিনি তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন । ঠিক এমনি সময়ে সাজাদী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন ! কঠোর কটাক্ষ করিয়া তিনি কহিলেন "বলি, এ

আবার কিসের অভিনয় হ'চ্ছে ? এত আনন্দ কেন মর্জ্জিণা ? কাশেম সিন্ধু জয় করেছে ?—তোর কি ? বাঁদী তুই, বন্দিনী তুই, আজ বাদে কাল তোকে ম'র্‌তে হ'বে—তোর প্রাণে আবার আনন্দ কেন ?"

মর্জ্জিণার মুখ-মণ্ডল এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে ; ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ভুলিয়া গরিমার সঙ্গে তিনি উত্তর করিলেন, "শোন নি তুমি সাজাদি, কাশেম আমার সিন্ধু জয় করেছে ? কাশেম আমার—!"

ক্ষিপ্রপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া, হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া জোবেদী কহিলেন "কেবল কাশেম আমার, কাশেম আমার !—তোর কি ? তুইত' বাঁদী ! সাজাদী আমি, কাশেম আমার—সিন্ধু জয় করেছে, সে গৌরব আমার। তোর আনন্দ হ'বে কেন ?"

তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই নেহার পলায়ন করিয়াছিল। মর্জ্জিণা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

জোবেদী আবার কহিলেন "তোর ম'র্‌বার দিন ঘুনিয়ে এসেছে, মর্জ্জিণা ?"

"জানি।"

"তবে এত আনন্দ কেন ?" বিস্মিত হইয়া জোবেদী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

"আনন্দ কেন ?" ধীরে ধীরে মর্জ্জিণা উত্তর করিলেন "শোন সাজাদি, আনন্দ কেন। কাশেম আমার শরীরের নয়, আমার আত্মার। তুমি আমার শরীর মার্‌তে পা'বে ; আমাকে পা'বে না—আত্মা আমার কাশেমের সঙ্গে সঙ্গেই ফির্‌বে, ঘুর্‌বে। যেখানে কাশেম যা'বে, সেখানেই যা'বে ;—তা'র সঙ্গে হাস্‌বে, তা'র সঙ্গে কাঁদ্‌বে। তখন আর কেউ বিচ্ছেদ জন্মা'তে পার্‌বেনা। তবে আমার আনন্দ হ'বেনা কেন ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জোবেদী কহিলেন "তোর আত্মা কাশেমের সঙ্গে ফিরবে, ঘুরবে?—অসম্ভব! তোর আত্মা কোথায়? বাঁদীর আবার আত্মা! শেয়াল কুকুরের আবার আত্মা!" হো-হো-শব্দে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। "থাকে যদি, ঘোরে যেন; তা'তে আমার আপত্তি নেই। কাশেম ত' দেখতে পা'বে না!" দরজা বন্ধ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।—দেখিলাম, আনন্দ কোথায়।

--o--

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গ-অধিকার।

আজ প্রায় দুইমাস হইতে চলিল, কাশেম দুর্গ বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু এখনো দুর্গ-বাসিনীরা যে আত্ম-সমর্পণ করিবেন, এমন কোনো আশার কারণ উপস্থিত হয় নাই। যত দিন যাইতেছে, ততই সেনাপতি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে—ক্রমেই তাহারা অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে; লুট্‌তরাজ করিতেই এই সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া তাহারা আসিয়াছে, বসিয়া থাকিবার জন্য ত' আসে নাই। একটা দুর্গের জন্য এত কেন? এত দিন কত রাজার রাজ্য জয় হইয়া যাইত, কত ধন-দৌলতে তাহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ হইত!

আরো দু' একবার কাশেম দুর্গ আক্রমণ করিলেন—কিন্তু ফল সেই একই রকম লাভ হইল। নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়া সৈন্যরাও এখন আর আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না।

একদিন কাশেম রহিমখাঁকে ডাকিয়া বলিলেন "খাঁ সাহেব, দাহিরের পরাজয়-সংবাদ পেয়ে কালিফ্‌ ভারি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা, সিন্ধু

জয়ের পরে, দেশে ফিরে না যেয়ে আমরা হিন্দুস্থানটাকেই অধিকারের চেষ্টা করি—”

বাধা দিয়া রহিম্ কহিলেন “আগে এই দুর্গটাই জয় ক'রে নি!”

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সেনাপতি উত্তর করিলেন “সে আশা, দেখ্‌চি, সুধু বিড়ম্বনা মাত্র হ'য়ে দাঁড়ালো! আজ কত দিন ঘিরে ব'সে আছি, কত চেষ্টা ক'র্‌লেম্; কিন্তু নিজেদের সৈন্য ক্ষয় ব্যতীত তাঁদের ত' কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লেম্‌না! রাণীর বুদ্ধি ও বীরত্ব প্রশংসার জিনিষ বটে! হিন্দুস্থানের স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক নয়, দেবী; হিন্দুস্থান্ পৃথিবীর নয়, স্বর্গের! এখানে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার ক'র্‌তে হ'বেই—জাহান্নম হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের জন্য নয়! বেঁচে থাকি যদি, একবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো।”

রহিম্ হাসিলেন “সে ত' পরের কথা, এখনকার কর্ত্তব্য কি? আর ত' সৈন্যদের মানিয়ে রাখা যায় না!”

অনুচ্চস্বরে কাশেম কহিলেন “কৌশল অবলম্বন ক'র্‌তে হ'বে। তাই পরামর্শের জন্য আপনাকে ডেকেছি। এখান হ'তে শিবির উঠিয়ে চ'লে যাবার ভাণ ক'রে নিকটেই কোনো এক জায়গায় যেয়ে দু'চারদিন যদি আমরা লুকিয়ে থাকি, রাণী, বোধ হয়, তা' হ'লে বেরিয়ে প'ড়বেন। তখন হঠাৎ এসে আক্রমণ করা যা'বে। আপনার মত কি?”

গম্ভীর ভাবে খাঁ সাহেব উত্তর করিলেন “আমি ত' চিরকালই ব'লে আস্‌চি, এমন সুরক্ষিত শত্রুর সঙ্গে কৌশল ছাড়া কাজ হ'বে না।”

তখন ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া মাল-পত্র সরান হইতে লাগিল। চারি পাঁচ দিন পরে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন।

রাণীপ্রমুখ দুর্গবাসিনীগণ যবনের এই চঞ্চল অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন; তাঁহারা মনে করিলেন, অল্প কিছু সৈন্য দুর্গ পাহারা দিবার জন্য রাখিয়া,

সেনাপতি হয়ত অন্য কোনো স্থান জয় করিতে যাইবে। রসদাদি ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল; তাঁহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু ইহা দেখিয়া তাঁহাদের মনে একটু আশার স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; তাহারা ভাবিলেন, শত্রুসংখ্যা কমিয়া গেলে আহার্য্য সংগ্রহ করা তত কঠিন হইবে না।

যবন-শিবির প্রায় শূন্য হইয়াছে; রাণী অমলা, কৃষ্ণা প্রভৃতি বসিয়া বসিয়া ইহাদের গতিবিধি দেখিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। বিমলার উপর রসদের ভার ছিল; সেদিনের মত আহার্য্য পরিমাণ করিয়া দিতে যাইয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—যাহা আছে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ পচিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে! ত্রস্তপদে শঙ্কিত মনে আসিয়া জননীকে তিনি এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তাঁহার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া রাণী শুধু কহিলেন "বিমল!—" কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন "একেবারেই প'চে গেছে?"

বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "যা আছে, তা'তে, টেনে খেলে, আর বড় জোর এক হপ্তা যেতে পারে।"

হাঁফ্ ছাড়িয়া রাণী কহিলেন "এক হপ্তা?—যা'ক্; এর মধ্যে যবন স'রেও প'ড়্তে পারে।"

রাণীর দুর্গরক্ষা-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য রাজা দাহির যে পঞ্চাশ-ষাট জন সৈন্য রাখিয়াছিলেন, এত দিন রাণী তাহাদিগকে কোনো কাজেই আহ্বান করেন নাই—'সঞ্চিত মালের' মত ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। আজ তাহাদিগকে ডাকিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন "রসদের অভাবেই বুঝি, এত কষ্টের পরেও, যবনের হাতে দুর্গ ছেড়ে দিতে হ'লো! ম'র্তে ত' হ'বেই, তবু শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্তে হয়। এখন তোমরা কাজ কর। যবন-শিবিরে আর

বেশী সৈন্য নেই। আজ রেতে তোমরা বেরিয়ে দেখ, খাদ্য সংগ্রহ ক'র্‌তে পার কিনা। নতুবা আর ভরসা নেই।" অভিবাদন করিয়া সৈন্যগণ বিদায় হইল।

বিমলা কহিলেন "মা, আর দু' একদিন দেরী ক'রে, বেরুলে হ'তো না?"

রাণী উত্তর করিলেন "না, একদিনেই যে জুট্‌বে, এমন ত' নিশ্চয়তা নেই। ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ হ'বার আগে থেকে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।"

যখন তাহারা এই বন্দোবস্ত করিলেন, তখন বেলা প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে। দ্বিপ্রহরের পর হইতে যবন-শিবিরে হৈ-চৈ, চলা-ফেরা, জিনিষপত্র টানাটানি, একদম্ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শিবিরে এখনো দুইশতের উপর সৈন্য রহিয়াছে; কাশেম্ স্বয়ং রহিয়াছেন। আর বাকী সৈন্য লইয়া রহিম্ খাঁ অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের অন্তরালে যাইয়া আড্ডা করিয়াছেন।

শত্রু-শিবিরের এই নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করিয়া রাণী অনেকটা আশান্বিতা হইলেন; কৃষ্ণাকে ডাকিয়া বলিলেন "ভবানীর আশীর্ব্বাদে যবন প্রতিবন্ধকতা ক'র্‌লেও বোধ হয়, আমাদের সৈন্যগণ আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে দুর্গে ফির্‌তে পার্‌বে।"

কৃষ্ণা উত্তর করিলেন, "সম্ভবতঃ। আমিও একবার ওদের সঙ্গে বাইরে যা'বো।"

রাণী কহিলেন "যুদ্ধ বাধে যদি?"

নিতান্ত সহজভাবে উত্তর হইল "বাধ্‌বে; আমরা প্রস্তুত হ'য়েই যা'বো।"

বিমলা সভয়ে কহিলেন "ও পিশিমা, শেষে যবন তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে!"

কৃষ্ণা উত্তর করিলেন "আমার জন্য তোদের ভাব্‌তে হ'বে না মা। কৃষ্ণার হাতে তলোয়াড় থাক্‌তে কা'রো সাধ্য নেই তা'র কেশস্পর্শ করে। যখন ম'র্‌তে হ'বে, আমি যুদ্ধেই ম'র্‌বো।"

অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রাণী কমলাবতী কহিলেন "বিমল, তুই একবার অমল্‌কে ডেকে নিয়ে আয় দেখি।" তারপর কন্যা চলিয়া গেলে, কৃষ্ণাকে ব'লিলেন "সর্ব্বনাশের জন্য সব সময়ই প্রস্তুত হ'য়ে থাকা ভাল। বিশেষতঃ, দু'দিন আগেই হোক্ আর দু'দিন পরেই হোক্, ম'র্‌তে আমাদিগকে হ'বেই। বাবা ব'লে গেছেন, আগুনে পু'ড়ে মরিস্।—এখনি চিতাগুলো প্রস্তুত ক'রে রাখি, কি জানি, তোমরা বাইরে গেলে, যবনের সঙ্গে যদি যুদ্ধ বাধে, সে সময়ে সেই গোলযোগের মধ্যে কোন্ দিক্ দিয়ে যবন এসে ঢু'কে প'ড়্‌বে ?"

কৃষ্ণা উত্তর করিলেন "ক'রে রাখাই ভাল; আর সবাইকে ব'লে ক'য়ে প্রস্তুত ক'রে রাখাও উচিত।"

বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন ভাবে রাণী কহিলেন "বিমল্‌কে নিয়েই ভাবনায় পড়েছি! যে প্রাণের মমতা ওর!"

এমন সময়, অমলা ও বিমলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অমলা বলিলেন "মা আমায় ডেকেছ কেন ?"

ধীরে ধীরে রাণী উত্তর করিলেন "আজ চিতা সব সজ্জিত ক'র্‌তে হবে।"

বিমলা চমকিয়া উঠিলেন "কিসের চিতা!"

রাণী হাসিয়া বলিলেন "পু'ড়ে ম'র্‌তে হ'বে ব'লে।"

কন্যা আবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "জীয়ন্ত!"

রাণী আবার হাসিলেন "হাঁ, জীয়ন্ত। তোকেও ত ম'র্‌তে হ'বে; পার্‌বিনে ?"

অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া বিমলা কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরাও ম'র্‌বে ?—সব্বাই ?"

"হাঁ, সব্বাই। কে যবনের হাতে প'ড়ে মান খোয়াবে? তারপর, মান দিয়েও ত' প্রাণ বাঁচ্‌বে না। শুনোছস্‌ ত' কেমন অত্যাচার ক'রে দেবলটাকে ওরা শ্মশান করেছে! কলির রাক্ষস ওরা!"

বিমলা কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন।

অমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "আজই যে মা?"

রাণী তাহাকে সকল বুঝাইয়া বলিলেন। কন্যা কহিলেন "হাঁ, তাই ভাল। তবে, চল এখুনি সব ঠিক করে রাখিগে।"

তখন সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বিমলা এখনো মুখে হাত দিয়াই বসিয়া রহিয়াছেন। অমলা তাহার হাত ধরিয়া ডাকিলেন "আয় বিমল, উঠে আয়। ম'র্‌তে অত ভয় কেন? যমের কাছ থেকে ত আর মৌরসী পাট্টা নিয়ে আসা হয় নি: দুদিন আগে আর পরে;—যেতে হবে সব্বাইকেই।" কাতর ভাবে চাহিয়া বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন দুর্গবাসিনী রমণীদিগকে ডাকিয়া রাণী আপনার সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। যবনের অত্যাচারের কথা সকলেই জানিতেন; মরিতে হইবেই, ইহাও সকলেরই জানা ছিল।—কিন্তু সে কোন্‌ ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহার কোনো স্থিরতা ছিল না। এখন যাই রাণীর মুখে আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনিলেন, অমনি তাহাদের মনে হইল, যম যেন তাহার সেই আকাশ-পাতাল জোড়া বিরাট হা লইয়া, সশরীরে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! তাহারা শিহরিয়া উঠিলেন; মা সন্তানকে বুকে আকড়িয়া ধরিলেন; বয়স্ক ছেলেমেয়েরা জননীর অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভাই ভগিনীকে জড়াইয়া ধরিল! অমলা বুঝাইয়া কহিলেন "আজই যে মরিতে হইবে, কি একান্তই যে মরিতে হইবে, এখনো তাহার নিশ্চয়তা নাই। তবে প্রস্তুত হইয়া থাকা ভাল। মুসলমান যে কেমন

অত্যাচার করেছে, মার সম্মুখে সন্তানকে আছাড়িয়া, সন্তানের সম্মুখে জননীর হস্তপদ ছিন্ন করিয়া, যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে নানা-ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া, মারিয়াছে, তাহা তোমরা সকলেই জান! এমন মরার চাইতে আগুণে ভস্ম হওয়া কি শতসহস্রগুণে বাঞ্ছনীয় নয়?—উপায়ান্তর নাই: মরণ যখন অবধারিত, তখন সম্মানে মরাই কর্ত্তব্য।" সকলেই রাণীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যার মধ্যেই অসংখ্য চিতা সজ্জিত হইল।

বিমলা এখনো আপন কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অমলা তাহাকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন 'আমি এখন ম'র্‌বো না।'

তাড়াতাড়ি কনিষ্ঠা বলিয়া উঠিলেন "ম'র্‌বিনে? শেষে যে যবন ধরে নিয়ে অত্যাচার ক'র্‌বে!"

ধীর গম্ভীরভাবে জ্যেষ্ঠা উত্তর করিলেন "ধরা আমি ইচ্ছা করেই দেবো। তবে, লক্ষ যবন এলেও তা'দের সাধ্য হবে না যে, আমার উপর অত্যাচার করে।"

তাড়াতাড়ি বিমলা কহিলেন, "তবে আমিও ম'র্‌বো না।"

"কেন বেঁচে থাক্‌তে চা'স?—কোন্ সুখের আশায়?"

"তুই বাঁচ্‌বি কেন?"

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অমলা উত্তর করিলেন "প্রতিশোধ নেবো ব'লে।

—তুই পার্‌বি?"

ভগ্নীর দিকে দীন দৃষ্টিপাত করিয়া বিমলা কহিলেন "তোর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বো। তুই বলে দিস্ কি কর্‌তে হ'বে!"

"বলে দিলে পার্‌বি?"

ধীরে ধীরে বিমলা উত্তর করিলেন "পার্‌বো।"

অমলা কোমর হইতে দুই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া কনিষ্ঠার হাতে দিয়া কহিলেন "তবে এদের সাবধানে লুকিয়ে রেখে দে; একটি

প্রতিহিংসা পূরণের জন্য; অপরটি আত্মহত্যা ক'রে বংশের মান বাঁচাবার জন্য।" বিমলা আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া হাঁফ্ ছাড়িলেন।

চিতা সব প্রস্তুত হইল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, আপনার দল-বল লইয়া রাণী আসিয়া প্রাচীর-শিরে বথাস্থানে উপবেশন করিলেন। কৃষ্ণা বাহিরে যাইবেন, কাজেই দুর্গের পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিবার ভার বিমলার উপর সংন্যস্ত হইল। রাণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া ও সঙ্গিনী রমণীদিগকে সতর্ক করিয়া আসিলেন—সৈন্যগণ আহার্য্য সংগ্রহার্থ বাহিরে গেলে যবনের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ বাধিতে পারে; তখন সেই চিত্ত-বিক্ষেপক গোলযোগের সুযোগ ধরিয়া অতর্কিতে আসিয়া হয়তঃ মুসলমান্ দুর্গ অধিকারের চেষ্টাও করিতে পারে। অমলাকে ডাকিয়া কহিলেন "প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তারা উপরে আস্‌তে পারে, না পারে, সে পরের কথা। যাই যবন পরিখা পার হবে অমনি যেন সকল চিতায় আগুন দেওয়া হয়।" এই সকল কার্য্য সমাধা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া আসিল। তখন কৃষ্ণাকে লইয়া রাণী নীচে অবতরণ করিলেন। সৈন্যগণ পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত হইয়া বসিয়াছিল। দেখিয়া অভিবাদন করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া বলিল "মা, এখন আমরা বেরিয়ে পড়্‌বো কি?" রাণী উত্তর করিলেন; "হাঁ, ভবানীর নাম করে তোমরা বের হও। ইনিও তোমাদের সঙ্গে যা'বেন।" বলিয়া, কৃষ্ণাকে দেখাইয়া দিলেন।

বিস্মিত হইয়া সৈন্যগণ বলিয়া উঠিল "মা, আপনি যা'বেন কোথা?"

ধীরে ধীরে কৃষ্ণা কহিলেন "চল ত'; শেষে দেখা যা'বে।"

রাণীকে প্রণাম করিয়া, ভবানীর নাম স্মরণপূর্ব্বক, সৈন্যগণ গমনোন্মুখ হইল; কৃষ্ণাকে আলিঙ্গন করিয়া কমলাবতী বাষ্পাকুল কণ্ঠে কহিলেন "বহিন, হয়ত তোমায় আমায় এই শেষ দেখা! যা'কিছু অপরাধ করেছি, ভুলে যাও; আর আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও, স্বামীর সম্মান রেখে যেন মর্‌তে পারি।"

উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া কৃষ্ণা কহিলেন "আমার স্বামীকে ক্ষমা ক'রো।

তখন রাণীর ইঙ্গিতে প্রহরীরা দুর্গের পশ্চিম ফটক ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দে খুলিয়া দিল; এবং বন্ধন-মুক্ত করিয়া ঝুলানো লৌহ-সেতুটি পরিখার উপর ফেলিয়া দিল। কৃষ্ণাকে অগ্রে করিয়া, আবার ভবানীর নাম লইয়া সৈন্যগণ পরিখা পার হইয়া গেল। রাণী আবার ইঙ্গিত করিলেন; লৌহ সেতুটিকে যথাস্থানে রাখিয়া, আবার ফটক বন্ধ করা হইল।

ফটক খুলিবার শব্দে যবন-শিবিরের প্রহরীগণ চমকিয়া উঠিয়া, দুর্গের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহারা দুর্গের দক্ষিণ দিকস্থ ফটকের সোজাসুজি ছিল, কাজেই কিছু দেখিতে পাইল না, কিন্তু সেনাপতিকে যাইয়া সংবাদ দিল। কাশেম বাহিরে আসিলেন; দুর্গের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আসিবার জন্য কয়েকজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। পশ্চিম দিকের লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, হিন্দু-সৈন্য বাহির হইয়াছে। তখন কাশেমের ইঙ্গিত পাইয়া অশ্বারোহী সৈন্যগণ সেই দিকে অগ্রসর হইল। তখন তিনি ভীষণ শব্দে পাহাড়-পর্ব্বত কম্পিত করিয়া ঘন-ঘন তূর্য্য-ধ্বনি করিতে লাগিলেন; রুস্তমের কাণে সেই শব্দ যাইয়া পঁহুছিল। অবিলম্বে সসৈন্যে তিনি রওনা হইলেন।

কৃষ্ণাকে বিদায় দিয়াই রাণী উপরে আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। কাশেমের তূর্য্য-নিনাদ শুনিয়াই বুঝিলেন, এখনই যুদ্ধ বাধিবে। সকলকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়া, আবার আসিয়া তিনি স্বস্থানে দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্ত পরেই হিন্দু-যবনের জয়-ধ্বনি ও অস্ত্রের ঝন্-ঝনায় তিনি জানিতে পারিলেন, আপনার সৈন্যদিগের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে।

পরিখা পার হইয়া কৃষ্ণাপরিচালিত সৈন্যগণ পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই যবনের তূর্য্য-নিনাদ শুনিতে পাইল; তাহারা অস্ত্রে হাত দিয়া চলিতে লাগিল। ক্ষণপরেই দক্ষিণ দিক্ হইতে অসংখ্য

অশ্বপদ-শব্দ আসিয়া তাহাদের কাণে পৌঁছিল। তূর্য্যধ্বনি শুনিয়া তাহারা একটি পাহাড় শীর্ষে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অশ্বারোহিগণ দৃষ্টি-পথে আসিতে না আসিতে তাহারা বাইয়া অনেক দূর উঠিয়া পড়িল। যবন যখন তীরের সীমার মধ্যে আসিয়া পঁহুছিল, কৃষ্ণা তখন উদ্দীপ্ত ভাবে ডাকিয়া কহিলেন "ওই দেখ, অগণ্য যবন আমাদের অভ্যর্থনার জন্য এ দিক্ পানে আস্‌চে; আবার ওই দেখ, আকাশে ভগবান চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মৃত বীরপুরুষরা কেমন প্রসন্ন মুখে আমাদের দিকে হাস্‌চেন! ছোড়, তীর ছোড়। যবনের রক্তে তাঁদের তর্পণ কর।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর যাইয়া যবন সৈন্যদিগের উপর পড়িতে লাগিল। চোখে মুখে আহত হইয়া তাহাদের অশ্বগুলি আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। যবনও তীর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু হিন্দুগণ বৃক্ষের পশ্চাতে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডের অন্তরালে, রক্ষিত হইয়া যুঝিতেছে; শত্রুর বর্ষণে তাহাদের বিশেষ কোনো অনিষ্ট হইতেছে না। এ দিকে, দু চারিটি করিয়া যবন ও অশ্ব পড়িতেছে! তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন সময় রহিমখাঁর সৈন্যসামন্ত লইয়া ও তাহাকে সঙ্গে করিয়া কাশেম আসিয়া ইহাদিগের সঙ্গে যোগ দিলেন। অবস্থা বুঝিয়া কাশেম রহিমখাঁকে বলিলেন "কতক সৈন্য নিয়ে আমি এখানে এদের সঙ্গে বোঝাপড়া কর্‌তে থাকি। বাকী সৈন্য নিয়ে আপনি যেয়ে পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ, সকল দিক, দিয়ে দুর্গ আক্রমণ করুন। এই যুদ্ধের জন্য নিশ্চয়ই এখন তা'রা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। আপনি খুব সন্তর্পণে চ'লে যান্।" বারো আনা পরিমাণ সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া খাঁ সাহেব সরিয়া পড়িলেন।

কাশেমের উত্তেজনায় দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া সৈন্যগণ যুঝিতে লাগিল! প্রাণপণে তাহারা পর্ব্বতারোহণের জন্য অগ্রসর হইবার চেষ্টা

করিতে লাগিল। দুটি একটি করিয়া তাহারা পড়িতেছে ; কিন্তু সেদিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই ; অশ্ব অগ্রসর হইতে চাহে না—তাহারা ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিল। এই ভাবে অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল—ক্রমে কাশেম একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ক্রমাগত বাণ বর্ষণে বাণ বর্ষণে হিন্দু সৈন্যগণ শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণার উৎসাহ ও উদ্দীপনার বিরাম নাই—তাঁহার বাহুতে আজ অসীম বল, হৃদয়ে আজ মদোত্তেজনা! অনেক সৈন্যক্ষয়ের পরে কাশেম আসিয়া শেষে পাহাড়ে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। আসন্ন বিপদ দেখিয়া হিন্দুগণ আবার নূতন উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল—এবার আর তীর নিক্ষেপ নহে—ভীমবলে, যবনের আরোহণ পথে তাহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। সেই চাপে পড়িয়া অনেক যবনসৈন্য হতাহত ও নিষ্পেষিত হইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে, অনেক সৈন্য হারাইয়া, অনেক কষ্টের পরে, কাশেম যাইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তখন উভয় পক্ষে বর্ষা-বল্লমের ও তরবারি চালনার রক্ত পরীক্ষা চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত হইল; পর্ব্বত-গাত্র বহিয়া শোণিত ঝরণা কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল! অকস্মাৎ রণ-রঙ্গিণীর ন্যায় অসি ঊর্দ্ধ উত্তোলিত করিয়া কৃষ্ণা কাশেমের সম্মুখে আসিয়া ডাকিয়া উঠিলেন "এসো সেনাপতি, তোমারই আমি চাই।" বিদ্যুৎ চমকাইয়া তাঁহার অসি নিম্নে অবতরণ করিল। কিন্তু ক্ষিপ্রহস্ত কাশেমের তরবারির আঘাতে নিমেষের মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সমেত অসি ভূতলে পড়িয়া গেল। ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, কৃষ্ণা বামহস্তে বর্ষা উত্তোলন করিলেন, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা ছুটিয়া পড়িতেছে! কিন্তু তাঁহার বর্ষা নিক্ষিপ্ত হইতে না হইতেই কাশেমের তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। যবন-সৈন্য আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠিল। হিন্দু

বীরগণ হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই যুদ্ধ-স্থান হিন্দুশূন্য হইয়া গেল। বিশ্রাম করিতে না দিয়াই আবার কাশেম সেই বিজয়-দৃপ্ত রণোন্মত্ত সৈন্যদল লইয়া দুর্গাভিমুখে রওনা হইলেন।

এ দিকে কাশেমের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রহিম খাঁ এক সঙ্গে পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ তিন দিক্ দিয়াই, পরিখা পার হইবার জন্য নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুর্গবাসিনীগণ, অনন্যমনাঃ হইয়া, যাহারা পারিতেছিলেন, যুদ্ধ দেখিতেছিলেন: আর যাহারা দেখিতে পাইতেছিলেন না, তাহারা উদগ্রীব ভাবে দাঁড়াইয়া—বসিয়া, অস্ত্রের ঝন্-ঝনা, শত্রু-মিত্রের চিৎকার-আহ্বান শুনিতেছিলেন। রাণী কমলাবতীর পুনঃ পুনঃ সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তাহারা আপনাদের বহির্ভাগে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছিলেননা; যাহারা প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল, তাহাদের অবস্থাও তথৈব। কাজেই অলক্ষিত ভাবে রহিমখাঁর সৈন্যগণ পূর্ব্বপশ্চিম দুই দিকে প্রায় পরিখা-প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু দক্ষিণ দিকে তাহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই রাণীর দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল। তিনি শঙ্খ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; পূর্ব্ব পশ্চিমে বিমলা ও অমলা সেই ধ্বনি শুনিয়া জানিতে পারিলেন, দক্ষিণ দ্বারে যবন আসিয়াছে। বাহিরে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে: দ্বারেও আবার শত্রু আসিয়া উপস্থিত—বিমলা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; তাঁহার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার সৈন্যদলও ভীত-উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু আপনার দিক্‌টি কেমন আছে, জানিবার জন্য অমলা তৎক্ষণাৎ বাহিরে চাহিলেন!—সবিস্ময়ে দেখিলেন, এদিকেও শত্রু অদূরে! তিনিও শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন দক্ষিণ পশ্চিমে হিন্দু-রমণী ও যবন-বীরের মধ্যে শ্রাবণের ধারার মত তীরের খেলা চলিতে লাগিল। দুর্গ হইতে অবিরল বাণ বর্ষণের চোটে যবন সৈন্য আর পরিখা 'পর্য্যন্ত' আসিয়া পঁহুছিতে পারিল না। এদিকে, পূর্ব্বদিকের দল নির্ব্বিঘ্নে

যাইয়া পরিখার উপর কাষ্ঠের সেতু ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়, জনৈকা রমণী তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া 'শত্রু, শত্রু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। প্রথমটায় বিমলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; কিন্তু পরক্ষণেই উঠিয়া সবলে তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ততক্ষণে যবন সেতু ফেলিয়া,পার হইবার উপক্রম করিতেছিল; উপর হইতে তীরবর্ষণে তাহাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না।

রহিম খাঁ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিন ভাগের কার্য্যই দেখিতেছিলেন। দক্ষিণ পশ্চিমে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছে: রমণীদিগের তীরে আহত হইয়া দু'একটি করিয়া যবন সৈন্য পড়িতেছে—কিন্তু আজ তাহাদের সংখ্যা অগণিত। মরিতে মরিতেও তাহারা পরিখার অভিমুখে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ, জীবনমরণ পণ করিয়া পরিখা পার হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়া খাঁসাহেব আবার পূর্ব্বদিকে আসিলেন; তখন, তাঁহার সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ কাষ্ঠ সেতু আরোহণের চেষ্টা করিয়া উপর হইতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর ও ইষ্টকের তাড়নায় হতোৎসাহ ভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছিল। তিনি আসিয়া আবার তাহাদিগকে সেতু পার হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে আদেশ করিলেন; এবং তড়িদ্বেগে অশ্ব চালাইয়া যাইয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্ হইতে কতক সৈন্য আনিয়া ইহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। নবীন উৎসাহে আবার যবন, সেতু আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। দুর্গ হইতে আবার মুষলধারে প্রস্তর-ইষ্টক বর্ষিত হইতে লাগিল; অনেক যবন হতাহত হইয়া জলে স্থলে পড়িয়া গেল, কিন্তু এবার তাহারা পরিখা পার হইয়া আসিল! এখনো উপর হইতে ভীষণ বেগে সেই নৈসর্গিক অস্ত্র তাহাদিগের উপর বর্ষিত হইতেছে—কিন্তু কিছুতেই তাহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মরিতে মরিতেও, দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাণী ও অমলার নিকট সংবাদ গিয়াছে, যবন পরিখা পার হইয়াছে। অমনি

পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত অনুসারে সকল চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হইল। কিন্তু এখন আর এদিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। রমণীগণ তীর ত্যাগ করিয়া অবিরল ধারে প্রস্তর-ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উন্মাদিনীর ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাণী সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে, অসংখ্য হতাহতের মধ্যদিয়া সমস্ত যবন-সৈন্য পরিখা পার হইয়া আসিল; কিন্তু নীচে তাহারা মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিতেছে না; কাহারো হাত ভাঙ্গিতেছে, কাহারো পা ভাঙ্গিতেছে, কাহারো মস্তক পিষিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে; কত জন দিশাহারা হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেখান হইতে আর উঠিতে পারিতেছে না। কতবার দুর্গপ্রাচীরে তাহারা মই লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু একটিবারও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ক্রমে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল, রহিম খাঁর উত্তেজনা, তাড়না, সত্ত্বেও পরিখা পার হইয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িল! এমন সময় জয়ধ্বনি করিয়া সবেগে কাশেম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পালায়নোদ্যত মুসলমানদিগের হৃদয়ে আবার নূতন উৎসাহ, নূতন বলের সঞ্চার হইয়া উঠিল। অবিরল প্রস্তর-ইষ্টক-বর্ষণে শ্রান্ত-ক্লান্ত হিন্দু-রমণীরা একেবারে হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তাহারা বুঝিলেন, কৃষ্ণাসহ সকল সৈন্য বিনাশ করিয়া এই দল আসিয়া মিলিত হইল। তখন রাণী সকলকে চিতাগ্নি আরোহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। চিতাগুলি এতক্ষণে ধূধূ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আর আশা নাই; সকলে আসিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া ঊর্দ্ধ নেত্রে যুক্তকরে, অগ্নিদেবের আবাহন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে প্রস্তর-বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে দেখিয়া দলে দলে মুসলমান-গণ অপ্রতিহত ভাবে মই বাহিয়া প্রাচীর-শিরে আসিয়া উঠিতে লাগিল। কাশেম, রহিমও উঠিয়াছেন। স্তব্ধ বিস্মিত হইয়া তাঁহারা "অগ্নি-সম্মুখবর্ত্তিনী রমণীদিগের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে

রাণী কমলাবতী, কন্যাদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া, স্বামীর পদদ্বয় স্মরণ-পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন: আর তৎক্ষণাৎ শিশু-সন্তানদিগকে বুকে করিয়া পুত্রবতীরা, বালিকা যুবতী বৃদ্ধারা, প্রসন্নমুখে, রাণীর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভারতের নিজস্বধন ত্রিলোকবিশ্রুত জহর ব্রতের প্রথম উদ্যাপন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

——o——

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অমলা ও বিমলা।

বিস্ময়ের ভাব কতকটা অপনীত হইলে কাশেম কহিলেন "এরা কি, খাঁ সাহেব?—মানুষ না দেবতা? মানুষ কি এমন ভাবে ইচ্ছা ক'রে ম'র্‌তে পারে!"

ধীরে ধীরে প্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইলেন; হঠাৎ কাশেম স্থির দাঁড়াইয়া, অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন "বাঃ! এরা যে দেবী প্রতিমা!" রহিম কহিলেন "দেবী! দেবীই বটে।" অমলা ও বিমলা নিশ্চল ভাবে মাতৃ চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বঙ্কিম গ্রীবায় তাঁহাদের কার্য্যকলাপ অবলোকন করিতেছিলেন।

কাশেম আর একটু নিকটবর্ত্তী হইলে, আহতগরিমমণ্ডিত মুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া অমলা কহিয়া উঠিলেন "সিন্ধু জয় করেছ, আলোর শ্মশান করেছ; প্রাণে বড় আনন্দ হয়েছে বুঝি? না, সেনাপতি, এ আনন্দ বেশী দিন থাক্‌চে না। আমরা ম'র্‌বো না।"

কাশেম বলিলেন "দেবি, তোমরা আমার বন্দিনী—"

অমনি হা হা হা করিয়া অমলা হাসিয়া উঠিলেন "এমন ক'রেই বুঝি,

সেনাপতি, তুমি বন্দী কর! এই আমার সম্মুখে চিতার আগুন জ্ব'লচে—এই দণ্ডেই আমি ঝাঁপ দিতে পারি; হাতে এই তলোয়ার রয়েছে, ইচ্ছা হ'লে এখনি তোমার মুণ্ড পাত ক'রে ম'র্‌তে পারি"—তিনি তরবারি উত্তোলিত করিলেন; কাশেম, রহিম সরিয়া গেলেন। তখন যুবতী হাসিয়া বলিলেন "কেমন, তুমি আমায় বন্দী করেছ। চল, সেনাপতি, আমরা ইচ্ছা ক'রেই ধরা দিলেম; কি ক'র্‌তে হ'বে বল। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে"

কাশেম বলিলেন "অস্ত্র ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে এসো; তোমাদের দু'জনকে কালিফের নিকট পাঠাবো।"

অমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "কালিফ আবার কে?"

"আমার প্রভু, বাগ্দাদের অধিপতি, দুনিয়ার মালিক।"

কিয়ৎকাল মৌনী থাকিয়া শেষে অমলা কহিলেন "চল।"

তখন কাশেম রহিমখাঁর দিকে চাহিয়া বলিলেন "খাঁ সাহেব, এদের দু'জনকে নিয়ে আপনি শিবিরে যান; দেখ্‌বেন, কেউ যেন এদের কোনো প্রকার অসম্মান কর্‌তে না পারে। জয়লব্ধ ঐশ্বর্য্য ও এদের সঙ্গে ক'রে কালই আপনাকে বাগ্দাদে রওনা হতে হ'বে।" অমলা ও বিমলাকে লইয়া খাঁ সাহেব শিবিরে চলিয়া আসিলেন।

কাশেমের আদেশে সৈন্যগণ দুর্গ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আজ অবারিত-দ্বার; দুর্গে একটি জন-প্রাণীও নাই।

কয়েকজন অনুচর সমভিব্যাহারে কাশেম সমস্ত ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে তিনি আসিয়া ভবানী-শৈল প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার শোভা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, মন্দির ভাঙ্গিয়া এখানে মস্‌জিদ্ বসাইতে হইবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। এক্ষণে তাঁহারই অদৃষ্ট-আকাশের উপর বজ্রগর্ভ মেঘ সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল।

ধীরে ধীরে তিনি যাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; এখানকার কারুকার্য্য দেখিয়া তাঁহার বীরহৃদয় মুগ্ধ হইয়া গেল। নীরবে কতক্ষণ সেখানকার শোভা অবলোকন করিয়া, আবার ধীরে ধীরে তিনি নামিয়া আসিলেন। ক্রমে দুর্গের সকল ঘুরিয়া দেখিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সৈন্যগণ হাঁফ্ ছাড়িল। এতক্ষণ তাহারা শৃগালের মত চলা-ফেরা করিতেছিল, এখন তাহারা সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিল; ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমস্ত চুরমার্ করিতে লাগিল। প্রহরেকের মধ্যেই দাহিরের সমস্ত কীর্ত্তি-কলাপ অতীতের কথায়, শ্মশানের ভস্মে, পরিণত হইয়া গেল। ভবানী-মূর্ত্তির নাসিকা কর্ণ ছেদন করিয়া তাহারা পুষ্করিণী-সলিলে ডুবাইয়া দিল।

পরদিবস প্রাতে অমলা ও বিমলাকে সঙ্গে করিয়া রহিম খাঁ আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন; বাগ্দাদ গমনের উদ্দেশ্যে তাহারা দেবল রওনা হইয়াছেন। কাশেম কালিফের নামে একখানা চিঠি রহিমের হাতে দিয়া বলিলেন "বলিবেন, দু'চারি দিনের মধ্যেই আমি মূলতানের দিকে যাত্রা কর্বো। আমার সেলাম জানাবেন; আর যত সত্বর পারেন, আরো কিছু সৈন্য নিয়ে আপনি ফিরে আস্বেন।"

চুপি চুপি বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদের কোথা নিচ্ছে, দিদি?"

তেমনি স্বরে অমলা কহিলেন "যেখানে ইচ্ছা। তোর ভয় নেই; আমার কথামত চলিস্।" তার পর দুর্গের দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিলেন "আজ জন্মের মত সিন্ধু, তোর কাছে বিদায় নিলেম্। জননী জন্মভূমি, তোর কলঙ্ক যেন ধৌত কর্‌তে পারি; ভবানি, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস্।" রহিমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল;

কাশেম বলিয়া উঠিলেন "আল্লা, আল্লা! তোমার কৃপায় এতদিন পরে আজ আমি সিন্ধু জয় ক'র্‌লেম্। আশীর্ব্বাদ ক'রো, সমস্ত হিন্দুস্থান যেন কালিফের পদানত কর্‌তে পারি।" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন "মর্জ্জিণা আমার কত সুখী হ'বে!" কাশেম শিবিরের বাহিরে আসিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অমলার কলঙ্ক।

রহিম খাঁর সঙ্গে অমলা ও বিমলাকে পাঠাইয়া দিবার সপ্তাহ পরে কাশেম আবার যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সিন্ধু-জয়ের পরে, তাঁহার নামে, হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজাদিগের মনে একটা মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। প্রায় অপ্রতিহত ভাবেই গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ, নগরের পর নগর, বিধ্বস্ত করিতে করিতে এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার রক্তে লোহিত নদী প্রবাহিত করিয়া, অবশেষে তিনি যাইয়া মুল্‌তানের দুর্গদ্বারে হানা দিলেন। রাজা, রাজপাট কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রাণপণে রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিয়া, বহু যবন-সৈন্য বিনষ্ট করিয়া, মুলতানরাজ সবংশে নিহত হইলেন। দুর্গ-শিরে শশাঙ্ক-লাঞ্ছিত মুসল্‌মানের বিজয়-নিশান সগৌরবে উড়িতে লাগিল। অনেক সৈন্যক্ষয় হইয়াছে; বাগদাদ হইতে নূতন সৈন্য আসিবার অপেক্ষায় কাশেম মুল্‌তানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন

এ দিকে, যে দিন কাশেম মুলতান-দুর্গ জয় করেন, ঠিক সেই দিন প্রভাতে অমলা ও বিমলাকে লইয়া রহিম খাঁ বাগ্‌দাদ্ দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কালিফ্ তখন সুল্‌তানা-বেগমের মহলে প্রেমের অভিনয় করিতেছিলেন।

তাঁহার অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ-উদ্যানে অমলা ও বিমলাকে স্থান দেওয়া হইল। সুবৃহৎ পুষ্করিণীর উত্তর তীরে একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ তাঁহাদের জন্য সম্প্রতিকের মত নির্দ্দিষ্ট হইল। এ কয়দিন ভগিনীদ্বয় ফলমূলব্যতীত কিছুই আহার করেন নাই; আজও তাহাই করিলেন।

আহারান্তে তাঁহারা একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অমলার মুখে দিব্য প্রশান্ত ভাব; জনক জননীর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ও আপনাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া বিমলা একেবারে ম্রিয়মানা হইয়া পড়িয়াছেন। জ্যেষ্ঠা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "যা বলেছি, তা' ক'র্‌তে হ'বে কিন্তু। সাবধান।"

কনিষ্ঠা কাতর ভাবে উত্তর করিলেন "বড় ভয় কচ্চে!"

বিরক্ত ভাবে অমলা কহিয়া উঠিলেন "আশ্চর্য্য, এখনো আবার ভয়! কিসের ভয়? আমাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ্‌ দেখিন্। রাজার মেয়ে হ'য়ে আজ আমরা যবনের বন্দিনী! এই যবন আমাদের সিন্ধু কলঙ্কিত করেছে; বংশে কালি দিয়েছে; দেব ধর্ম্ম নষ্ট করেছে; আলোর শ্মশান করেছে: আমাদিগকে পিতৃ মাতৃ-হীনা করেছে। মনে হ'লেই যে, আমার বুক্ জ'লে' যায়!—"

এমন সময় একজন বাঁদী আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল "কালিফ্‌ দেখা ক'র্‌তে আস্‌চেন!"

অমলা উত্তর করিলেন "আস্‌তে ব'লো গে।"

বাঁদী চলিয়া গেল; জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিলেন "কালিফ্‌কে যা' ব'ল্‌তে হয় আমি ব'ল্‌বো।"

কালিফ্‌ আসিয়া দরজায় পা দিয়াই চমকিয়া উঠিলেন—নির্ণিমেষ-নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন "একি! আমি স্বর্গে, না মর্ত্ত্যে?—জেগে রয়েছি, না স্বপ্ন দেখ্‌চি? এত সৌন্দর্য্য কি পৃথিবীতে সম্ভবে? স্বর্গে, আমি স্বর্গে! মরি মরি! কি চল-চল চঞ্চল চোখ!

জ্যোৎস্না-প্লাবিত শারদ আকাশের মত কি উজ্জ্বল দীপ্তি!" তাহার পর একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন "একটি নয়—দু'টি!"

বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া অমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "অমন্ ক'রে কি দেখ্‌চেন জাঁহাপনা?"

মুগ্ধ কালিফ্ ভাবিলেন "বাঃ! এযে সুধাবর্ষী কোকিল-ঝঙ্কার!" প্রকাশ্যে বলিলেন "সুন্দরি, তোমাদের রূপ-সুধা পান ক'চ্ছি।" তারপর নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিলেন "তোমাদের চরণ-স্পর্শে আজ আমার বাগ্দাদ্ ধন্য, আমি ধন্য, আমার হ্যারেম পবিত্র।"

অধোবদনে অমলা কহিলেন "জাঁহাপনা"—আর তাহার কথা সরিল না—কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

ত্রস্ত কালিফ্ বলিলেন "গোলামের উপর প্রসন্ন হ'য়ে আবার অপ্রসন্ন হ'চ্ছো কেন? সুন্দরি, তোমাদের নাম কি, তোমরা কার মেয়ে?"

অমলা মনে মনে ভাবিলেন "নাম?—না, বলা হ'বে না; বাবার নাম ত কিছুতেই নয়।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "জাঁহাপনা যে নাম দেবেন, তাই আমাদের শিরোধার্য্য: বাবার নাম সিন্ধুনাথ।"

আর একটু অগ্রসর হইয়া কালিফ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের বিয়ে হয়েছে?"

অমলা কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিস্মিত হইয়া কালিফ্ বলিলেন, "ওকি, তুমি কাঁদ্‌চো কেন! স্বামীর কথা মনে হ'য়ে কষ্ট হচ্ছে কি?—সে কষ্ট দূর কর সুন্দরি। সামান্য লোকের স্ত্রী ছিলে তুমি—আর আজ তুমি মুসল্মান্-জগতের সম্রাট, বাদ্গাদের কালিফের সর্ব্বপ্রধানা প্রণয়িনী! সুন্দরি, তোমার গোলাম আমি—আমার পানে প্রসন্ন চোখে চাও" বলিতে বলিতে তিনি তাঁহার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলেন।

তখন সরিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যুবতী কহিলেন "আমার ক্ষমা

করুন, জাঁহাপনা! আমি বড় হতভাগিনী। কালিফের প্রণয়িনী হ'বো, অত সৌভাগ্য আমার নেই; আমি আপনার বাঁদী হ'বারও অনুপযুক্ত" অঞ্চলে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া দুনিয়ার মালিক কালিফ্‌কে চোখে সরিষা ফুল দেখাইয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

"না সুন্দরি, তুমি অমন্ কথা বলো না" বলিতে বলিতে অধিকতর নিকটে অগ্রসর হইয়া কালিফ কহিলেন "আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণয়িনী তুমি, বাদশাদের অধীশ্বরী তুমি;—তুমি বাঁদী হ'তে যাবে কেন! এই আমার মকুট তোমার চরণে রাখ্‌লেম্।" যুবতীর পদ-প্রান্তে মুকুট স্থাপিত হইল।

"আর আমায় জ্বালা'বেন না, জাঁহাপনা।" বলিতে বলিতে অমলা ফিরিয়া বসিলেন "তু'লে নিন্। অপবিত্রা আমি—আমার স্পর্শে আপনার মুকুট কলঙ্কিত হবে, দেহ অপবিত্র হবে, আপনি স'রে যান।"

জানু পাতিয়া বসিয়া কালিফ্ বলিতে লাগিলেন "সুন্দরী-জগতের একচ্ছত্রা সম্রাজ্ঞী তুমি; তোমার স্পর্শে আমার দেহ পবিত্র, মুকুট গৌরবান্বিত হবে। দাও, আমায় চরণে স্থান দাও।" তখনো অমলা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, নিতান্ত দীনভাবে কহিলেন "কৈ সুন্দরি, কথা ব'লচো না যে! তোমার চোখে জল দেখ্‌লে, প্রাণ আমার অস্থির হয়ে ওঠে, দুনিয়াই আমি আঁধার দেখি! চাও, একটি বার আমার দিকে হাসি মুখে চাও।"

অমলা কাতর স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন "হায়! আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী! জগতের অধীশ্বর আপনি—কেমন ক'রে আমার কলঙ্কের কথা ব'লে আপনার প্রাণে আঘাত দেবো! কলঙ্কিনী আমি—আপনার ভালবাসার উপযুক্ত নই!"

তাঁহার সম্মুখে সরিয়া আসিয়া সহাস্য বদনে কালিফ্ আবার কহিলেন "চাঁদে কলঙ্ক আছে ব'লেই চাঁদ অমন্ সুন্দর; সাগরে প্রাণ দা'বার

আশঙ্কা আছে ব'লেই সাগর অমন্ ভীম-কান্ত! জগতের চোখে তুমি কলঙ্কিনী হ'লেও, আমার চোখে তোমার কলঙ্কই তোমার বেশী সুন্দর ক'রে তুলেছে।"

ত্রস্ত মুখ তুলিয়া অমলা কহিলেন "এতই যদি বাঁদীর উপর অনুগ্রহ, জাঁহাপনা, তা' হ'লে"—হঠাৎ বিরত হইয়া, মুখে কাপড় দিয়া যুবতী বলিয়া উঠিলেন "না, না আমায় ক্ষমা করুন।"

"ওকি প্রাণাধিকে, ব'লতে যেয়েও ব'ললে না! আমায় তুমি নিতান্তই পর মনে ক'চ্ছো?" তারপর জানু পাতিয়া কহিলেন "পায় পড়ি, বল, তোমার ব্যথা কোথায়।"

তখন অমলা গম্ভীর ভাবে কহিলেন "উঠুন আপনি, ব'লচি। আপনার সেনাপতি কাশেম আমায় অপমানিত করেছে!"

অবসন্নভাবে কালিফ্ বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার পদ-তলে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে! বাধ-বাধ স্বরে তিনি কহিলেন "কাশেম?—অসম্ভব!"

সতেজে যুবতী উত্তর করিলেন "অসম্ভব!—ভাল, বিশ্বাস করা, না করা, আপনার মর্জ্জি! যা সত্য, আমি তাই বলেছি। হয়েছে, আমার যথেষ্ট হয়েছে! যান্ আপনি, আর ভালবাসা জানাতে হ'বে না।" তিনি অনেক দূর সরিয়া যাইয়া বা'হিরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন। কৃত্রিম ক্রোধে তাঁহার মুখ-মণ্ডল এক নূতন আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মুগ্ধ কালিফ্ আরো মুগ্ধ হইলেন, নিকটে আসিয়া করুণ স্বরে কহিলেন "না, সুন্দরি, তোমায় আমি অবিশ্বাস করিনি—"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, গ্রীবা হেলাইয়া, অংস ও বাহুর উপরে কুঞ্চিত কুন্তলরাজি এলাইয়া, কুটীল কটাক্ষ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধ ও দুঃখের সঙ্গে যুবতী কহিলেন "স'রে যা'ন্, ব'লচি। আপনার ভালবাসা মুখের!

আবার যদি আমায় ভালবাসার কথা ব'ল্‌তে আস্‌বেন, আমি গলায় ছুরি দিয়ে ম'র্‌বো।"

ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া, নিতান্ত 'দীন অধম জনের' মত, কালিফ্‌ কহিলেন "না রূপসি, আমার ভালবাসা মুখের নয়; অন্তরের। 'হৃদয় চিরিয়া যদি দেখাবার হ'ত, দেখা'তেম্‌ প্রিয়তমে ভালবাসি কত!"—বুঝেছি, আমি, তোমার ও মোহন রূপ দেখে তা'র মতিভ্রম হয়েছিল! পাপ করেছে, শাস্তি ভোগ ক'র্‌বে। এত বড় আস্পর্দ্ধা! কালিফের মাথার মণিতে কুকুরের লোভ!"

তখন কৃত্রিম কোমলতার সঙ্গে, মর্ম্মপীড়িতা যুবতী কহিলেন "আমায় যদি বাস্তবিকই ভালবেসে থাকেন, জাঁহাপনা, তবে আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হ'বে—"

একেবারে আহ্লাদে গলিয়া যাইয়া, তাহার মুখের কথা টানিয়া লইয়া কালিফ্‌ কহিলেন "বল যুবতি, কি অনুরোধ? তোমায় অদেয় আমার কি আছে—প্রাণ পর্য্যন্তও নয়!"

অমলা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "যে আমায় কলঙ্কিত করেছে, তার উপর শাস্তি বিধান ক'রে—আমার প্রাণের জ্বালার শান্তি ক'রে—তবে আবার আমার কাছে আস্‌বেন।"

প্রসন্ন হইয়া কালিফ্‌ কহিলেন "তোমার এ কথায় আমি রাজী আছি। আমি চল্লেম। আজই কাশেমের উপর পরওয়ানা যা'বে; বাগদাদে এনে তা'র উপর দণ্ডবিধান হ'বে। আমার ভোগ্য জিনিষে যে লোভ করেছে, তা'র রক্ত দর্শন না হ'লে প্রাণে আমার শান্তি হ'বে না। আমি চ'ল্লেম—আমায় মনে রেখো"—অমলার দিকে চাহিয়া, বিমলার দিকে কটাক্ষ করিয়া, পরে, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তখন বিমলার মুখে কথা ফুটিল। ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন "এত

মিথ্যা তুই কেমন করে ব'ল্‌লি দিদি? কাশেম ত' আমাদের কোনো অপমান করেনি!—বরং সে আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছে। তোর কথায় একজন নির্দ্দোষ প্রাণে মারা যাচ্ছে! কাজটা কি ভাল হ'লো দিদি?"

অমলা গর্জ্জিয়া উঠিলেন "খুব ভাল হ'লো। আমি কিছু মিথ্যা বলিনি;—কাশেম, শুধু আমায় কেন, আমার বাবা, আমার বংশ আমার সাধের সিন্ধু সব কলঙ্কিত করেছে। সে না ম'র্‌লে প্রাণে আমার শান্তি হ'বে না!"

--- o ---

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সপত্নী-জ্বালা।

নব-সংগৃহীতা বেগম দুইটি অপূর্ব্বা সুন্দরী, ইত্যাকার জনরব অল্পক্ষণমধ্যেই কালিফের সুবিস্তৃত হারেমের মহলে মহলে দাসী বাঁদীর মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া গেল, শুধু সুল্‌তানা-বেগমের কাণে এখনো যাইয়া সংবাদটি পৌঁছায় নাই—কেহ সাহস করিয়া এ দুঃসংবাদ তাঁহার নিকট বহন করিয়া লইয়া যায় নাই।

সুল্‌তানা আসিয়া কালিফের হৃদয়-রাজ্যে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিবার পূর্ব্বে, ময়না বিবি মহাসুখে রাজত্ব করিতেছিলেন। সুল্‌তানা আসিলেন, আর তিনি সিংহাসন হইতে তাড়িত হইয়া গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইলেন; সুধু তাহাই নহে, দর্পিত, উদ্ধত বিজেতার হাতে বিজিতের যে লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ হইয়া থাকে, ইঁহাকে তাহা ষোল আনাই ভোগ করিতে হইয়াছে। কালিফের উপপত্নী বলিয়া সুল্‌তানা তাহাকে যথা-অযথা পরিহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছেন; আর তাহার আগমনের পর যাহারা পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, তাহারাও এই

উপলক্ষে, তাহার খরচে, বেশ একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া লইয়া আপনাদের হৃদয়-দাহ শান্ত করিয়াছেন। আজ ময়না-বিবি, হৃদয়নিহিত, সযত্ন-পোষিত এত দিনের প্রতিহিংসা বৃত্তিটিকে যথেষ্ট চরিতার্থ করিবার দিব্য সুযোগ দেখিতে পাইলেন। স্বচক্ষে অনলা ও বিমলাকে দেখিয়া, আনন্দে উল্লসিত হইয়া তিনি সুলতানার মহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ তাহার অধরে হাসি, চক্ষুতে হাসি—হাসি সর্ব্বাঙ্গে!

হঠাৎ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কালিফ্ চলিয়া গেলেন কেন, গালে হাত দিয়া সুলতানা তাহাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় ময়না আসিয়া হাসিয়া বলিলেন "কি গো, দেখে এসেছ বুঝি?" তার পর হাত ও মাথা নাড়িয়া, চক্ষুর নানা ভঙ্গী করিয়া কহিলেন "ভাবলে আর কি হ'বে? মাথার উপর একটা খোদা আছে ত'!—"

তাহাকে আর বলিতে না দিয়া, বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে চাহিয়া সুলতানা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বল্‌চো?"

আজ তুল্যঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বিজেতার গরিমার সঙ্গে, ময়না কহিলেন "বল্‌চি, আমার মাথা, আর তোমার মুণ্ড! আমরা ত' যেন কালিফের উপপত্নীই হ'য়ে ছিলেম—আর আজ, তুমি—তুমি তার কোন্ আয়নার ছবি হ'য়ে থাক্‌বে?" কোমর দুলাইয়া, মাটিতে পা পড়ে কি না পড়ে, তিনি চলিয়া গেলেন। সুলতানার মনে একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল; অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া, তিনি ডাকিলেন; কিন্তু ময়না আর ফিরিয়া আসিলেন না।

সুলতানা তখন উচ্চ স্বরে পরিচারিকাকে ডাকিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি, যে আজ ময়না-উপপত্নী আসিয়া তাঁহাকে এমন করিয়া বলিয়া গেল। ম্লান মুখে পরিচারিকা নীরব রহিল। তিনি উর্দ্ধতর কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন বাঁদী, কাটিয়া ছাঁটিয়া, যথা-সম্ভব শ্রুতি-রোচক করিয়া, তাহাকে নূতন বেগমদের কথা জানাইল।

ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সুল্‌তানা তাঁহাদিগকে দেখিতে চলিলেন—মতি স্থির থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন, আজ সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া মুহুর্মুহু হাসিয়া লইতেছে!

সুল্‌তানা আসিয়া ভগিনীদ্বয়ের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই মনে মনে তারিফ্ করিলেন "সুন্দরী বটে! যার সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি নেই, রূপই যার ভালবাসার উদ্দীপক, সে কালিফের মন এদের দেখ্‌লে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌বে, আশ্চর্য্যের কথা নয়!" তারপর প্রকাশ্যে বলিলেন "আমায় চিন্‌লে কি?—আমি কালিফের প্রিয়তমা বেগম সুল্‌তানা বিবি!"

হাসিয়া অমলা কহিলেন "আগে চিন্‌তে পারিনি; এখন চিন্‌লেম্। তোমায়ই কি কালিফ্ সব চেয়ে বেশী ভাল বাসেন?"

বিবি উত্তর করিলেন "হাঁ। তাঁর দু'শো বেগম আছে—তোমরা দুটি বাড়লে! এর মধ্যে তিনি আমায়ই ভাল বাসেন। আর সব ত' উপপত্নীর মত!"

কটাক্ষ করিয়া যুবতী কহিলেন "আপনিও ত' বিশেষ কিছু ন'ন। এইত, কালিফ্ আমায় কত ভালবেসে গেলেন।"

প্রাণে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু বাহিরে চাপা দিয়া সুল্‌তানা কহিলেন "তোমার ত দেখ্‌চি, ভারি আস্পর্দ্ধা! আমি সুল্‌তানা বেগম, আমার কথায় দুনিয়া উলটে যায়; আমার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হয়;—আর তুমি আমায় উপহাস কচ্ছো!"

অধর প্রান্তে হাসি ফুটিয়া উঠিল; অমলা কহিলেন "উপহাস কচ্ছিনে বেগম সাহেবা। সত্যি, কালিফ ব'লে গেলেন, তোমার চাইতেও আমায় তিনি বেশী ভাল বাসেন।"

গ্রীবা বাঁকাইয়া বঙ্কিম নয়নে চাহিয়া বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাকে ভালবাস?"

"বাসি, যে ম'র্‌তে চায়, সে যেমন জহর ভালবাসে, তেম্‌নি ভাল বাসি।" ধীরে ধীরে যুবতী এই কথা কয়টি বলিলেন।

বিরক্ত হইয়া সুল্‌তানা বলিলেন "সকল কথায়ই তোমার উপহাস! নূতন এসেছ—জাননা তুমি, আমার সঙ্গে যে উপহাস করে, তা'কে ম'র্‌তে হয়?"

হাসিয়া অমলা বলিলেন "তবেত যে মর্‌তে চায়, সে তোমায় উপহাস ক'র্‌বেই।"

সৌৎসুক্যে বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি কি ম'র্‌তে চাও?—তোমার দুঃখ কিসের?

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, যুবতী উত্তর করিলেন "আমার অনেক দুঃখ, সুল্‌তানা বেগম! তোমায় ব'লে কি হ'বে?"

কাতর ভাবে তাঁহার হাত ধরিয়া সুল্‌তানা কহিলেন "বল, আমায় বল, আমিও বড় দুঃখিনী!"

"আমার জীবন অপমানিত, তাই আমি ম'র্‌বো।"

ব্যগ্রভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বেগম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "অপমানিত হ'লেই কি ম'র্‌তে হয়?—ম'লেই কি প্রাণ জুড়ায়?"

গম্ভীর ভাবে উত্তর হইল "হাঁ বেগম, ম'লেই অপমানিতের প্রাণ জুড়োয়! তখন তা'কে দেখে আর কেউ উপহাস কর্‌তে পারে না।"

সুল্‌তানা মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মত অপমানিত এ সংসারে আর কেহ নাই। এই সুন্দরীই তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছে, তাঁহার স্বামী একেই বলিয়া গিয়াছেন 'তোমায় আমি সুল্‌তানার চাইতেও বেশী ভালবাসি!' উঃ বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! আর সব বেগম, এত দিন যা'দের তিনি উপপত্নীর মত ঘৃণা করিয়াছেন, এখন যে তাহারা হাসিবে, বলিবে 'তুমিও আমাদেরই একজন!'—এই যে আজই ময়না বিবি কত কি বলিয়া গেল! আমার

মরাই ভাল।' ভাবিতে ভাবিতে অস্থির ভাবে তিনি কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন; তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি মর্‌বে?"

অমলা কহিলেন "হাঁ, কেন?"

ধীরে ধীরে বেগম উত্তর করিলেন "আমিও ম'র্‌বো।"

একটু পরিহাসের সঙ্গে যুবতী কহিলেন "তুমি ম'র্‌বে কেন? কালিফের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণয়িনী তুমি, তোমার কথায় দুনিয়া উল্টে, চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়!—তুমি ম'র্‌বে কেন?"

প্রস্থান করিতে করিতে সুলতানা কহিলেন "এর জন্যই আমি ম'র্‌বো।" তিনি বাহির হইয়া আসিলেন; পথিমধ্যে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া আজ হাসিতেছে; ঐ বুঝি আবার ময়না-বিবি আসে? দৌড়িয়া যাইযা তিনি গৃহে কবাট দিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রূপে পাগল।

অমলা-বিমলার নিকট বিদায় লইয়াই কালিফ্ আসিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী মহম্মদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহার মস্তিষ্ক বলিতেছে, কাশেমকে তুমি জান; সে কখনো এমন কাজ করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার রূপে-পাগল হৃদয় বলিতেছে, এমন সৌন্দর্য্য ও যৌবন দেখিয়া কাশেম যে দিশাহারা হইয়াছিল, সে আর কতবড় কথা! কাশেম নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই সুন্দরীকে অপমানিত করিয়াছে! আবার তা'র আস্পর্দ্ধা কত! তা'রই উপভুক্ত রমনী সে আমায় পাঠাইয়াছে! না, তাহার আর নিস্তার নাই! —হৃদয়ের কাছে মস্তিষ্ককে হারি মানিতে হইল।

মহম্মদ আসিয়া সকল শুনিলেন; কিন্তু তাহার কিছুতেই বিশ্বাস

হইল না যে, কাশেমের মত সচ্চরিত্র বংশজাত পুরুষ ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইতে পারে।

কালিফ্ হুকুম করিলেন "কাশেমের জবাব কর—আমি তার রক্ত চাই!"

কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর ভাবে মন্ত্রী কহিলেন "জাঁহাপনা, ধর্মের অবতার আপনি,—একটা স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী কাশেমের উপর সন্দেহ স্থাপন কর্‌বেন না। হিন্দুস্থান জয় ক'রে তার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন—তার পর তার কথা শুনে যা' হয় কর্‌বেন। প্রাণের মমতায় সে মিথ্যা বল্‌বে না।"

ক্রুদ্ধ হইয়া কালিফ্ কহিলেন "আমায় জ্ঞান দিও না মন্ত্রী। প্রতিবাদ কর্‌তে তোমায় ডাকিনি; অমন সুন্দরী যুবতী,—নিশ্চয়ই কাশেমের লোভ হ'য়েছিল! সুন্দরী কখনো মিথ্যা বলে না—আপনার কলঙ্ক কেউ রটিয়ে বেড়ায় না, বরং গোপনই রাখ্‌তে চায়।"

সজলনেত্রে মহম্মদ আবার বলিলেন "আমায় ক্ষমা করুন, জাঁহাপনা। দেশের দুর্গতির দিন এসেছে! তাই কাশেমের মত বীরকেও আপনি সন্দেহ ক'চ্ছেন!—মনের আপশোষে দু' কথা না ব'লে পারিনে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের নামেও মানুষ মিথ্যা কলঙ্ক রটা'তে পারে। কাশেম ফিরে এলে, উভয় পক্ষ শুনে, যা'হয় কর্‌বেন—এত তাড়াতাড়ি কিছু কর্‌বেন না।"

কালিফ্ চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন "তুমি বড় বেয়াদবি আরম্ভ কর্‌লে মন্ত্রী! তোমার ব্যবহার ক্রমেই আমার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌চে! আমি যা' বল্লেম্, তাই ক'রগে; তাকে বন্দী ক'রে আন্‌বার জন্য আজই, লোক পাঠিয়ে দাও গে।" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মন্ত্রী তাঁহার পদ-দ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন "একটু অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা। রহিম খাঁ সঙ্গে ছিল; তাকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করুন।"

বসিতে বসিতে বিরক্ত ভাবে কালিফ্ বলিলেন "আচ্ছা, ডেকে পাঠাও।"

রহিম আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে, মন্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুন্দরীরা ব'লচে, কাশেম তা'দের উপর অত্যাচার করেছে। তুমি কিছু জান?"

রহিম খাঁ অধোবদনে রহিলেন; মনে মনে ভাবিলেন কালিফের প্রিয়পাত্রতা লাভের এই মহেন্দ্র-যোগ উপস্থিত।

কালিফ্ কহিলেন "কি, চুপ্ ক'রে রইলে যে?"

ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তখন খাঁ সাহেব কহিলেন "তা'রা মিথ্যা বলে নি।"

দেশ-কাল-পাত্র ভুলিয়া, ক্রোধে ও ঘৃণায় কাঁপিতে কাঁপিতে মহম্মদ বলিয়া উঠিলেন "রহিম্, তুই ঘৃণিত, বিশ্বাসঘাতী, প্রভুদ্রোহী!"

রক্ত-নেত্রে কালিফ্ গর্জ্জিয়া উঠিলেন "না, আর আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌তে পারিনে"—তারপর প্রহরীদিগকে কহিলেন "একে এখন কারাগারে নিয়ে যাও; পরে শাস্তিবিধান হ'বে।"

তুল্য তেজের সঙ্গে বৃদ্ধ মহম্মদ কহিলেন "বাগদাদের রাজ-সভার চাইতে কারাগার শত সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর! আমার উপর শাস্তি বিধান হ'লোনা জাঁহাপনা, অনুগ্রহ করা হ'লো!"

অভিবাদন করিয়া,ভয়ে ভয়ে প্রহরীরা তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। রহিমের দিকে চাহিয়া কালিফ্ বলিলেন "আমার স্বাক্ষর-যুক্ত পর-ওয়ানা নিয়ে আজই তুমি হিন্দুস্থানে রওনা হ'য়ে যাও। আমার সেনাপতিত্ব আজ হ'তে তোমার উপর ন্যস্ত হ'লো।" অভিবাদন করিয়া খাঁ সাহেব প্রস্থান করিলেন।

মন্ত্রীর ব্যবহারে কালিফ্ অধিকতর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উচ্চ স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন "এত বড় আস্পর্দ্ধা! যে

সুন্দরী কালিফের অন্তঃপুর উজ্জ্বল কর্'বে, যার চরণ স্পর্শে কালিফের মুকুট গৌরবান্বিত হ'বে, তার অপমান!" তাহার দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল "তোর আর রক্ষা নেই, কাশেম; ছুরি দিয়ে একটু একটু ক'রে তোর চাম্‌ড়া না তুল্‌লে আর আমার প্রাণে শান্তি হ'বে না! তোর কপালেও তাই আছে মহম্মদ!" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন "যাই,—যতদিন না সুন্দরীদের অঙ্গস্পর্শ আমার কপালে আছে, ততদিন সুল্‌তানাকে শান্ত রাখ্‌তে হয়।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জ্বালার উপর জ্বালা।

কাশেম যে সুন্দরীদিগকে অপমানিত করিয়াছেন, তাঁহার উপর দণ্ডবিধানার্থ কালিফ্ যে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পরওয়ানা জারি করিয়াছেন, একথা, দাবাগ্নির মত, মুহূর্ত্তে বাগ্‌দাদ্ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কেহ বিশ্বাস করিয়াছে, কেহ সন্দেহ করিয়াছে, অধিকাংশই বিশ্বাস করে নাই; কিন্তু তাহার উপর দণ্ডবিধান হইবে শুনিয়া বাগ্‌দাদের আপামর সাধারণ সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

জোবেদা প্রথমটায় চমকিয়া উঠিলেন—কাশেম মরিবে! তার পর, যাই মনে হইল কেন মরিবে, অমনি তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; তাহার সর্ব্বশরীর হইতে যেন অগ্নি-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল—তাহার পদ্ম-পলাশ নয়ন যুগল ঝলসিয়া উঠিল—সজোরে বক্ষঃস্থল উন্নত আনত হইতে লাগিল! 'এমন ইন্দ্রিয়াচারী লম্পটের জন্য তাহার জীবনের সুখ শান্তি তিনি বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এমন ঘৃণিত পশুর পায় পড়িয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন!'—তাহার অসহ্য জ্বালা হইল! তাহার উপর যখন তাহার মনে হইল যে, এই হৃদয়হীন লোকই আবার সাধুতার ভাণ

করিয়া, পত্নীর উপর অগাধ প্রেম দেখাইয়া, মর্জ্জিণাকে 'স্বধু বাহিরের নয়, অন্তরেরও' করিয়া তাহার প্রেম উপেক্ষা করিয়াছে, তখন, কাশেম মরিবে ভাবিয়া, তাহার মন অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইল।

কাশেমের কথা ভাবিতে ভাবিতেই মর্জ্জিণার কথা তাহার মনে হইল। অন্যদিন ইহার কথা মনে হইলে হিংসায় তাহার বুক ভরিয়া যাইত। আজ মর্জ্জিণার জন্য তাহার প্রাণেও দয়ার সঞ্চার হইল! 'আহা! নিরপরাধ তাহাকে কি যন্ত্রণা দিয়েছি', ভাবিয়া জোবেদীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল! "মর্জ্জিণা ত' আমারই মত প্রতারিত হইয়াছে!" তিনি উঠিয়া মর্জ্জিণার কক্ষে চলিলেন।

মর্জ্জিণার কাণে এ সংবাদ কেহ আনিয়া পৌঁছায় নাই। তিনি বসিয়া বসিয়া আপনার ভাবনাই ভাবিতেছেন :—"কাশেম এখন ফিরিয়া আসিবে। এতদিন পরে দেখা; কত প্রেম, সোহাগ বুকে করিয়া, তাঁহার সুন্দর চোখে কত আদরের হাসি লইয়া, কাশেম ঘরে যাইবে! তাহাকে না দেখিয়া কি করিবে?" মর্জ্জিণার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; তিনি ভাবিলেন "আর সাজাদীরই বা দোষ দেবো কি? ভালবেসে প্রতিদান পায়নি! জ্বালায় জ্বালায় অস্থির হয়েছে!" ঠিক এমনি সময়ে জোবেদী আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া মর্জ্জিণা কহিয়া উঠিলেন "এসেছ? এই তোমার কথাই ভাব্ ছিলেম্।"

দুঃখের হাসি হাসিয়া সাজাদী বলিলেন "আমার মুণ্ডপাত কচ্ছিলে বুঝি?"

কাতর ভাবে চাহিয়া মর্জ্জিণা উত্তর করিলেন "না। তোমার জন্য আমার বড় দুঃখ বোধ হয় সাজাদি। আমি ছেড়ে গেলেই তুমি যদি কাশেম্‌কে পেতে, তবে আমি যেতেম্। কিন্তু তা'তো তুমি পা'বে না! সে যে আমায় অনেক ভালবাসে। যে পথে গেলে ভালবাসা পাওয়া

যায়, তুমি যে আবার তার ঠিক উল্‌টা পথে চলেছ! সিন্ধু জয় হয়েছে, কাশেম এখন দেশে ফির্বে—কত আশা ক'রে সে আস্‌ছে! কিন্তু যখন আমায় পা'বে না, যখন জান্বে, তুমি আমায় এমন অবস্থ করেছ—কাশেম তোমায় শুধু ঘৃণা ক'র্বে, একটি বারও ফিরে চাইবে না!"

হো-হো-হো-শব্দে জোবেদী হাসিয়া উঠিলেন। মর্জ্জিনা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নহবৎ খানায় একটি বাঁশী উঠিয়া, সপ্ত-তানে বাজিয়া, প্রতিহত হইয়া আবার নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল। সাজাদী কহিলেন "আর তাকে ফিরে চাইতে হ'বে না! আর ঘৃণা ক'র্তে হ'বে না। এসো আমার সঙ্গে এসো—আর তোমায় আমি বন্দী ক'রে রাখ্‌বো না। আমার মত তুমিও প্রতারিত হ'য়েছিলে! এসো, তোমার আদরের স্বামীর নূতন প্রেমের কথা শুন্‌বে যদি এসো। তোমায় মেরে ফল নেই। লম্পট ইন্দ্রিয়াচারী আমায় ফাঁকি দিয়েছিল!—সে তোমায় ভালবাসে না!"

দলিতা ফণিনীর ন্যায় মর্জ্জিনা গর্জ্জিয়া উঠিলেন "বাসে, খুব ভালবাসে। দূর হ'য়ে যাও তুমি—তোমার মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়! কাশেম লম্পট!—কাশেম ইন্দ্রিয়াচারী!—মিথ্যাবাদিনী তুমি সাজাদী। আমায় মা'র্তে চাও, মেরে ফেলো—তাঁর নামে অপবাদ দিও না। দেবতা সে—পিশাচী তুমি; তুমি তাঁর কদর বুঝবে কেমন করে?"

জোবেদী রাগিলেন না—অনভ্যস্তপূর্ব্ব ধীরতার সঙ্গে কহিলেন "না মর্জ্জিনা, আমি তার নামে অপবাদ দিচ্ছিনে—এতে আমার প্রাণে জ্বালা কম হয়নি। তোমায় বে করেছিল—তোমার জন্য আমায় যদি অনাদর ক'র্‌তো, সে টা সইলেও সইতে পার্‌তেম্। কিন্তু তা'তো নয়! তোমায় ভালবাসে ব'লে সে ভালমানুষির ভাণ করেছিল! আজ ওঁ সে ওই সিন্ধু-রমণীর পদলেহন করেছে! আমায় উপেক্ষা ক'র্‌বার, আমায় অনাদর ক'র্‌বার, তার ত কোনো কারণ ছিল না!"

তেমনি ঘৃণা ও তেজের সঙ্গে মর্জ্জিণা বলিলেন "পিশাচী তুমি, আপনার মন দিয়ে জগৎ দেখ্‌চো! পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠ্‌তে পারে, আমার কাশেম কখনো মন্দ হ'তে পারে না। তোমার পায় পড়ি, তুমি যাও মিথ্যাবাদিনি।"

দৃঢ়তা সহকারে জোবেদী আবার বলিলেন "হয়েছে, মন্দ হয়েছে! তার কলঙ্কের কথা আজ বাগদাদ্‌ময় রাষ্ট্র। তার উপর কালিফের পরোয়ানা গেছে! আমি মিথ্যাবাদিনি নই মর্জ্জিণা। কাশেমের এই কলঙ্কের কথা আমার বুকে শেলের মত বেজেছে। এরই পায় ধ'রে আমি কত সেধেছিলেম!—আজ সে কথা মনে হ'য়ে মর্জ্জিণা, আমার বুক্ ফেটে যাচ্ছে! সে না ম'র্‌লে আর আমার প্রাণ শীতল হ'বে না।"

পূর্ব্ববৎ কাশেম-প্রিয়া কহিলেন "বাগদাদ্‌ময় রাষ্ট্র হোক্, জগৎময় রাষ্ট্র হোক্—সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিতে রাষ্ট্র হোক্,—আমি জানি, কাশেম নিষ্কলঙ্ক—কাশেম দেবতা।" তাপর জোবেদীর হাত ধরিয়া কহিলেন "না সাজাদি, তা'কে তুমি মেরোনা— তোমায়ই আমি দেবো।"

জোবেদী দৃঢ় ভাবে উত্তর করিলেন "আর আমি কাশেমকে চাইনে। আমার হাত ধ'র্‌চো কেন? আমায় তাকে মা'র্‌তে হবে না—কালিফই মা'র্‌বেন।"

বিস্মিত হইয়া, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া, মর্জ্জিণা বলিয়া উঠিলেন "কালিফ্ কাশেমকে মার্‌বে?—অসম্ভব!"

দার্ঢ্য সহকারে জোবেদী আবার কহিলেন "মার্‌বে, নিশ্চয়ই মার্‌বে।"

বিস্মিত নেত্রে মর্জ্জিণা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

বাদ্‌সাজাদী হাসিয়া উঠিলেন "এই এতটা সময় বল্লেম্ কি? সিন্ধু থেকে যে দু'টো মেয়ে এসেছে, কাশেম তাদের অপমান করেছে। তাদের সন্তুষ্টির জন্য এখন তা'কে ম'র্‌তে হ'বে।"

দাঁড়াইয়া মর্জ্জিণা বলিলেন "কালিফের পায় ধরে আমি বুঝিয়ে দেবো, কাশেম অন্যায় ক'র্‌তে পারে না। তিনি যদি না শোনেন, আমি তাঁ'দের পায় ধরে বল্‌বো, তোমরা সত্য বলে' আমার কাশেমকে বাঁচাও।"

জোবেদী কহিলেন "কাশেমের মরাই ভাল।"

"পোড়ারমুখী! পিশাচী!" বলিতে বলিতে মর্জ্জিণা বাহির হইয়া গেলেন।

রুমালে মুখ আবৃত করিয়া জোবেদী বলিয়া উঠিলেন "বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! তোমার প্রভুর প্রভু আমি—আমার উপেক্ষা করে সামান্য সিন্ধু-রমণীর পদ-লেহন! কাশেম, আর তোমার নিস্তার নেই! তোমায় ম'র্‌তেই হবে—কালিফ ক্ষমা করলেও আমার হৃদয় ক্ষমা করবে না।"

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুলতানার উদ্ধার।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালিফ্ আসিয়া সুলতানা বেগমের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বেগম ঘরে নাই। বিস্মিত হইয়া তিনি ভাবিলেন, সুলতানা কোথায়? পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কোনো উত্তর করিতে পারিল না। তাহাকে দেখিয়া আসিতে বলিয়া, গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে করিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন "সুলতানাও দেখ্‌তে মন্দ নয়। তবে বয়সটা একটু বেশী হয়েছে, আর চোখ দুটো তেমন সুন্দর নয়। তা যাক্, মাঝে মাঝে সুলতানা মন্দ লাগবে না।" তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন—নিমীলিত নেত্রে মনে মনে অমলা-বিমলার সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বিষণ্ণতা ও গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ বেগম আসিয়া

কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠাধরের হাসি-রেখা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে; তাঁহার চক্ষুতে আর সে হাসিমাখা সরলতার ভাব নাই; মুখ-মণ্ডলের সে গরিমার আভা প্রভাতী চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় মলিন হইয়া পড়িয়াছে। কালিফ আশ্চর্য্য হইলেন; কিন্তু এ বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া তিনি তাঁহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথা? আমায় তুমি ভালবাস না! জান্‌তে ত তুমি, আমি এখন আসবো?"

মৃদু হাসিয়া উদাস দৃষ্টিপাত করিয়া সুল্‌তানা উত্তর করিলেন "তোমার নূতন বেগমগুলি দেখ্‌তে গেছিলেম; বেশ সুন্দরী!"

কালিফ চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া, তাহার ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিয়া, হাসিয়া বলিলেন "আমার সুল্‌তানার কাছে নয়!"

হাসিয়া বেগম কহিলেন "বেশ ত' ঠাট্টা শিখেছ! আমি না হয় কুৎসিৎই আছি।"

তাঁহাকে টানিয়া বুকের কাছে আনিয়া স্বামী উত্তর করিলেন "আমি ঠাট্টা কচ্ছিনে সুল্‌তানা। তারা তোমার বাঁদী হ'বারও যোগ্য নয়!"

ঘৃণাবিমিশ্র হাসির সঙ্গে সুল্‌তানা কহিলেন "সন্তুষ্ট হলেম্, আমায় তুমি এত ভালবাস! সুন্দরী তারা, আমার ভালবাসায় অন্ধ তুমি, তাদের সুন্দর দেখ না!"

প্রসঙ্গটি বড় সুবিধাজনক নহে বুঝিতে পারিয়া বিষয়ান্তরে বেগমের মন আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কালিফ্ তাড়াতাড়ি বলিলেন "সুল্‌তানা, প্রাণেশ্বরি, সিন্ধুর ঐশ্বর্য্যে আজ আমার বাগ্দাদ পূর্ণ! আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছি; তার নিদর্শন স্বরূপ এই পান্নার হারটি একবার পর।—দেখ আমার কথার মূল্য কত!"

সুলতানা খুব হাসিলেন—হাসির তরঙ্গ আর থামে না। কালিফ্ ভাবিলেন, হার পাইয়া সুলতানা ভারি খুসী হইয়াছে! শেষে বেগম বলিলেন "তোমার কথার মূল্য আর আমি জানিনে!" তার পর হারটি নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন "বা, ভারি সুন্দর ত!" তার পর আবার কুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "তোমার নূতন বেগমদের কি দিলে?"

কালিফ্ ভারি বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন—তিনি যে প্রসঙ্গ উথাপন করিতে ভীতি বোধ করেন, বেগম্ সে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই সুর ধরিয়া বসে! কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া স্বামী উত্তর করিলেন "তারা এমন হারের যোগ্য নয়; এ সুধু আমার বাগ্দাদের শোভা, সুলতানার গলায়ই সাজে। পর সুলতানা, হার তুমি গলায় পর—আমার চক্ষু সার্থক হোক্।"

বেগম হার পরিলেন! তার পর মধ্যমণিটিকে হাতে লইয়া তারিফ্ করিয়া বলিলেন "বাঃ! হীরার এমন সুন্দর জ্যোতি। এমন আর আমি আগে দেখিনি! তুমি আমায় এত ভালবাস!" বলিতে বলিতে তিনি হীরকখণ্ড চুম্বন করিলেন।

"সুলতানা সুলতানা, বুঝ্তে পার কি তুমি, তোমায় আমি কত ভালবাসি!" বলিতে বলিতে কালিফ্ উঠিয়া স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিলেন "এসো আমার বুকে এসো। তোমার বাঁদীদের ডেকে পাঠাও—তারা এসে দুটো গান করুক। বাঃ! কেমন সুন্দর জোছনা এসে ঘরে পড়েছে!"

পুনঃ পুনঃ হীরক চুম্বন করিতে করিতে সুলতানা বলিলেন "না আর কাউকেও ডাক্তে হবে না। নিরিবিলি তোমায় একটু দেখ্তে দাও। বাঃ! হীরের জ্যোতি যেমন উজ্জ্বল, চুম্বনেও তেমনি সুখ!" বলিয়া আবার হীরক চুম্বন করিলেন।

কালিফ্ এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই, এখন চমকিয়া উঠিয়া হীরকটিকে;

তাঁহার ওষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে করিতে তাড়াতাড়ি বলিলেন "ওকি! তুমি কচ্ছো কি! হীরেয় যে বিষ আছে! জিহ্বায় লাগেনি ত!"

হাসিতে হাসিতে সুল্‌তানা কহিলেন "বিষ আছে! আগে বলনি কেন? এখন ত লেগেই গেছে!"

কালিফ্‌ ত্রস্ত বলিলেন "দেরী করো না, মুখ ধুয়ে ফেল।" তার পর কণ্ঠস্বর উঠাইয়া ডাকিলেন "বাঁদি! বাঁদি!"

তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বেগম কহিলেন "আঃ, অত চেঁচাচ্ছো কেন? মাথা ধর্‌বে। কালিফ্‌, তুমি, অত চেঁচানো তোমার সইবে না।" তারপর ধীরে ধীরে দেহ শয্যায় ঢলিয়া পড়িল—স্থির নির্ণিমেষ লোচনে চাহিয়া সুল্‌তানা বলিলেন,—"আমায়—আমায় তুমি ভালবাস প্রিয়তম?" স্থিরদৃষ্টিতে যুবতী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চুম্বন করিয়া স্বামী উত্তর করিলেন "রোজই কি বল্‌তে হবে?—হাঁ, বাসি, প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি।"

তেমনি বিষাদ-বিজড়িত অথচ ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুল্‌তানা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি ম'লে তোমার ভারি কষ্ট হয়, কেমন?"

"ছি! ও কথা বল্‌তে নেই। তুমি মর্‌বে কেন?" কালিফ্‌ তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

দৃঢ় ভাবে যুবতী কহিলেন "হাঁ, আমি মর্‌বো, আজই মর্‌বো, এখনই মর্‌বো—"তাঁহার স্বরে যেন ভবিতব্যতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

উঠিয়া বসিতে বসিতে কালিফ্‌ বলিলেন "আবার ঐ কথা! আমি তবে চল্লেম্—"

অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে সুলতানা ধীরে ধীরে কহিলেন "আছো কোথায় যে চল্‌বে! আমায় ত্যাগ করে' তুমি ত চলেই গেছ।" তার পর টানিয়া চক্ষু মেলিতে মেলিতে কালিফের হাত আপন হাতে আনিয়া তিনি বলিলেন "স্বামিন্‌, প্রভো! আর আমায় ফাঁকি দিও না—আমি সব

জেনেছি। জেনেছি আমি, যে, এক দিন যাদের আমি তোমার উপপত্নী বলে ঘৃণা করেছি, আমি এখন তাদেরই এক জন! জেনেছি আমি, যে তুমি আমায় চাওনি, আমার শরীর চেয়েছিলে; তুমি মন চাওনি, চামড়া চেয়েছিলে। তবে আর কেন আমায় ফাঁকি দিতে চাচ্ছ?".

কালিফ্ বলিলেন "না তুমি মিথ্যা—" দুর্ব্বল হস্তে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বেগম কহিলেন "না, না, আর প্রতারণা ক'রো না, তোমার এই মিথ্যা প্রবঞ্চনার জ্বালায়ই আমি জহর খেয়েছি—আমার আর বড় দেরী নেই! দাও, একটি চুমো দাও'। স্বামীর গলা দুই হাতে ধরিয়া, তাঁহার মুখে একটি একটি করিয়া তিনটি চুম্বন দিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য নিমীলিত নেত্রে তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, যুবতী দুই হাতে সরাইয়া দিলেন "যাও, এখন তুমি তোমার নূতন বেগমদের কাছে যাও!"

ভীত চকিত ভাবে চাহিয়া কালিফ্ কহিলেন "তুমি জহর খেয়েছ, সুলতানা!"

তাঁহার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে মিলাইয়া গেল—কেবল প্রান্তদ্বয়ে, জোয়ার সরিয়া গেলে সমুদ্রের বেলাভূমে যেমন শুষ্ক ফেন পড়িয়া থাকে, তেমনি একটু হাসির ছায়া লাগিয়া রহিল। যুবতী ধীরে, অতি ধীরে বলিতে লাগিলেন "খেয়েছি। খা'বো না কেন? আমায় তুমি—ফাঁকি দিয়েছ!—আমায় তুমি অপমানিত করেছ।—এই দেখ—আমার—আমার বুক কালি হ'য়ে গেছে। যাও, তুমি—যাও;—তোমার নূতন বেগম রাগ করবে, বড়—ঘুম—পাচ্ছে—ঘুমুই—"

কালিফ্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন "সুলতানা, সুলতানা!"

"আবার কেন?—যাও—তুমি—" স্বামীর অনাদর ও সপত্নীদের অপমানের হাত হইতে, স্ফুটন্ত যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া সুলতানা বেগম চির-পলায়ন করিলেন। কালিফ্ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া

উঠিলেন। কিন্তু এখনো তাঁহার জ্ঞান হয় নাই, যে, পরকে বঞ্চনা করিতে গেলে, নিজকেই বঞ্চিত হইতে হয়।

——০——

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অমলা পাষাণী।

ঠিক এই রাত্রেই অমলা ও বিমলা, পুষ্করিণী-সোপানে বসিয়া সুখ-দুঃখের আলোচনা করিতেছিলেন। হঠাৎ "তোকে মর্‌তেই হ'বে বিমল। যবনের হাতে তোকে রেখে আমি মর্‌তে পার্‌বো না" বলিতে বলিতে অমলা, উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিমলা বসিয়াই রহিলেন—ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "না, এখন আমি মর্‌বো না। বেঁচে থাক্‌লে এক দিন অপমানের প্রতিশোধ আমিও নিতে পার্‌বো। মর্‌লে ত' সকলি ফুরিয়ে গেল!"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভগিনীর দিকে চাহিয়া জ্যেষ্ঠা কহিলেন "তোকে বিশ্বাস হয় না! প্রাণের উপর যে তোর বড় মমতা!"

কাতর ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া কনিষ্ঠা বলিলেন "ছিল, একদিন খুবই ছিল। তোকে দেখে দেখে এখন আর আমার ভয় নেই। কালিফ্‌কে মেরে, আমি মর্‌বো।"

"পারবি?"

"পার্‌বো!"

তথাপি অমলার মন একেবারে নিঃসন্দেহ হইল না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন "শেষে, না আপনাকে কলঙ্কিত করে ফেলিস্?"

স্থির দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বিমলা কহিলেন "তুই ছুরি দিয়েছিলি;—তার আগেই মর্‌বো।" এবার জ্যেষ্ঠা সন্তুষ্ট হইলেন;

তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন,এমন সময় অদূরে একটি রমণী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

মূর্ত্তিটি নিকটে আসিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া কহিল "সাহান্ শা বাগদাদ-পতির মেয়ে জোবেদী আমি। সিন্ধু থেকে তোমরা এসেছ; সেনাপতি কাশেমের সংবাদ জান্‌তে এলেম্।"

কটাক্ষ করিয়া অমলা জিজ্ঞাসা করিলেন "সেনাপতির খবরে তোমার দরকার?"

হাসিয়া জোবেদী কহিলেন "আমার দরকার?—আছে; কাশেমের গুণে, কাশেমের বীরত্বে সমগ্র মুসল্মান-সমাজ মুগ্ধ। আমার দরকার থাক্‌বেনা কেন? জান যদি, কাশেমের গুণের কথা কিছু বল।"

অমলা চকিতে সেনাপতির প্রতি আগন্তুকার মনের ভাব ধরিয়া ফেলিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন "গুণ তার অশেষ—দেখ্‌তে সুন্দর, মিষ্টভাষী, প্রেমিক—"

বাধা দিয়া জোবেদী জিজ্ঞাসা করিলেন "কাশেম প্রেমিক, তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে? যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ও করেছে কি?—কৈ, কাশেম ত' প্রেমের কদর জানে না; প্রণয়িনীর প্রাণে আঘাত দিতে তার মনে এতটুকুও ত' লাগে না! কাশেম প্রেমিক, তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?"

হাসিয়া অমলা কহিলেন "কেমন ক'রে জান্‌লেম্, অতটা তোমায় ব'ল্‌তে পার্‌বো না। এ পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি, সে প্রেমের কদর জানে—খুব জানে, অন্ততঃ যতদিন তার আবশ্যক, ততদিন খুবই জানে!"

সাজাদী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, সিন্ধুতে কারো প্রেমে পড়েছিল কি?"

অমলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অত খবরে কাজ কি তোমার সাজাদি?"

তেমনি হাসিয়া জোবেদী উত্তর করিলেন "আছে, আমার কাজ আছে। এখানে সে কখনো প্রেমের অভিনয় করে নি; এখানকার লোকেরা তার বীরত্বের কথাই জানে। আমার ত' বিশ্বাস, বীরের প্রাণ বড়ই কঠিন; তাই জান্‌তে ইচ্ছা হয়েছে, কেমন ক'রে কাশেম প্রেমের প্রতিদান দেয়।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অমলা কহিলেন "প্রতিদান দেবার জন্য সে অপেক্ষা করে না। সুন্দরী দেখ্‌লে আপনিই যেয়ে তা'কে ভালবাসে—জোর ক'রে প্রতিদান চায়! না পেলে সে সুন্দরীর আর তবে রক্ষা থাকে না। কাশেমের হাতে তা'কে অশেষ দুর্গতি, অশেষ লাঞ্ছনা সইতে হয়। তার প্রাণের সুখ-শান্তি, আশা-ভরসা সকলি সে কঠিন হাতে নিষ্পেষিত করে!"

সৌৎসুক্যে সাজাদী জিজ্ঞাসা করিলেন "সিন্ধুতে এমন করেছে কি? জোর ক'রে কা'রো ভালবাসা পেতে গেছিল কি?"

আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অমলা উত্তর করিলেন "সিন্ধু-সুন্দরীর উপর কাশেম ভয়ানক অত্যাচার করেছে! সুন্দরী তাকে কখনো ভালবাসে নি—বাস্‌তেই পারে না। কিন্তু তার ক্রোধ, অনুনয়, ক্রন্দন কিছুই কাশেম গ্রাহ্য ক'র্‌লে না! তা'কে পাওয়াই যেন কাশেমের জীবনের ব্রত হ'য়েছিল। ওঃ, কি ভয়ানক অত্যাচারই না করেছিল!"—যুবতীর কণ্ঠ ভার হইয়া আসিল—তিনি আর বলিতে পারিলেন না।

বিজাতীয় ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার আগুন সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া বাদশাজাদীর হৃদয় পোড়াইয়া ছারখার করিতে লাগিল; নিতান্ত অধীর উত্তেজনার সঙ্গে তিনি উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। নীরবে ভগিনীদ্বয় তাহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। হঠাৎ জোবেদী দরজার দিকে ফিরিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় এলায়িতকেশা, স্খলিতবসনা, ভীতো-

দ্বিগ্ননয়না মর্জ্জিণা, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া, তাহার সম্মুখে পড়িলেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে আনিতে আনিতে সাজাদী এক নিঃশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন "তোর স্বামীর গুণের কথা, অবিচলিত প্রেমের কথা শুন্‌বি যদি দৌড়ে আয়।"

সবলে তাহাকে সরাইয়া দিয়া, অমলার পদ-প্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িয়া মর্জ্জিণা কাঁদিয়া উঠিলেন "তোমার পায় পড়ি, আমার কাশেমের জীবন তুমি ভিক্ষা দাও। মিছে ব'লে তুমি কাশেমকে মারতে বসেছ! কালিফ নিষ্ঠুর, বড় নিষ্ঠুর! যে স্বামী আমার, নিজের প্রাণ, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা, উপেক্ষা ক'রে তার কাজ করেছে, মিথ্যা ঘৃণিত দোষ দিয়ে, তার প্রাণ নিতে কালিফের বুকে কি একটুও লাগ্‌লো না! সুন্দরী, তুমি আমায় দয়া কর—আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাও।"

পা সরাইয়া, ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া, অটল-অচলা দাফির-নন্দিনী উত্তর করিলেন "দয়া!—না, আমার প্রাণে দয়া নেই! সে কি আমায় এক বিন্দু দয়া করেছিল?" তার পরে, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চ স্বরে, জোরে জোরে, একটি একটি করিয়া, তিনি বলিলেন "এই দেখ, তার অত্যাচারে বুক আমার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে! কাশেম আমায় কলঙ্কিত করেছে—তার হাতে লাঞ্ছনার আমার একশেষ হয়েছে! দয়া—অনেক দিন হ'লো শুকিয়ে গেছে! এখানে এখন সুধু আগুণ জ্ব'লচে।—কাশেম বেঁচে থাক্‌তে, প্রাণের জ্বালা আমার নিভ্‌বে না!"

ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া, চক্ষুতে পৈশাচিক হাসি খেলাইয়া, মাথা নাড়িয়া জোবেদী বলিয়া উঠিলেন "ঠিক বলেছ তুমি, কাশেম না ম'লে প্রাণের জ্বালা জু'ড়োবে না! অমন ঘৃণিত লম্পট কুকুর!—তার আবার অবিচলিত ভালবাসার ভাণ কত!" তারপর, বঙ্কিম গ্রীবায় অমলার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া, দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া তিনি ঐকান্তিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন "সুন্দরি, এই বাঁদীর কান্নায় ভুলে তুমি কাশেমকে

দয়া ক'র্‌লে, ক'র্‌তে পার; কালিফ্‌ তাকে মার্জ্জনা ক'র্‌লে ক'র্‌তে পারেন। কিন্তু জোবেদীর প্রাণে দয়া মার্জ্জনা কিছুই নেই—প্রাণ তার পাষাণের চেয়েও পাষাণ; কাশেম না ম'লে তার আগুণ নিভ্‌বে না!"

সাজাদীর কথায় লক্ষ্য না করিয়া, তাহার দিকে না চাহিয়া, দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে, অমলাকে উদ্দেশ্য করিয়া মর্জ্জিণা কহিলেন "তোমার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; তোমরা সবাই মিলে ভীষণ ষড়যন্ত্র ক'রেছ! নারকী তোমরা, পিশাচী তোমরা! কাশেমের স্ত্রী আমি, প্রণয়িনী আমি—আমার চেয়ে তাঁ'কে কে বেশী জানে? সে কখনো তোমায় কলঙ্কিত কর্‌তে পারে না।" তার পরে, তাঁহার হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন "কেন মিথ্যা ব'লে—পরকাল খেয়ে আমার সর্ব্বনাশ কচ্ছো? দয়া কর—আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও।"

তাহাকে দুরে সরাইয়া দিয়া অবিচলিত-ভাবে অমলা কহিলেন "পাষাণে কি জল চাইলে পাওয়া যায়? আমার প্রাণে দয়ামমতা নেই—সুধু ঘৃণা, সুধু দাহ! কাশেম আমার বড় অপমান করেছে—জ্বালায় জ্বালায় আমি পাগল হয়েছি! তার রক্ত না দেখ্‌লে বুক্‌ আমার ঠাণ্ডা হ'বে না—"

তাহার কথা টানিয়া লইয়া যেন, জোবেদী বলিতে লাগিলেন "না মর্জ্জিণা, সে বাঁচ্‌তে পা'বে না! সে, যদি বাঁচ্‌বে, তা' হ'লে আমার মান থাক্‌লো কৈ? সাজাদী আমি, কত কালিফ-বাদশার আরাধ্যা আমি,—আর আমি পায় ধ'রে ভালবাসা চেয়েছিলেম্‌, দুষ্ট প্রতারক আমায় উপেক্ষা ক'রে যে তা'কে চায় না, যে তাকে ঘৃণা করে, এমন সিন্ধু-রমণীর প্রেম ভিক্ষা ক'র্‌তে গেছিল!—উঃ, আজ আমার প্রাণে আগুণ জ্ব'লে উঠেছে, মর্জ্জিণা! কাশেমের রক্ত বিনে তা' নির্ব্বাণ হ'বে না।" তিনি চলিয়া গেলেন।

মর্জ্জিণা- অমলার পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িলেন—বলিলেন

"চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু কাশেম আমার নিষ্কলঙ্ক। মিথ্যা ব'লে আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না, সুন্দরি! চাও, একটিবার আমার দিকে চাও, আমায় দয়া কর—"

অমলা তাহাকে উঠাইয়া কহিলেন "যাও, তুমি সরে যাও—পাষাণ ফেটে জল বেরুতে পারে, আগুণ শীতল হ'তে পারে; আমার প্রাণে দয়ার লেশও হ'বে না। দয়া!—কাশেমকে আমি দয়া ক'রতে পার্‌বো না।"

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—আহত গর্ব্বের সহিত বলিলেন "রমণী তুমি, সুন্দরী তুমি, যুবতী তুমি—তুমি এমন নিষ্ঠুর! আমার কাশেমকে মেরে যদি তোমাদের এতই সুখ হয়, মারো তা'কে—কিন্তু তার নামে কলঙ্ক দিওনা। দেবতা সে—তোমরা তার মর্য্যাদা বুঝ্‌লে না, এই যথেষ্ট; আবার তার নামে মিথ্যা দোষারোপ করা কেন?" আবার পাষাণ-প্রতিমা অমলার পায় লুটাইয়া কহিলেন "মা'র্‌তে হয়, মারো—কিন্তু একটিবার—একটিবার মাত্র জগতের কাছে তুমি বল—কাশেম আমার নির্দ্দোষ।"

সরিয়া দাঁড়াইয়া ধীরভাবে যুবতী উত্তর করিলেন "না মর্জ্জিণা, সে নির্দ্দোষ নয়—সে আমায় কলঙ্কিত করেছে।"

আর সহ্য হইল না—আরক্ত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া, যেন তাঁহার মস্তকে বিধাতার অভিসম্পাত ডাকিয়া আনিতে আনিতে মর্জ্জিণা বজ্রস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন "নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদিনি! দয়া নাই বা ক'র্‌লে! মাথার উপর সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ আছেন—তিনি বিচার ক'র্‌বেন।" আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া কাশেম-প্রিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন বিমলা নিকটে আসিয়া কাতরভাবে বলিলেন "বড় পাষাণী তুই দিদি!"

অমলা হাসিলেন "পাষাণে বুক্ না বাঁধ্‌লে, এত দিনে ফেটে চৌ-চির

হ'য়ে যেতো বিমল! একবার মনে ক'রে দেখ্, আমরা কি ছিলেম্, আর কি হয়েছি : যে সিন্ধু আমাদের মনোরম্য স্বর্গস্থান ছিল, আজ সে সিন্ধু আমাদের—আমাদের জননী জন্মভূমি—নর-রক্ত-প্লাবিত,কৃমিকীটপূর্ণ নরকের চেয়েও বীভৎস! যে আলোর শোভা-সৌন্দর্য্যে, শান্তিআমোদে একদিন অমরাবতীর মত ছিল—সে আলোর আমাদের, আজ যবনের,—শেয়াল কুকুরের-চীৎকারে শ্মশানের অপেক্ষাও ভীষণ! বিমলা, বুক্ যে পাষাণে বেঁধেছি, তবু ফেটে যেতে চায়!"

অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে কনিষ্ঠা কহিলেন "না, দিদি, সিন্ধুর কথা আর তুই মনে ক'রে দিস্‌নে! আলোরের কথা ভু'লে যেতে দে।"

উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া, বুক্-কাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অমলা, আপন মনেই যেন, বলিতে লাগিলেন "ভুল্‌বো—একদিন আলোরের কথা, সিন্ধুর কথা, আমাদের গৌরবের কথা সকলই ভুল্‌বো!—কাশেম মরুক্, যবনের দেশ পু'ড়ে ছারখার হোক্, তখন সকল জ্বালা ভুল্‌বো!"

——o——
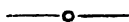
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সিংহের পায়ে শৃঙ্খল।

বাগ্দাদ্ হইতে নূতন বল আসে-আসে করিয়া কাশেম এখনো মুল্‌তানেই রহিয়াছেন—দেহে, কিন্তু মস্তিষ্কে নহে। দেশে দেশে আপনার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে ছদ্ম-বেশে পাঠাইয়া তিনি শত্রুর অন্ধি-সন্ধি সংগ্রহ করিতেছেন; কোন্ দেশে প্রবেশ করিবার কোন্‌টি সহজপথ, কোন্ নগরের পর কোন নগর, কোন্ দেশের পর কোন্ দেশ, কোথায়

পর্ব্বত, কোথায় নদী, ইত্যাকার প্রয়োজনীয় উপাদানে স্বহস্তে তিনি ভারতবর্ষের একখানা মোটামুটি ধরণের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

একদিন অপরাহ্নে বসিয়া তিনি ভাবিতেছেন,—যখন সমগ্র হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে পবিত্র মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচার করিয়া, হিন্দু-স্থানের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অভ্রভেদী মস্জিদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাদের শিরে শিরে মুসলমানের বিজয়-কেতন উত্তোলিত করিয়া, আর হিন্দুস্থানের ধন-ধান্যে, রজতকাঞ্চনে, মণিমাণিক্যে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত পরিপূর্ণ করিয়া, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন তাঁহার কালিফ কত না আদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবেন, তাঁহার স্বদেশ-বাসী কত না আদরে তাঁহার কল্যাণে মস্জিদে মস্জিদে কোরাণ-পাঠ করিবেন,—আর যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর, তাহার মর্জ্জিণা কত না প্রেম ও সোহাগে তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিবে 'এত বড় তুমি—আর আমি তোমাকে যাইতে দিতে চাহিয়াছিলাম না!' এমনি করিয়া ভাবিতেছিলেন তিনি, আর উদ্যম উৎসাহে তাহার সুন্দর মুখ-মণ্ডল এক দৈব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার জয়োৎসুক হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল!—ঠিক এমনি সময়ে, অদৃষ্টের কঠিন পরিহাসস্বরূপ, সহকারী সেনাপতি রহিম খাঁ আসিয়া, কালিফের পরোয়ানা তাঁহার হাতে দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইলেন—তাহার সঙ্গে দশজন সিপাহী; তিনি কোনো অভিবাদন করিলেন না। তাহাকে দেখিয়াই, পরোয়ানার দিকে না চাহিয়া, কাশেম আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কত সৈন্য সঙ্গে এনেছেন?"

অন্যদিকে চাহিয়া খাঁ সাহেব বলিলেন "পরোয়ানা পড়ুন।"

কাশেম পড়িলেন—তাহার মুখ-মণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল; হস্তপদ কম্পিত হইতে লাগিল! রহিম খাঁ আর একটু দূরে সরিয়া গেলেন।

কতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে পরোয়ানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাশেম রহিম খাঁর দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন—তাহার অধর-প্রান্তে একটু ব্যঙ্গ-

হাসি ফুটিয়া উঠিল। তার পর পরোয়ানা চুম্বন করিয়া, মাথায় ছোঁয়াইয়া হাত বাড়াইয়া খাঁ সাহেবের দিকে ধরিলেন; ভয়ে ভয়ে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া রহিম খাঁ তাহা ফিরিয়া লইলেন।

হাসিয়া কাশেম বলিলেন "দিন্-দুনিয়ার মালিক, ধর্ম্মপতি কালিফের পাদুকা-বহনেরও আমি যোগ্য নই!—তবে দুঃখ এই আমার উপর এ মিথ্যা দোষারোপ করা কেন? যাঁর ইচ্ছায় আমার মত শত শত কাশেম ম'র্‌তে বাঁ'চ্‌তে পারে, তাঁর কি মিথ্যা প্রবঞ্চনা সাজে? কেন আমার উপর এ ক্রোধ, আমি তা' বুঝেছি! তার জন্য আমায় মা'র্‌তে হয়, মারুন তিনি—একটুও মনে ক্ষোভ হবে না। কিন্তু আমার মাথার উপর এ কলঙ্ক বর্ষণ কেন?"

তাঁহার চোখে চোখে চাহিতে সাহস না করিয়া রহিম কহিলেন "আমি তার কি জানি? আমার উপর যা' হুকুম হয়েছে, আমি তাই তামিল্ ক'র্‌তে এসেছি।"

দাঁড়াইয়া কাশেম কহিলেন "করুন, তামিল করুন, খাঁ সাহেব; এই এই হাত নিন্,—শিকল পড়ান; দেরী কচ্ছেন কেন?" তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন। রহিম খাঁ প্রহরীদের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন; কিন্তু তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

কাশেম অগ্রসর হইয়া আসিলেন "কর, তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা কর। এ জীবন ত' দু'দিনের জন্য মাত্র—এর সুখ দুঃখে বিহ্বল হ'য়ে কখনো কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হ'য়োনা।" প্রহরীদের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

বিস্মিত হইয়া কাশেম কহিলেন "ও কি! তোমাদের চোখে জল কেন? মানুষের এত দুর্ব্বল হওয়া উচিত নয়। সংসারে থাক্‌তে গেলে, কত আধিব্যাধি, কত দুঃখযন্ত্রণা সইতে হয়;—পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী ও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের কত বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভুগ্‌তে হয়! এ যে

সংসারের নিয়ম—এতে আকুল হ'লে চ'লবে কেন?"—তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

তখন কাশেম রহিম খাঁর নিকটে আসিয়া কহিলেন "এদের কাজ নয়; যা কিছু করা আবশ্যক, তা' আপনাকেই ক'রতে হ'বে।—ক'রে, চলুন।"

খাঁ সাহেব একটু ইতস্ততঃ করিলেন—তার পর কাশেমের হস্তদ্বয় শৃঙ্খলিত করিয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

———o———
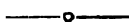
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের জয়।

বন্দী কাশেমকে লইয়া রহিম খাঁ আসিয়া বাগদাদে পঁহুছিয়াছেন; কাহারো কোনো অনুরোধ, উপরোধ না শুনিয়া, তাঁহার উপর আরোপিত অপরাধের সত্যাসত্য বিচার না করিয়া, তাহার সঙ্গে দেখাটি পর্য্যন্ত না করিয়া, কালিফ কাশেমের উপর দণ্ড বিধান করিলেন—জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার চর্ম্মোৎপাটন করা! দণ্ডের কথা শুনিয়া বাগদাদবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শিহরিয়া উঠিল; মর্জ্জিণা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন; জোবেদা যে, তাহারও প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; বিমলা অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন; অমলা বলিলেন "উঃ! আমায় বড় জালা দিয়েছিল!"

কাশেম কারাগারে রহিয়াছেন। আজ তাঁহার চর্ম্মোৎপাটন হইবে। আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র সকলেই দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিয়া যাইতেছে—বাহির হইতে; কাহারো কারাগারে প্রবেশের হুকুম নাই! চলুন, পাঠক, আমরাও একবার ভারতের এই প্রথম মুসলমান বিজেতাকে চোখের দেখা দেখিয়া আসি।

মোটা-মোটা লৌহ-শিক দেওয়া কারাগারের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া,

হাতে শিক্ ধরিয়া, অনন্ত শূন্যের দিকে চাহিয়া, কাশেম আক্ষেপ করিয়া উঠিলেন "এই ত' মানুষের ভালবাসা, কালিফ-বাদশার অনুগ্রহ, দুনিয়ার খ্যাতি-প্রতিপত্তি! একদিন না কাশেম, তোমার নামে বাগ্দাদের লোক অস্থির হ'য়ে উঠ্‌তো, কালিফ তোমায় নিয়ে কত গৌরব ক'র্‌তেন! তোমার মর্জ্জিণার কাছে থাক্‌তে তুমি সময় পেয়ে উঠ্‌তে না! তুমি না ভেবেছিলে, সিন্ধু জয় করেছ, সমগ্র হিন্দুস্থান জয় ক'র্‌বে?—তুমি না মনে করেছিলে, বাগ্দাদে যখন তুমি ফির্‌বে, পাগল হ'য়ে বাগ্দাদের লোক তোমায় দেখ্‌তে আস্‌বে?—আর আজ তুমি চোর-ডাকাত-বদ্মায়েস আবাস-স্থান কারাগারে! তোমায় দেখে লোক ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যায়! আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ঐ লম্পট কাশেম?"

এমন সময় উন্মাদিনীর মত, লজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম সকল ত্যাগ করিয়া, দৌড়িয়া আসিয়া, কারাগারের দরজার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া, মর্জ্জিণা চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কাশেম, কাশেম আমার—এসো, আমার বুকে এসো।"

সেই যে কাশেম সিন্ধুযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার পরে কারাগারের লৌহ কবাটের 'সাতসমুদ্র তেরো নদীর' ব্যবধানে এই দম্পতির প্রথম মিলন!

কাশেম চমকিয়া উঠিলেন—তাঁহার হৃদয়-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "কেও—মর্জ্জিণা? এসেছ তুমি?—কি দেখ্‌তে এসেছ?—ঘৃণিত লম্পট্ স্বামীকে দেখ্‌তে? এখনো ভুল্‌তে পারনি তা'কে?—হায় খোদা!" তাঁহার নাভিমূল হইতে দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া কারাকক্ষটিকে উষ্ণতর করিয়া তুলিল; তাঁহার চক্ষু পলক ফেলিতে ভুলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া, ঘন-সন্নিবিষ্ট শিকের মধ্যে যে ফাঁক ছিল, তাহারই মধ্য দিয়া হাত গলাইয়া দিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া, মর্জ্জিণা

কাঁদিয়া কহিলেন "তুমি কি ভুল্‌বার জিনিষ, প্রিয়তম, যে তোমায় ভু'ল্‌বো? আমার অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, শিরায় শিরায় তুমি! দেবতা আমার তুমি—আমি জানি তুমি লম্পট্‌ নও। দুষ্টা স্ত্রীলোকের অপবাদে জগৎ তোমায় ভুলতে পারে,—অকৃতজ্ঞ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কালিফ্‌ মনে ক'র্‌তে পারে, তুমি তারই মত!—আমি জানি দেবতা তুমি। এসো প্রিয়তম, আমার সঙ্গে এসো; আর আমাদের যশ, ঐশ্বর্য্যে কাজ নেই!—এসো, আমরা বাগদাদ্‌ ছেড়ে পালিয়ে যাই!"

চুম্বন করিয়া তাহার হস্ত বুকে রাখিয়া আবেগাকুল কণ্ঠে কাশেম বলিলেন "মর্জ্জিণা—মর্জ্জিণা—যার নামে কলঙ্ক হয়, তার মরাই ভাল! আমি কাশেম, আমি কখনো কোনো স্ত্রীলোকের দিকে মুখ তু'লে চাইনি, মা বোনের মত বই কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিনি;—আমার কপাল মন্দ, তাই আজ আমার নামে এ অপবাদ! মরণেই আমার শান্তি! তোমায় দেখলে প্রাণ জ্ব'লে উঠে; যাও, তুমি ঘরে যাও—আমায় শান্তিতে ম'র্‌তে দাও, মর্জ্জিণা!" চুম্বন করিয়া স্ত্রীর হাত সরাইয়া দিলেন।

এমন সময় কোথা হইতে কারাধ্যক্ষ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল; মর্জ্জিণাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল "কে ওখানে? যাও—সরে যাও।" কারাধ্যক্ষ একজন বৃদ্ধ মুসলমান্‌।

তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া মর্জ্জিণা কহিলেন—ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া তাহার চক্ষুর জল পড়িতে লাগিল—"বাবা আমার তুমি!—আমায় দয়া কর—আমার স্বামীর কাছে যেতে দাও।"

বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল; সে সরিয়া দাঁড়াইল—মনে মনে কহিল "উঃ বড় পাষাণ তুমি কালিফ!—একটা স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে এমন একটা পরিবারের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে বসেছ তুমি!"

তার পর প্রকাশ্যে বলিল "মা, উঠ তুমি—আমার এমন শক্তি নাই যে তোমার স্বামীর কাছে তোমায় নিয়ে যেতে পারি।"

মর্জ্জিণা আজ নাছোড়-বান্দা; আবারো তাহার পা ধরিয়া বলিলেন "কারাধ্যক্ষ তুমি—তোমার শক্তি আছে . বাবা, বাবা, আমায় দয়া কর, বড় দুঃখিনী আমি। জগতে কেউ আমার মুখের দিকে চাইলে না;—মিছে অপবাদ দিয়ে কালিফ্ আমার স্বামীকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি আমায় দয়া কর—একটিবার আমার কাশেমকে আমায় প্রাণ ভরে দেখ্‌তে দাও।"

হাত তুলিয়া কাশেম কহিলেন "না মর্জ্জিণা, আমায় আর দেখ্‌তে এসোনা। মানুষ আমি—আর সইতে পার্‌বো না!. যাও তুমি, ঘরে যাও। তোমায় আমি সুখী ক'র্‌তে পার্‌লেম্ না, খোদা কর্‌বেন। তুমি ঘরে যাও—আমায় শান্তিতে মর্‌তে দাও।"

কারাধ্যক্ষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল "এমন স্বামী-পরায়ণা স্ত্রী বাগদাদে আর নেই। এর প্রাণে এ দারুণ আঘাত ক'রে তোমার মঙ্গল হ'বে না, কালিফ!" সে মর্জ্জিণাকে কহিল "এসো, মর্জ্জিণা, মা আমার, আমার সঙ্গে এসো।" দ্বার খুলিয়া মর্জ্জিণাকে ভিতরে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া আবার দ্বার বন্ধ করিয়া ভাবিল "টের পেলে আমায় তুমি মার্‌বে কালিফ?—তা মেরো। কিন্তু জীবনে এমন সুখ আর দুটি দিন হ'বে না!"

স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া যুবতী কহিলেন "কাশেম, কাশেম আমার—" তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; তাহার অশ্রুতে কাশেমের বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল।

তাহাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে কাশেম বলিয়া উঠিলেন "না, আর সইতে পারিনে। আমায় শান্তিতে ম'র্‌তে দিলে না, মর্জ্জিণা! তোমায় আমার কারাগারের খবর কে দিয়েছিল? হতভাগ্য

আমি, আমার যাতনার ভাগী হ'তে কেন এসেছ তুমি? যাও মর্জ্জিণা আমার, ঘরে যাও—আমায় ভু'লে যেতে চেষ্টা কর"—বাহু-পাশ হইতে তিনি পত্নীকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

মর্জ্জিণা পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "না, আর আমি ঘরে যা'বো না। তুমি যেখানে সেখানেই আমার ঘর, সেখানেই আমার স্বর্গ, সেখানেই আমার সর্ব্বস্ব। তুমি, ম'র্‌বে,—আমি ম'র্‌তে পারিনা? এ নিষ্ঠুর জগতে, যেখানে বড় প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ক'রে ছোটর সর্ব্বনাশ করে, আর আমি থাক্‌তে পার্‌বো না।"

এমন সময় ত্রস্তপদে তীব্র দৃষ্টি করিতে করিতে জোবেদী কারাগারের বাহিরে আসিয়া কতৃত্বপূর্ণ স্বরে কহিলেন "কারারক্ষি, দোর খু'লে দাও—আমি কাশেমকে দেখ্‌তে যা'বো।"

কারাধ্যক্ষ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল "কালিফের হুকুম নেই।"

ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি আবার কহিলেন "আমি সাজাদী—আমি ব'ল্‌চি—দোর খুলে দাও।"

কারাধ্যক্ষ অবিচলিতভাবে কহিল "সাজাদি—"

অগ্রসর হইতে হইতে জোবেদী অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন "না, আমি কোনো কথা শুন্‌বো না। খু'লে দিতে না পার—চাবি দাও, আমি নিজে খুল্‌চি।"

কক্ষে প্রবেশ করিয়া মার্জ্জিণাকে দেখিয়াই জোবেদী সবিস্ময়ে কহিলেন "মর্জ্জিণা! এসেছ তুমি!—এমন স্বামীকে দেখ্‌তে এসেছ?"

আরো দৃঢ়ভাবে কাশেমকে ধরিয়া মর্জ্জিণা উত্তর করিলেন "এঁকে দেখ্‌বো না ত' দেখ্‌বো কা'কে! তোমরা চিন্‌লে না! আমি জানি স্বামী আমার বাগদাদের অলঙ্কার, মুসল্‌মানের শিরোমণি—"

জোবেদী ইহার কথার কোনো উত্তর করিলেন না—কাশেমের সম্মুখে আসিয়া, সঘৃণজ্বালাময়ী-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তিনি চোটে বলিতে

লাগিলেন "ধূর্ত্ত প্রতারক লম্পট্ তুমি, কাশেম! এতদিনে তোমার প্রতারণার ফল ফলেছে! তোমার প্রভুর প্রভু কালিফের মেয়ে আমি—আমি তোমার পায় ধরেছিলেম, আর তুমি আমায় দূর ক'রে দিয়েছিলে! মনে করেছিলেম আমি, মর্জ্জিণার ভালবাসায় অন্ধ তুমি আমায় পায় ঠেলেছ! কিন্তু আজ ত তুমি ধরা পড়েছ কাশেম! আমায় উপেক্ষা করেছিলে, কিন্তু সিন্ধু-সুন্দরীর পায় ত গড়াগড়ি দিয়েছ! আজ আর আমি সইতে পারিনে, কাশেম! এমন কুকুর তুমি—তোমায় আমি ভালবাস্তে গিয়ে অপমানিত হয়েছি! উঃ! আমার বুক জ্বলে যায়!"

মুখ ফিরাইয়া স্পষ্ট ঘৃণা ও বিরক্তির স্বরে কাশেম বলিলেন "যাও, সাজাদি: ম'র্তে বসেছি, আর আমায় জ্বালিও না! লম্পট্ আমি,—আমার কাছে এসেছ; একটুও কি ভয় হচ্ছে না?—লোকে দেখ্লে কি ব'ল্বে! যাও তুমি—নির্জ্জনে মর্জ্জিণাকে দেখে শান্তিতে ম'র্তে দাও।"

তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, মুখ সম্মুখের দিকে আনত করিয়া সাজাদী উত্তর করিলেন "লোকলজ্জার ভয় আর আমার নেই! আমি ভাল বাস্তে পেরেছিলেম্—লোকে জান্বে তাতে আবার ভয় কি? আমায় ভালবাসনি—দূর ক'রে দিয়েছিলে; এও আমি সইতে পারি; কিন্তু আর একজনের কাছে তুমি ভালবাসা ভিক্ষা করেছ, এ আমার অসহ্য!" তার পর কণ্ঠস্বর নামাইয়া কাতর ভাবে কহিলেন "বল কাশেম, একটিবার বল, সব মিথ্যা?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবিচলিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া মহাবীর উত্তর করিলেন "না, জোবেদি তোমার সহ্য হো'ক্,অসহ্য হো'ক্,আমার তা'তে কিছুই এসে যায় না! তোমায় আমি কিছুই বল্বো না। তোমাদের ক্ষমতার মধ্যে আমায় মেরে ফেলা—তা' মারো। যা' করেছ মরণ তা'র কাছে স্বর্গ! তুমি যাও, সাজাদি, আমায় আর জ্বালিও না।" তার পর

প্রেমার্দ্র কণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "যাও মর্জ্জিণা আমার, তুমিও যাও।"

উত্তরে উপায়হীনা পত্নী সুধু তাহাকে বেশী করিয়া আকড়িয়া ধরিলেন।

গ্রীবা বাঁকাইয়া, অনলবর্ষী কটাক্ষ করিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে মর্জ্জিণাকে সরাইয়া দিয়া, বাদসাজাদী বলিয়া উঠিলেন "এখনো এত বড় আস্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার কাশেম! আমার সহ্য হোক্, অসহ্য হোক্—তোমার কিছুই এসে যায় না!—আবারো ঐ কথা!—লম্পট তুমি, প্রেমের অপমান করেছ, তুমি—তোমার মুখে আবারো ঐ কথা!" তার পর নম্রদৃষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "আমি কাশেম, তোমার ভালবাসা পেতে আসিনি; সুধু জানতে এসেছি যাঁকে দেবতা মনে ক'রে ভালবেসেছিলেম, সে দেবতাই আছে। বল কাশেম, সত্য বল, আমি তোমার প্রাণ বাঁচাবো" বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কাশেমের হাত ধরিলেন। সর্প শরীর স্পর্শ করিলে লোকে যেভাবে শিহরিয়া উঠে, তেমনি ভাবে শিহরিয়া উঠিয়া কাশেম তাহাকে সরাইয়া দিলেন।

মর্জ্জিণা ত্রস্ত আসিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "আমার তুমি বিশ্বাস কর, সাজাদি, কাশেম দেবতাই আছে। দাও, তার প্রাণ বাঁচিয়ে দাও—আমি তোমাকেই দেবো।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে কাশেম বলিয়া উঠিলেন "না, মর্জ্জিণা, এদের কাছে ভিক্ষা ক'রে যে প্রাণ রাখতে হবে, সে প্রাণ আমার যাওয়াই ভাল। যাও জোবেদি, তুমি যাও। তোমাদের অনুগ্রহাত প্রাণে আমার কাজ নেই! কলঙ্কী আমি—আমায় মরতে দাও।"

জোবেদীর কাণে ব্যঙ্গের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল। তিনি কাতর হইয়া বলিলেন "এত মিনতি করলেম, একটু দয়া হলো না! ভালবাসতে না পার, আমি তোমার ভালবাসা চাইনে। সুধু জানতে চেয়েছিলেম, তোমার

কলঙ্ক মিথ্যা। এ অনুগ্রহও আমায় তুমি কর্‌লে না!" তাহার গলার স্বর চড়িয়া উঠিল, তিনি কহিতে লাগিলেন. "কাশেম, তোমার বড় অহঙ্কার হয়েছে, কাশেম! ম'র্‌তে এতই সাধ! মর তবে—আমি চল্লেম।" তিনি প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।

মর্জ্জিণা আসিয়া তাহার পায় লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "সাজাদি সাজাদি, তোমার পায় পড়ি ঐ দ্যাখ আমার কাশেমকে মার্‌তে এসেছে! রক্ষা কর, তুমি রক্ষা কর—কাশেম তোমার।"

জোবেদী, তাহার অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্ট পথে চাহিয়া দেখিলেন, বৃহৎ বৃহৎ ছুরিবাহস্তে করিয়া দুইজন ঘাতক আসিয়া দরোজা খুলিয়া প্রবেশ করিতেছে।

তাহাদের সম্মুখীন হইয়া কর্ত্তৃত্বপূর্ণ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোরা কে? কি চাস।"

একজন উত্তর করিল "আমরা চামড়া তু'ল্‌তে এসেছি।" মর্জ্জিণা বাহিয়া দুই হাতে স্বামীকে আকাড়িয়া ধরিলেন।

তাড়াতাড়ি কাশেমের দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে জোবেদী কহিলেন "এখনো কাশেম এখনো বল, তোমার কলঙ্ক মিথ্যা—"

প্রশান্ত মহাসাগরের মত শান্ত সেনাপতি নিরুদ্বিগ্নভাবে উত্তর করিলেন "তুমি যাও, জোবেদি—তোমার দয়ার প্রাণে আমার কাজ নেই!"—ঘাতকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "এসো, তোমাদের কাজ করো"—পত্নীকে দৃঢ়হস্তে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার কপাল চুম্বনপূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে কহিলেন "প্রাণেশ্বরি আমার দাও আমায় বিদায় দাও। কেঁদো না তুমি—অস্থির হয়ো না তুমি! এ জগতের পরপারে আবার আমাদের মিলন হবে—সেখানে কলঙ্ক নাই, নরক নাই; মিথ্যা প্রতারণা নাই! তিনি নিমীলিতনেত্রে উপবেশন করিলেন।

ঘাতকদ্বয় অগ্রসর হইয়া কহিল "তোমরা এখন স'রে যাও।"

কাশেমের দিকে কটাক্ষ করিয়া জোবেদী কহিলেন "এতই ম'রতে সাধ!" তার পর ঘাতকদ্বয়ের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "যা, তোরা দূর হ'য়ে যা'। আমি সাজাদী, আমি যাকে ভালবেসেছিলেম, তোদের সাধ্য কি যে তার গায় হাত দি'বি!" শেষে কাশেমের হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন "বল কাশেম, এখনো বল, সাজাদীর ভালবাসা যে উপেক্ষা করেছে সে কলঙ্কিত নয়!—আমায় অত অপমানিত, অত নীচ করো না কাশেম!"

কাশেম তাহার দিকে চাহিলেন না—বরং তাহার হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন "কেন জোবেদি, বৃথা যন্ত্রণা দিচ্ছো! তোমায় বল্‌বার আমার কিছুই নেই; তুমি ঠিক জেনো, কাশেম মর্‌বার ভয় করে না।"

জোবেদী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যানে তাহার হৃদয়ের সর্প ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিয়া উঠিল—বিষের দাহনে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন "উঃ! বড় অহঙ্কার! বড় আস্পর্দ্ধা! যার পা ছোঁবার যোগ্যতা তোমার নেই, তাকে বারে বারে এত অনাদর, এত তাচ্ছিল্য,—না, আর আমি সইতে পারিনে—ওঃ, আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে,—তোমার রক্ত—তোমার রক্ত না হলে প্রাণ আমার জুড়োবে না! কলঙ্কী তুমি, নারকী তুমি, প্রতারক তুমি—তুমি আমায় উপেক্ষা কর!"—তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিজ্বালা ছুটিয়া পড়িতে লাগিল—আমায় অনাদর,আমায় অপমান,কর্‌তে একটু ভয় হয় না?—এত বড় আস্পর্দ্ধা! তবে মর, জ্বলে জ্ব'লে আমারই হাতে মর,—আমার জ্বালা জুড়োক্।" সহসা একজন ঘাতকের হাত হইতে একটি ছোরা কাড়িয়া লইয়া কাশেমের বুকে আঘাত করিলেন। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, ছুটিয়া আসিয়া "কর কি, কর কি, জোবেদি? আমায় মারো" বলিতে বলিতে মর্জ্জিণা সম্মুখে পড়িলেন। ছুরিকা তাহার পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া বক্ষ-

পঞ্জরে যাইয়া ঠেকিল! নির্ণিমেষনেত্রে কাশেম তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন! মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে মর্জ্জিণা ইহসংসারের শেষ কথা বলিলেন "কাশেম, কাশেম,—জোবেদী—তোমায়—ভাল—বাসে।" আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। স্বামীসোহাগিনী, স্বামীগতপ্রাণা যুবতী, শরীরের রক্তে স্বামীর চরণ ধৌত ধৌত করিতে করিতে, স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন।

আবার ছোরা তুলিয়া লইয়া, জোবেদী চীৎকার করিয়া কহিলেন—তাহার চক্ষু ছুটিয়া বাহির হইতেছে—"তোমায় লাগে নি, কাশেম!—মর্জ্জিণার বুকে লেগেছে! রাক্ষস তুমি, পিশাচ তুমি, আমার কলঙ্কের চিহ্ন তুমি!—তোমার মরণ নেই!" আবার ছুরিকাঘাত করিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন "আমায় অনাদর করেছিলে! বড় জ্বালা দিয়েছ! এখন জ্ব'লে জ্ব'লে মর—আমি জুড়োই!"

"মিথ্যা কলঙ্কের—বড় জ্বালা—জোবেদি—প্রাণ—জুড়োলো।"

মর্জ্জিণার আত্মা স্বামীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কাশেম যাইয়া মিলিত হইলেন! চির-আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহারা ভগবানের আপন রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

সাজাদী সর্পাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন—কাশেমের স্পন্দহীন চক্ষুর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "মিথ্যা! কলঙ্ক তোমার মিথ্যা!" তাঁহার মৃত দেহ জড়াইয়া ধরিয়া গদ-গদ কণ্ঠে বলিলেন "বল নি, আগে বল নি কেন? মিথ্যা!—মিথ্যা! উঃ আমি কল্লেম কি?" বক্ষে করাঘাত করিয়া তিনি দূরে ছুটিয়া পড়িলেন "কৈ?—আমার জ্বালাত' জুড়োল না! কাশেম, কাশেম, তুমিত' কলঙ্কের জ্বালা এড়িয়ে গেলে!" মদোন্মত্তার মত তাহার চরণ টলিতে লাগিল—তিনি একবার দাঁড়ান; একবার বসেন, একবার যাইয়া কাশেমকে জড়াইয়া ধরেন! "তোমায় জ্বালা'বো, আমি হাসুবো!, কৈ, হাসতে যে পারিনে; বুক যে ফেটে গেল!" দুই হস্তে

তিনি সবলে বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন ; তার পর হঠাৎ কাশেমের চক্ষুর উপর চক্ষু পতিত হইল—তিন পা পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন "ও কি ! আমায় জল্‌তে দেখে তুমিই যে হাস্‌চো।" দাঁতে ওষ্ঠ কাটিয়া,সাজাদী নিকটে আসিলেন ; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "আবার, আবারো আমায় পরিহাস, আমায় উপেক্ষা ! ভাল নয়, এতটা ভাল নয়, কাশেম !" তাহার কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠিয়া গেল। "মুসলমান জগতের সম্রাট্, সাহান শা কালিফের মেয়ে আমি—আমায় উপেক্ষা !" বলিতে বলিতে, দুই হাতে কাশেমের চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন "ভাল নয়, কাশেম অতটা ভাল নয়, ব'ল্‌চি। কলঙ্কী তুমি—" চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া তিনি পিছাইয়া গেলেন—তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল "না, না তুমি ত' বলেছ, কলঙ্ক তোমার মিথ্যা। আমি কর্‌'লেম্ কি ?" জোবেদী মাটিতে বসিয়া পড়িলেন ; তার পর কাশেমের মৃত-দেহ আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "কাশেম, প্রিয়তম, উঠ তুমি, যত ইচ্ছা, আমায় অনাদর কর, আমায় উপেক্ষা ক'রে মর্জ্জিণাকে ভালবাস, সিন্ধু-রমণীর প্রেম ভিক্ষা কর—" আহত হইয়া সর্প যেমন ত্বরিতে লেজের মাথায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া গর্জ্জিতে থাকে, তেমনি ভাবে সাজাদী গর্জ্জিয়া উঠিলেন "না, না মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। কৈ, সে কৈ ? দেবতা তুমি, তোমার নামে যে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়েছে, সে রাক্ষসী কৈ, সে ডাকিনী কৈ, সে পিশাচী কৈ ? রক্ত, তার রক্ত চাই !" তিনি বেগে প্রস্থান করিলেন।

ঘাতক দুইজন, জোবেদীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া, ভয়ে ভয়ে বাহিরে যাইয়া লুকাইয়াছিল। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া ফেলিয়া, তাহারা কারাগারে প্রবেশ করিল; তার পরে, দরজা বন্ধ করিয়া হাঁক ছাড়িয়া বলিল চল্ "চল, তাড়াতাড়ি চামড়া তু'লে, মাথাটা

কেটে নিয়ে, কালিফ্‌কে দিয়ে, প্রাণ নিয়ে পালাই।" তাহারা কাশেমের মুণ্ড ছেদন করিয়া, দেহ হইতে চর্ম্ম উৎপাটন করিতে লাগিল।

—o—

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অমলার শাস্তি।

কাশেমের উপর যে দণ্ড বিধান হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; কালিফ সংবাদ পাঠাইয়াছেন, সন্ধ্যার সময় তিনি আসিয়া সুন্দরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

সেই সন্ধ্যা হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া অমলা প্রাসাদ-সংলগ্ন পুষ্করিণী-সোপানে আসিয়া উপবেশন করিলেন; তারপর, কতক্ষণ অলক্তকরাগ-রঞ্জিত পদদ্বয় পুষ্করিণীর জলের উপর দোলাইতে দোলাইতে ডাকিলেন "বিমল, ও বিমল!" ভিতর হইতে উত্তর হইল "যাচ্ছি দিদি।"

পূর্ব্ববৎ পা দোলাইতে দোলাইতে অমলা আপন মনে বলিতে লাগিলেন "আজ যে প্রাণটা আমার বড়ই হালকা বোধ হ'চ্ছে! কাল ঠাকুর্দ্দাকে স্বপ্নে দেখে অবধি, আমার প্রাণে নূতন রকমের এক আনন্দ হয়েছে।"

বিমলা বাহিরে আসিলেন, ভগ্নীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি, দিদি, আজ যে তোর প্রাণে বড় স্ফূর্ত্তি দেখ্‌চি! ফুলে ফুলে তুই যে একেবারে ফুলের রাণী সেজেছিস্‌! কে তোকে এমন ক'রে সাজিয়ে দিলে?"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া জ্যেষ্ঠা উত্তর করিলেন "কে আর সাজা'বে? ঠাকুর্দ্দা সাজিয়ে ভালবাস্‌তেন—তিনি ত' চ'লেই গেছেন! আজ আমি

নিজে সেজেছি। আজ আমার বড় স্ফূর্ত্তি হয়েছে। আয়, আমার বুকে আয়।” তিনি উঠিয়া সাগ্রহে ভগ্নীকে আলিঙ্গন করিলেন। দুই ভগ্নী আবার বসিলেন।

কনিষ্ঠার চক্ষুর্দ্বয় ছল্ ছল্ করিতে লাগিল—তিনি বলিয়া উঠিলেন “তোর এ সাজ দেখে আজ আমার আবার সিন্ধুর কথা মনে পড়েছে।—ফুলের গয়না প’রে কেমন আমরা ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে ভবানী-উদ্যানে ফুল তুলতে যেতেম, সীঁড়ির উপর ব’সে সন্ধ্যাবেলায় কেমন তুই গান কত্তিস্, তোর গান শু’নে ঠাকুর্দ্দার চোখ্ দিয়ে কেমন জল প’ড়তে থাকতো!—আর আমাদের কপালে সে সুখের দিন নেই!” তাহার বক্ষস্থল উন্নত-আনত করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল। তার পর বিমলা আবার কহিলেন “দিদি, তেমনি ক’রে আজ একটা গান কর্ না?”

অমলা বলিলেন “শুন্‌বি?—আচ্ছা।” তিনি সুর ধরিলেন—

লও মা জনম-ভূমি, দীন সন্তানের দান
তোমারি দেওয়া এ, মাগো!—তব তরে কাঁদা প্রাণ!
তোমারি রৌদ্র তোমারি বায়ু
তোমারি জল গড়েছে এ আয়ু,
এ দেহ আমার অস্থি মজ্জা আর—
তোমারি সকল—শক্তিবুদ্ধি জ্ঞান।
হীন,—হীন হ’য়ে হায় গো জননি,
বুকের আঘাত তব নিবারিতে পারিনি!
সেই জ্বালা শুধু বুকে জলে ধূধূ,
মনে পড়ে তোর মু’খানি যে ম্লান!
কে বলে মা, বিন্দু?—হে আমার সিন্ধু!
এ যে বুকভরা শোণিতের সিন্ধু!

তাই ঢেলে আর ধোয়াব তোমায়,
মুছাইব তব যত অপমান।
হই কাঙ্গালিনী, হে যশোমালিনি!
আমি যে মা তোর, তোরি মা সন্তান!
আজি লও লও, পায়ে তুলে লও
চিরপূজ্যা দেবী,—সন্তানের দান।"

সীড়ির উপরিভাগে দাঁড়াইয়া, স্তব্ধ-মুগ্ধ ভাবে, কালিফ্ শুনিতেছিলেন, সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে তিনি কহিলেন "সুন্দরি, তুমি এমন গাইতে পার! আবার গাও।"

অমলা ফিরিয়া চাহিলেন—উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন, "কে?—জাঁহাপনা! কাশেমের মাথা কৈ? আমার প্রাণের জ্বালা জুড়োলো কৈ?—কতদিন আর আমি এমন জ্'ল্‌বো?"

অগ্রসর হইতে হইতে কালিফ্ উত্তর করিলেন "জুড়োবে, সুন্দরি, তোমার জ্বালা জুড়ো'বে, আজই জুড়োবে, এখনি জুড়োবে! কাশেমের মাথা এখনি এনে তোমার চরণে উপহার দেবে। বল, একটিবার বল, আমায় তুমি ভাল বাস্‌বে?"

ধীরে ধীরে অমলা উত্তর করিলেন "ব'ল্‌বো, এখন নয়,' ব'ল্‌বো; আগে আমার বুকের জ্বালা জুড়োক্, প্রাণে আগে আমার শান্তি হোক্। কলঙ্কের জ্বালা বড় জ্বালা!"

এমন সময় আনন্দে উল্লসিত হইয়া, অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া কালিফ্ উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ওই দেখ সুন্দরি, চেয়ে দেখ, কালিফের প্রাণের প্রাণ তুমি, মাথার মুকুট তুমি—তোমায় যে কলঙ্কিত করেছিল, তোমার প্রাণে যে অমন্ জ্বালা দিয়েছিল, ঐ সেই ঘৃণিত কাশেমের মুণ্ড!"

স্বর্ণ থালায় কাশেমের মস্তক লইয়া জনৈক খোজা আসিয়া সম্মুখে

দাঁড়াইল। ত্রস্ত কালিফ্ বলিলেন "দে, আমার হাতে দে—আমি বই ও চরণে আর কেউ উপহার দিতে পার্‌বে না।" খোজার হাত হইতে থালা লইয়া অমলার পদপ্রান্তে স্থাপন করিয়া বলিলেন "এই নাও, প্রেয়সি, তোমার কলঙ্কের জ্বালা দূর কর—আর সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ-মুকুট তোমার চরণে স্থান দাও।" কালিফ্ মুকুট রক্ষা করিলেন।

অমলা "হাঃ হাঃ হাঃ" করিয়া ভীষণ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। চমকিয়া কালিফ্ তিনপদ পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া তাঁহার উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যুবতী চীৎকার করিয়া কহিলেন "এতদিনে প্রাণের জ্বালা আমার জুড়োলো! তোমার মুকুটে কালিফ্, আমি—ভবানী-সেবিকা, সিন্ধু-রাজ-নন্দিনী—পদাঘাত করি।"—কার্য্যতঃ তাহাই করিয়া, আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন "শৃগাল তুমি, কুকুর তুমি—দেবতার ভোগে লোভ ক'রেছিলে। তোমার মত ঘৃণিত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পিশাচের কপালে পদাঘাতই জুটে থাকে"—ক্ষিপ্রপদে যুবতী অগ্রসর হইলেন—ভয়ে বিস্ময়ে কালিফ্ সরিয়া গেলেন। তার পর কাশেমের মস্তকের দিকে চাহিয়া যুবতী বলিয়া উঠিলেন "কাশেম, কাশেম, তুমি আমায় ক্ষমা কর। লম্পট্ কালিফ্ যে ভাবে আমার কলঙ্কের কথা নিয়েছিল, তোমার কি সাধ্য ছিল যে সে ভাবে তুমি আমায় কলঙ্কিত ক'রবে? সিন্ধু জয় ক'রে তুমি আমার গৌরবান্বিত বংশ কলঙ্কিত করেছিলে, আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী সিন্ধু তুমি লাঞ্ছিত করে-ছিলে—আজ আমি তারই প্রতিশোধ নিলেম্।" তার পরে সুনীল নভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যুবতী কহিলেন "ভবানি, আমার জন্মভূমি, ঠাকুর্দ্দা, বাবা—আমার প্রতিজ্ঞা আমি পালন ক'র্-লেম্। আর যেন আমার হিন্দুস্থানের উপর শত্রুর পদ-ক্ষেপ না প'ড়্তে পার।" শেষে বস্ত্রাস্তরাল হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া, তাহাতে চুম্বন দিয়া কহিলেন "এসো, আমার বুক-জুড়ানো ধন,

আমার বুকে এসো—" এবং দুই হাতে ধরিয়া বক্ষে আমূল প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং পড়িতে পড়িতে বিমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোর প্রতিজ্ঞা যেন পূর্ণ হয়।"

পরিপূর্ণ যৌবনে দাহির-নন্দিনী অমলার, কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল। তাঁহার জ্বালা নির্ব্বাণ হইল।

অমলা যখন পড়িতেছিলেন, বিমলা তখন তাঁহাকে দুই হাতে সাপটিয়া ধরিয়া ফেলিলেন ; তার পরে বসিয়া পড়িয়া, তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন—অশ্রুস্রোতে তাঁহার গণ্ডদ্বয় ও বক্ষস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। আর কালিফ—যখন তিনি অমলাকে ছুরি বাহির করিতে দেখিলেন, তখনি দৌড়িয়া সীঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিলেন ; হঠাৎ উন্মাদিনীর মত চীৎকার করিতে, ছোরা হাতে করিয়া, জোবেদী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন। "কৈ, সে পিশাচী ডাইনি কই ?"

কালিফ স্তব্ধ হইলেন—তাঁহার চলচ্ছক্তি লুপ্ত হইল। খানিক ক্ষণ 'হা' করিয়া চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "এ আবার কি ?" তার পর কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতে আসিতে ডাকিলেন "জোবেদি. জোবেদি, তোর আবার হ'লো কি ?"—অবসন্ন হইয়া 'দিন্-দুনিয়ার মালিক' বসিয়া পড়িলেন। "উঃ, কি রাক্ষসীই এনেছিলেম্।"

তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া, সমান বেগে নামিতে নামিতে বাদ্শাজাদী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "রক্ত—রক্ত— !—সে পিশাচীর রক্ত না হ'লে, আমার বুকের জ্বালা নিভ্বে না !" তার পর কাশেমের মস্তক দেখিতে পাইয়া, হাতে লইয়া, উদ্যানময় প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিলেন—তাহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে, চক্ষু বাহির হইয়া পড়িতেছে, "এই যে, এই যে কাশেম !—এখনো তুমি আমার জ্বালা দেখে হাস্‌চো। তুমি মরেছ, মর্জ্জিণা মরেছে—জ্বালা আমার জুড়োলো কৈ ?" উন্মাদিনীর ন্যায় তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন—হঠাৎ বিমলার ক্রোড়স্থ

অমলার দেহ দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন "ওই যে, ওই সেই পিশাচী!—উঃ, বড় জ্বালা!" বলিতে বলিতে ঘন ঘন কাশেমের মুখচুম্বন করিয়া, আবার উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন "যাও, কলঙ্কী তুমি—তোমায় আমি চাইনে!" সবেগে কাশেমের মুণ্ড তিনি পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। তার পরে আবার উন্মনা ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন "না, না, তুমিত' কলঙ্কী নও কাশেম—চাই, তোমায় আমি চাই—দাঁড়াও তুমি—যে তোমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে আমার প্রাণে আগুণ জ্বেলে দিয়েছিল তার মুণ্ড নিয়ে আস্‌চি, দাঁড়াও!" বলিতে বলিতে অমলার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার বক্ষে বিদ্ধ ছুরিকা দেখিয়া নিতান্ত অবসন্নভাবে টলিতে টলিতে সাজাদী বলিতে লাগিলেন "ও কি!—তোমার বুকে আবার ছুরি কেন! কে তোমায় মার্‌লে!—কে আমায় জুড়োতে দিলে না! বাঃ, বেশত! তোমরা সকলেই জ্বালার হাত এড়িয়ে গেলে—আর সাজাদী আমি, আমি একাই জ্ব'লতে থাক্‌বো!" শেষে মস্তক বামে দক্ষিণে সঞ্চালন করিতে করিতে, গম্ভীর ভাবে তিনি বলিলেন "না, না, জ্বালা আমার প্রাণে সইবে না। আমি যে কালিফের মেয়ে—বাদশার মেয়ে আমি!—তবু জ্ব'ল্‌তে হ'বে?—আচ্ছা জ্ব'লবো; কিন্তু তোমায় ছাড়্‌চিনে কাশেম—" তাঁহার অধর-প্রান্তে হাসি রেখা ফুটিয়া উঠিল—"তুমি যে মর্জ্জিণার সঙ্গে পালিয়ে যা'বে, সেটি হ'চ্ছে না—দাঁড়াও, তোমায় ধ'র্‌চি!" বলিতে বলিতে যে স্থানে কাশেমের মস্তক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া জোবেদী ঝম্প প্রদান করিলেন।

বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া, প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া বসিয়া বিমলা এতক্ষণ সাজাদীর উন্মত্ততা—তাহার হস্তপদ চালনা,—তাহার দেহ-ভঙ্গী,—তাহার চীৎকার, হাসি-কান্না, তাহার চক্ষুর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল অমানুষিক ভাব—দেখিতেছিলেন। হঠাৎ জলে ঝম্প-প্রদানের শব্দে তাঁহার চমক্

ভাঙ্গিল। তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—এতক্ষণ যাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, একদমে সে সকলি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল—চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে কালিফ্ বসিয়া! তিনি ভাবিলেন "এমন সুযোগ আর হ'বেনা, আর হয়তঃ কালিফ্ তোমায় আমি পা'বোনা—আমার প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থেকে যাবে! আর সিন্ধুর গৌরব, দিদি আমার হাস্‌বে!—না, সে হ'তে পারে না।" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ভগ্নীর কাজ দেখিয়া, তাঁহার মরণ-ভয়-ভীত হৃদয়েও সাহস ও বলের সঞ্চার হইয়াছে। অগ্রসর হইতে হইতে তিনি কহিলেন "জাঁহাপনা!"—

কালিফ্ এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিলেন—সমস্ত যেন তাঁহার নিকট স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। হঠাৎ বিমলার সম্বোধনে তিনি চমকিয়া উঠিলেন—অমলার কথা তাঁহার মনে পড়িল; বিমলাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। ত্রস্ত উঠিতে উঠিতে তিনি বলিলেন "না, আর না, সিন্ধুর রমণি, তোমরা রাক্ষসী, তোমাদের বিশ্বাস নেই!" এক পা, দুই পা করিয়া তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন। শিকার পলাইতেছে দেখিয়া বিমলা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইলেন। প্রাণ-পণে কালিফ্ ছুটিয়া চলিলেন,—বিমলা প্রায়-ধর ধর করিয়াছেন, এমন সময় কালিফ্ যাইয়া অমলার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বিমলার ছুরিকার আঘাত কবাটে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন দাহির-নন্দিনী কাতর ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "যাও, কালিফ্, তোমার কপাল প্রসন্ন—আমার অদৃষ্ট মন্দ! জন্মভূমির কাজ ক'রে বাবা, মা, দিদি, ভৈরব, ভীমা, সকলেই মর্‌লো—পোড়ারমুখী আমি, প্রাণের মমতায় অস্থির হ'য়ে ছিলেম্! আমার কোনো কাজই করা হ'লো না—শৃগাল কুকুরের চেয়েও আমার জীবন হেয়, নিষ্ফল হ'লো! আজ কি আমি সিন্ধুর কলঙ্কের চিহ্ন স্বরূপ বেঁচে থাক্‌বো?

না, না, সিন্ধুর গৌরব তুই দিদি—কলঙ্ক হ'য়ে আমি বেঁচে থাকৃতে পারবোনা। ঐ যে বুঝি বাগদাদ বাসীরা আমায় দেখে হাসৃচে! দাঁড়া, দিদি, দাঁড়া—আমি অপবিত্র হই, তুচ্ছ হই, দেশের কলঙ্ক হই, তুই আমায় ক্ষমা কর, আমায় সঙ্গে নিয়ে যা—" বলিতে বলিতে যুবতী বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিয়া জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিলেন।

———o———
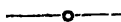
চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

সেইদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সুলতানার শূন্য কক্ষে শূন্য শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া, কালিফ্ অনেক ক্ষণ কাঁদিলেন, "সিন্ধু-রাজ-নন্দিনি, তোমায় এনে সোণার বাগদাদ্ আমার শ্মশান হ'লো! সুন্দরী তুমি, যুবতী তুমি—তোমার প্রতারণা আমি—ইন্দ্রিয়ের দাস—বুঝতে পারিনি! তোমার রূপে পাগল হ'য়ে, তোমার ছলনায় ভুলে, আমি, সিন্ধু-বিজয়ী কাশেমকে পশুর মত হত্যা করেছি! তোমার ছলনায় আমার সুলতানা মরেছে—আমার জোবেদী মরেছে! যেমন পাপী আমি, আমার তেমনি শাস্তি হয়েছে!"

পরদিবস প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই তিনি মহম্মদকে কারামুক্ত করিয়া, আলিঙ্গন করিলেন—তাহার হাতে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। উভয়ের অশ্রুতে উভয়ের বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল!

কালিফের নূতন পরোয়ানা গেল—প্রায় পাঁচশত বৎসরের মত হিন্দুস্থানকে যবনের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়া, অভিযান মুলতান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল; রহিম খাঁও ফিরিয়া আসিলেন—অন্ত জানেন কি তিনি?—কালিফের আদেশে তাহাকে আকণ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া কুকুর দিয়া খাওয়ানো হইয়াছিল।

কালিফ স্বয়ং আর কখনো প্রেমের বাড়ীর দিক্ দিয়াও চলেন নাই। সমস্ত দিন রাজ-কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া, সুলতানার কক্ষে আসিয়া তিনি রজনী যাপন করিতেন,—প্রেমময়ীর স্মৃতি পূজা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেন!

রাত্রিতেই জাল ফেলিয়া জোবেদীকে উঠানো হইয়াছিল—সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল—তিনি দুই হস্তে কাশেমের মুণ্ড বুকে চাপিয়া রহিয়াছেন!

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্—গ্রন্থ প্রকাশক।

গ্রন্থকারের

অতুলন গ্রন্থ

সিদ্ধিতত্ত্ব

বা

কর্ম্মপথ।

বঙ্গবাসী প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষের পাঠ্য।

ধন, যশঃ, মান, বল, ব্যবসায় প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে উন্নতি ইচ্ছুক বঙ্গীয় যুবকের দৃঢ় অবলম্বন, আলোক-বর্ত্তিকা, উপায়, পথ,—এই—

সিদ্ধিতত্ত্ব।

এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর হয় নাই। প্রত্যেক বঙ্গীয় অভিভাবক 'সিদ্ধিতত্ত্ব' নিকটে রাখিবেন। প্রত্যেক বঙ্গীয় ছাত্র, 'সিদ্ধিতত্ত্ব' সঙ্গে রাখিবে। প্রত্যেক বঙ্গীয় যুবক 'সিদ্ধিতত্ত্ব'কে হৃদয়ের সাথী করিবেন।

লিখিয়া এ গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া যায় না; সংসারে উন্নতি করিতে হইলে, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জীবন গঠন করিতে হয়।—তাহা হইলে মানুষ—'মানুষ' হয়।

স্বর্ণবন্ধনে এাণ্টিক কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত, সুন্দর।

মূল্য একটাকা মাত্র।

---

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অনুবাদিত

অপূর্ব্ব গ্রন্থ

মিসেস হেনরী উডের

জগদ্বিখ্যাত

ইষ্ট্‌লীন।

ইষ্ট্‌লীন,—ইষ্ট্‌লীন,—লক্ষে লক্ষে

যাহার সংস্করণ,

সংস্করণে সংস্করণে যাহা—

লক্ষ,

যাহার তুল্য উপন্যাস আজি পর্য্যন্ত

সৃষ্ট হয় নাই,

এ তাহারই—

অবিকল, সুন্দর, সুললিত—মধুর

সচিত্র, অনুবাদ।

যদি মূল 'ইষ্ট্‌লীন' পড়িয়া থাকেন, ইহা একবার পড়ুন;

যদি 'ইষ্ট্‌লীন' না পড়িয়া থাকেন, ইহা সহস্রবার পড়িবেন।

মূল্য—উৎকৃষ্ট বাঁধাই—২৷৷৹

(২) অভিমতে—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—"লুপ্তপ্রায় কথাগুলির রক্ষা—বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করা হইয়াছে।"

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি,—"অতিশয় আদরণীয় হইবে।"

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম, এ, বি, এল,—"ঠাকুরমার ঝুলি লইয়া আমার ঘরের বালক বালিকাগণ উন্মত্ত হইয়া আছে; এই ঝুলি চিরস্থায়ী করিয়া আপনি বঙ্গবাসী সকলের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, সি, আই, ই—"এই অভিনব গ্রন্থ—পাঠ করিতে আমার মত বৃদ্ধেরও ঔৎসুক্য জন্মে।"

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল—"অপূর্ব্ব কবিত্বের আধার—কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল।—দেশী স্বদেশী;—আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—"অতীব সুখপাঠ্য ও মনোরম। আমাদের অশেষ ধন্যবাদ—"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল—"বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি,—চিত্তাকর্ষক।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এ,—"এই বহিতে বাংলা ভাষায় প্রচুর উপাদান,—দেশের একটা অভাব পূরণ হইবে।"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এম, এ, বি, এল—"চিরপ্রিয়, অনির্ব্বচনীয় মোহ।"

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,—"মধুস্রাবী সঙ্গীত—চিরপ্রিয় ভাষা।"

শ্রীযুক্ত জলধর সেন—"ঝুলি অক্ষয় হউক।"

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ—"৬৫ বৎসর বয়সে,—'ঝুলি' পড়িতে পড়িতে ৬০ বৎসর কমিয়া যাইল।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—"বঙ্গসাহিত্যে নূতন জিনিষ—এরূপ নূতনত্ব আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই।"

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—"বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অতিশয় আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকে।"

শ্রীল শ্রীযুক্ত বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ বাহাদুর,—"বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথম—বাঙ্গালার শিশু বৃদ্ধ যুবার কাছে স্বপ্নলোকের সজীব ফটোগ্রাফ। দেশের জল-মাটির মত—কল্পনা স্নিগ্ধ ও দেশের সম্পদ।"

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম, এ, বি, এল,—"অজানা পরীস্থানের সৌন্দর্য্য,—স্বর্গে ঢাকা নদীর ভোগ—অমৃতের পূর্ণ—নন্দনকাননের পারিজাত,—মায়ের চিরমধুময় মোহিনী মন্ত্রপূত ভাষা,—স্বপ্নরাজ্য জাগ্রত রাজ্যে।"

কবি শ্রীযুক্ত মানকুমারী বসু—"বঙ্গভাষার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার।—* * যে গ্রন্থ এই সংসারচক্র নিষ্পেষিত জীবনে সেই শৈশবের সুখময়ী আনন্দময়ী স্মৃতিকে এমন করিয়া জাগাইতে পারে, তাহা আমি বারংবার না পড়িয়া শিশুদের হাতে দিতে পারিব না।"

(৩) মতামতে—

"Thakurmar jhulee has marked out an epoch in our Bengali literature" — Bande mataram.

"Lislening to grandmothars of old." — Amritabazar Patrika.

"A store house of Amusing tales." — Bengalee.

"দেখিব, কি, পড়িব!—আমোদ আছে, শিক্ষা আছে।" বঙ্গবাসী।

"বাঙ্গালার রূপকথা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইতেছিল, দক্ষিণাবাবু তাহা তুলিয়াছেন।" হিতবাদী।

"সূতিকাগার হইতে কর্ম্মজীবনের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত, যে সঙ্গীত, যে কাব্য, যে অমৃতময় মধুর কাহিনী—দেশের ছেলেকে মাতাইয়া জাগাইয়া রাখিতে পারে, তাহা ঠাকুরমার ঝুলি—" নবশক্তি।

"এই স্বপ্নের কাহিনী শিশুর কল্পনা উদ্বুদ্ধ করিবে, বয়ীয়ানের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইবে।" সময়।

"প্রাচ্য প্রতীচ্যের জয় পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে—মজুমদার মহাশয়—বাঙ্গলার এই খাটি স্বদেশী অমূল্য রত্নভাণ্ডার যত্নে রক্ষা করিয়া সমস্ত বাঙ্গালার কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।" সন্ধ্যা।

"এই যুগান্তরকারী পুস্তকে অতীতের বাল্যচিত্র প্রতিবিম্বিত, প্রতিবিম্ব মাধুরীমাখা,—যেন যাদুকরী শক্তির আভাষ পাওয়া যায়—।" বঙ্গবন্ধু।

"বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন, সোণার বাংলার আনন্দবাজার।—এই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধারে কলাকুশল দক্ষিণারঞ্জন দেশের কল্যাণপন্থা উন্মুক্ত করিয়াছেন।" ঢাকাপ্রকাশ।

"গৌরবময় প্রাচীন প্রাসাদের নিপুণ সংস্কার, বাঙ্গালা শিশুসাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" শিক্ষা সমাচার।

"বঙ্গভাষার নূতন অঙ্গরাগ—হারাণ রাজ্যের সুমধুর দৃশ্যপট—স্নেহ, শান্তি, পুরাতন কথার প্রাণারাম স্মৃতি!" চারুমিহির।

"চোকে ধাঁধাঁ, ঠাকুরমার মুখের অমৃত ভাষা।—একখানি পাঠাইয়া দশখানি কিনাইয়াছেন।" ফরিদপুর হিতৈষিণী।

"সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ।" বরিশাল হিতৈষী।

"ঠাকুরমার ঝুলি—আমাদের ঘরের আলো. নগ্নসুন্দরী পুঁটরাণী,—চন্দনচর্চ্চিত শিউলী, গন্ধরাজ, মালতী—চামেলী,—খাঁটি স্বদেশী পুষ্পের হার—বঙ্গগৃহে জোছনা—" সোণার ভারত।

"মাতৃসেবক কবির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বৌতুকাবহ নয়নমনোমুগ্ধকর—"ঠাকুরমার ঝুলি"—বঙ্গসাহিত্যে নূতন গৌরবের সামগ্রী—দেশের প্রকৃত কল্যাণ।" নীহার।

"অক্ষরে অক্ষরে মুক্তা, স্নেহমাখা,—মনভুলান,—পারিজাত পুষ্প।" পুরুলিয়া দর্পণ।

"যথার্থই ইহা কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িবার জিনিষ।" বঙ্গরত্ন।

"ঠাকুরমার ঝুলি বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।" যশোহর পত্রিকা।

"লুপ্তরত্নের উদ্ধার,- অপূর্ব্ব মালা।"— চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

"বাঙ্গালীর ও বঙ্গভাষার নিজের সম্পত্তি।—গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গের গৃহে গৃহে 'ঝুলি' বিরাজ করুক।" খুলনাবাসী।

"বাঙ্গালীর শৈশবের বিচিত্র কাহিনী— বঙ্গবাসীকে সযত্নে উপহার—এ দুরূহ উদ্যমে যথেষ্ট কৃতিত্বে সফলকাম—" ভারতী।

"উদার স্নেহপরিপ্লুত,—দেশ উপকৃত।" উপাসনা।

"সর্ব্বপ্রথম খাঁটি স্বদেশী জিনিষ—যেমন সুন্দর, তেমনি মনোরম—" আরতি।

"মিষ্টান্ন ঝুলি,—স্নেহসরস,—যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, খোকাখুকি পড়ায় মন দিয়াছে। কবির ভাষায় স্নেহসরস কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত।—প্রত্যেক বালকের সহচর হউক।" প্রবাসী।